পৌরনীতি ও নাগরিকতা

দ্বিতীয় বর্ষ

কোর্স কোড : SSC-2672

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এসএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

কোর্স কোড : SSC-2672
সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এসএসসি প্রোগ্রাম)

লেখকবৃন্দ
সুদীপ রায়
ড. সাব্বীর আহমেদ
মো: বদরুল হাসান
তারিক হোসেন খান

সম্পাদনা
গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

কোর্স সমন্বয়কারী
সুদীপ রায়
শশী শবনম ঈষা

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

দ্বিতীয় বর্ষ
কোর্স কোডঃ SSC-2672
এসএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল : সেপ্টেম্বর ২০১৭
পুনমুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৮, জানুয়ারি ২০২০, ফেব্রুয়ারি ২০২২, মার্চ ২০২৩, মে, ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২৫
[বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত]

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ আশরাফুজ্জামান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-3132-5

মুদ্রণ
প্রিমিয়াম বিজনেস এ্যাসোসিয়েট লিমিটেড
প্যারামাউন্টস হাইটস (১৬ তলা), ৬৫/২/১
বক্স কালভার্ট রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু **পৃষ্ঠা**

ইউনিট-১: পৌরনীতি ও নাগরিকতা **১-১২**

পাঠ-১: পৌরনীতি ও নাগরিকতা---১
পাঠ-২: পৌরনীতি ও নাগরিকতার বিষয়বস্তু--- ৩
পাঠ-৩: পরিবার, পরিবারের শ্রেণিবিভাগ ও কার্যাবলি--- ৫
পাঠ-৪: সমাজ--- ৮
পাঠ-৫: রাষ্ট্রের উৎপত্তি---১০

ইউনিট-২: নাগরিক ও নাগরিকতা **১৩-২৮**

পাঠ-১: নাগরিক ও নাগরিকতা---১৩
পাঠ-২: নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি---১৬
পাঠ-৩: সুনাগরিক---১৮
পাঠ-৪: নাগরিক অধিকার ও অধিকারের শ্রেণিবিভাগ---২০
পাঠ-৫: তথ্য অধিকার আইন---২২
পাঠ-৬: নাগরিকের কর্তব্য ও কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ---২৫

ইউনিট-৩: আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য **২৯-৪২**

পাঠ-১: আইন---২৯
পাঠ-২: আইনের উৎস---৩১
পাঠ-৩: নাগরিক জীবনে আইনের শাসন---৩৩
পাঠ-৪: স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ---৩৫
পাঠ-৫: আইন ও স্বাধীনতা---৩৭
পাঠ-৬: সাম্য ও সাম্যের বিভিন্ন রূপ---৩৯
পাঠ-৭: সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক---৪১

ইউনিট-৪: রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা **৪৩-৬৪**

পাঠ-১: রাষ্ট্র---৪৩
পাঠ-২: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র---৪৫
পাঠ-৩: ক্ষমতার উৎস এবং রাষ্ট্র---৪৭
পাঠ-৪: ক্ষমতার বন্টন নীতি এবং রাষ্ট্র---৫০
পাঠ-৫: উত্তরাধিকার এবং রাষ্ট্র---৫২
পাঠ-৬: উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র---৫৪
পাঠ-৭: সরকার---৫৬
পাঠ-৮: ক্ষমতার বন্টন নীতি অনুসারে সরকার---৫৮
পাঠ-৯: আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অনুযায়ী সরকার---৬১

ইউনিট-৫: সংবিধান **৬৫-৭৬**
পাঠ-১: সংবিধানের ধারণা ---৬৫
পাঠ-২: সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ --৬৭
পাঠ-৩: উত্তম সংবিধান---৬৯
পাঠ-৪: সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি --৭১
পাঠ-৫: বাংলাদেশের সংবিধান ---৭৩

ইউনিট-৬: বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা **৭৭-৯৪**
পাঠ-১: বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ ---৭৭
পাঠ-২: শাসন বিভাগ ---৭৯
পাঠ-৩: রাষ্ট্রপতি --৮১
পাঠ-৪: প্রধানমন্ত্রী --৮৩
পাঠ-৫: মন্ত্রিপরিষদ---৮৫
পাঠ-৬: বাংলাদেশের আইনসভা ---৮৭
পাঠ-৭: বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ---৮৯
পাঠ-৮: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ---৯২

ইউনিট-৭: গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন **৯৫-১০৮**
পাঠ-১: রাজনৈতিক দল --৯৫
পাঠ-২: রাজনৈতিক দলের ভূমিকা---৯৭
পাঠ-৩: বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল ---------------------------------------৯৯
পাঠ-৪: গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল--- ১০১
পাঠ-৫: নির্বাচন --- ১০৩
পাঠ-৬: নির্বাচনী সংস্থা -- ১০৫

ইউনিট-৮: বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা **১০৯-১২৬**
পাঠ-১: স্থানীয় সরকার --- ১০৯
পাঠ-২: বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ------------------------------------- ১১১
পাঠ-৩: ইউনিয়ন পরিষদ -- ১১৩
পাঠ-৪: উপজেলা পরিষদ-- ১১৫
পাঠ-৫: জেলা পরিষদ-- ১১৭
পাঠ-৬: পৌরসভা -- ১১৯
পাঠ-৭: সিটি কর্পোরেশন --- ১২১
পাঠ-৮: বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা --- ১২৩

ইউনিট-৯: নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয় **১২৭-১৪২**
পাঠ-১: জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রতিকার -- ১২৭
পাঠ-২: খাদ্য নিরাপত্তা -- ১৩০
পাঠ-৩: সন্ত্রাস: কারণ ও প্রতিকার -- ১৩২
পাঠ-৪: পরিবেশগত বিপর্যয় --- ১৩৪
পাঠ-৫: নিরক্ষরতা-- ১৩৭
পাঠ-৬: নারী নির্যাতন: কারণ ও প্রতিকার -- ১৩৯

ইউনিট-১০: বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা **১৪৩-২০৪**
পাঠ-১: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি -- ১৪৩
পাঠ-২: পাকিস্থানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ভূমিকা ---------------------------- ১৪৬
পাঠ-৩: লাহোর প্রস্তাব -- ১৪৮
পাঠ-৪: ভাষা আন্দোলনের পটভূমি -- ১৫০
পাঠ-৫: ভাষা আন্দোলন -- ১৫৩
পাঠ-৬: পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি--- ১৫৭
পাঠ-৭: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন - --------------------------------------- ১৬১
পাঠ-৮: সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫) ------------------------- ১৬৫
পাঠ-৯: ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন-- ১৬৯
পাঠ-১০: উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান -- ১৭২
পাঠ-১১: ১৯৭০ সালের নির্বাচন-- ১৭৬
পাঠ-১২: অসহযোগ আন্দোলন -- ১৮৯
পাঠ-১৩: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা-- ১৮২
পাঠ-১৪: প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ ---------------------------------- ১৮৫
পাঠ-১৫: জেনোসাইড ও ১৯৭১ এর শরণার্থী -- ১৯০
পাঠ-১৬: মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা ----------------------------------- ১৯৪
পাঠ-১৭: মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত -- ১৯৯
পাঠ-১৮: স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও বিজয় দিবস ------------------------------ ২০১

ইউনিট-১১: বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন **২০৫-২১৮**
পাঠ-১: সার্ক -- ২০৫
পাঠ-২: জাতিসংঘ -- ২০৮
পাঠ-৩: জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক --------------------------------------- ২১০
পাঠ-৪: বিশ্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা -------------------------------- ২১২
পাঠ-৫: কমনওয়েলথ --- ২১৪
পাঠ-৬: ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) -- ২১৬

ইউনিট-১২: সুশাসন ও বাংলাদেশ **২১৯-২২৯**
পাঠ-১: সুশাসনের ধারণা -- ২১৯
পাঠ-২: সুশাসনের উপাদানসমূহ -- ২২১
পাঠ-৩: বাংলাদেশে সুশাসনের অবস্থা -- ২২৩
পাঠ-৪: বাংলাদেশে সুশাসনের অন্তরায়সমূহ--- ২২৫
পাঠ-৫: বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় -- ২২৭

? কোর্স বই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : পৌরনীতি ও নাগরিকতা **কোর্স কোড : (SSC-2672)**

এসএসসি প্রোগ্রামের পৌরনীতি ও নাগরিকতা বইটি এক বছরের জন্য পাঠ্য। বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামত সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একই সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে এনসিটিবি'র নতুন কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইটি স্বশিখন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্য বলা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী উদ্দেশ্য অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হল কি না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি ভূমিকা অবশ্যই বুঝে পড়তে হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে সার-সংক্ষেপ দেয়া আছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং ইউনিটের শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন দেয়া হয়েছে।

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্র নামক কল্যাণধর্মী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির সাথে নাগরিকের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা। সে লক্ষ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের উপাদান, রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা ও অধিকার, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুনাগরিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। তাই একটি রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ের কোর্স প্রণেতাগণ মনে করেন রাষ্ট্রের সম্যক ধারণা লাভের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য ও দেশ প্রেম বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তাও জানতে পারবে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে আজকের শিক্ষার্থীই আগামী দিনে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। তাই পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। পাঠ্যবইটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে এটি দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়ক পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

শিক্ষার্থীরা যাতে বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারে সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল :

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলো পড়ে এই পাঠ থেকে কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোন ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। পাঠের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভাল করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর অনুশীলন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কি না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবার পড়ুন।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মড্যুলের কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখান হল।

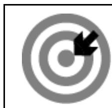	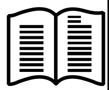		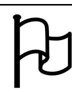				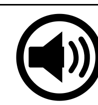	
উদ্দেশ্য	মূলপাঠ	সার-সংক্ষেপ	পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
অডিও/ভিডিও	শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এ সময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ ও কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর ও সমন্বয়কারীর পরামর্শ নিন।	**সুদীপ রায় ও শশী শবনম ঈষা** **কোর্স সমন্বয়কারী** **ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
(Civics and Citizenship)

ইউনিট ১

পৌরনীতি হল নাগরিকতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। আধুনিককালে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য অপরিহার্য এবং মর্যাদার। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্যের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। পৌরনীতি মূলত রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত জ্ঞান। নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচিত হয়। পৌরনীতি পাঠে নাগরিকেরা তাদের অধিকার ও কর্তব্য এবং রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়। পরিপূর্ণ জীবন গঠন ত্বরান্বিত হয়। তাই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের পৌরনীতি ও নাগরিকতা পাঠ অত্যন্ত জরুরি। এ অধ্যায়ে পৌরনীতির সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় যেমন- নাগরিকতা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-১.১ পৌরনীতি ও নাগরিকতা (Civics and Citizenship)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পৌরনীতি ও নাগরিকতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সিভিটাস, জাতি রাষ্ট্র, মর্যাদা, অংশগ্রহণ, চিন্তা চেতনা, সম্পর্ক

পৌরনীতি ও নাগরিকতা দুটি প্রত্যয়ের সমষ্টি। কিন্তু বিষয়বস্তু একই। পৌরনীতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics। Civics শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Civis এবং Civitas থেকে। Civis অর্থ হল নাগরিক (Citizen) এবং Civitas অর্থ হল নগর রাষ্ট্র। অর্থাৎ Civics মানে সে শাস্ত্র যা নগররাষ্ট্র বা রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে রাষ্ট্রের আলোচনায় নাগরিক আরও বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পৌরনীতি শাস্ত্রের যাত্রা শুরু মূলত প্রাচীন গ্রীসে। প্রাচীন গ্রীসে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ছিল। তৎকালীন গ্রীসের সকল জনসাধারণ নাগরিক ছিলেন না। কেবল যারা রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশ নিতেন তারাই নাগরিকত্ব লাভ করেন। তাই Civics নামক বিষয়টি ছিল কেবল রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত জ্ঞানের সমষ্টি। নগররাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক, কার্যাবলি, নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদিই আলোচিত হত।

এফ আই গ্লাউড বলেন "যে সকল অভ্যাস, প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস, কার্যাবলি ও চেতনার দ্বারা মানুষ রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং অধিকার ভোগ করতে পারে, তার অধ্যয়নই পৌরনীতি।

উপরের সংজ্ঞাগুলো থেকে পৌরনীতি বলতে কি বুঝায় তা স্পষ্ট। কিন্তু এই পৌরনীতি যখন নাগরিকের জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করে তখনই তা পৌরনীতি ও নাগরিকতা (Civics & Citizenship)।

সনাতন জ্ঞানের সাথে নাগরিক জীবনের আধুনিক চিন্তা চেতনা, কর্মসূচি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিন্নধর্মী সম্পর্কগুলো একত্রে আলোচনাই এর উদ্দেশ্য।

আধুনিককালে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্কে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলো আয়তনে যেমন বৃহৎ তেমনি জনসংখ্যাও বেশি। যেমন বাংলাদেশের আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ১৬ কোটির বেশি। তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। প্রাচীন গ্রীসের মত এখন কোন দেশেই সকল নাগরিকের পক্ষে শাসনকার্যে অংশ নেয়া বা সুযোগ দেয়া প্রায় অসম্ভব। তাই শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ধরণে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যুক্ত হয়েছে নানা ধরনের বিধি-বিধান। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নির্দিষ্ট বয়সের (১৮ বছর) পূর্বে শাসনকার্যে অংশ নিতে পারে না। কিন্তু সকল বয়সের নাগরিকগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ নাগরিকগণ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। নাগরিকদেরকে রাষ্ট্র প্রদত্ত এই মর্যাদার বিষয়টিই হল নাগরিকতা। বর্তমানে পৃথিবীতে যেমন- ফিনল্যান্ড, সুইডেন অনেকগুলো ঘোষিত কল্যাণমূলক রাষ্ট্র রয়েছে। সেসব রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হল নাগরিক। মূলত রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু নাগরিকের অবস্থান নিশ্চিত করাই পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় পাঠের মধ্য দিয়ে নাগরিকগণ সুনাগরিক হিসেবে তৈরি হয়, নাগরিক চেতনা, সুকুমার মনেবৃত্তির বিকাশ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় যা সুস্থ ও সুন্দর জীবন উপভোগ করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে নাগরিকেরা বিভিন্নভাবে অবহেলিত সে সব দেশে কিভাবে নাগরিকদের আরও অংশ গ্রহণমূলক করা যায় তার জন্য পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় জরুরি।

বিশ্বায়নের এই যুগে প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্মকান্ডই রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপুর্ণ। ভাল কাজ করলে তা আন্তর্জাতিকভাবে যেমন রাষ্ট্রের জন্য সুনাম বয়ে আনে তেমনি মন্দ কাজ করলে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হয়। বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গতির সাথে তাল মিলিয়ে নাগরিকের নাগরিক চেতনাও (Civics Sense) উন্নত হওয়া উচিত। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় অধ্যয়নে একজন নাগরিক সহজেই সুনাগরিকের গুনাবলি অর্জন করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৌরনীতি ও নাগরিকতাকে নিজের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করুন।

সারসংক্ষেপ

পৌরনীতি ও নাগরিকতা সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। যার উত্থান আজ থেকে আড়াই হাজার পূর্বে প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে। এটি নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত কার্যাবলি, অভ্যাস, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকের অধিকার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার নিমিত্তেই মূলত পৌরনীতি ও নাগরিকতা নামক জ্ঞানের সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। Civics শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষার শব্দ থেকে–

(ক) ফরাসি (খ) ইংরেজি (গ) ল্যাটিন (ঘ) হিব্রু

২। পৌরনীতি প্রত্যয়টির সাথে নাগরিকতা যুক্ত করার অর্থ কি?

i) কেবল নাগরিক বিষয়ে আলোচনা

ii) রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা

iii) রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক জোরদার করা

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) iii

পাঠ-১.২ পৌরনীতি ও নাগরিকতার বিষয়বস্তু (Content of Civics and Citizenship)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করে তা সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	অধিকার, কর্তব্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক

পৌরনীতি ও নাগরিকতা নামের মাঝেই এর বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু হল নাগরিক। রাষ্ট্রে বা প্রাচীন অর্থে পৌরের অধিবাসীর বিষয়বস্তুই পৌরনীতি ও নাগরিকতা'র বিষয়বস্তু। নিচে এর পরিধি আলোচনা করা হল-

১. নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়: পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের মূল আলোচ্য বিষয় হল নাগরিক ও নাগরিকের জীবনের সাথে জড়িত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল বিষয়। রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হিসেবে বসবাসের জন্য নাগরিকতা অর্জন, সুনাগরিকের গুনাবলী, প্রাপ্য অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে একজন নাগরিক সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

২. রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা: নাগরিকগণ তাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে থাকে। ভবিষ্যতে আর কী কী ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন হতে পারে, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও কার্যাবলি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক সবকিছু পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা: রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কেমন ভূমিকা পালন করবে তা পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় অধ্যয়ন করলে জানা যায়। যেমন স্থানীয় পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদে একজন নাগরিকের ভূমিকা, জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় সংসদে একজন নাগরিকের ভূমিকা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘে ভূমিকা সম্পূর্ণ আলাদা। পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের এ ধরনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে।

৪. নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত: পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের অতীত কর্মকান্ড, বর্তমান দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ভবিষ্যতে ভূমিকা কেমন হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। অতীতের ভূমিকা থেকে বর্তমানে নাগরিকগণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করতে পারে। তাই পৌরনীতি ও নাগরিকতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

৫. আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ: বিভিন্ন রাষ্ট্রের অতীত গৌরব, রাষ্ট্র নায়কের ভূমিকা, সম্মোহনী নেতৃত্ব যেমন স্থান পায়, তেমনি কোন রাষ্ট্র কেন পতন হল তাও আলোচিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নাগরিকের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই পৌরনীতি ও নাগরিকতার আইন, সাম্য, স্বাধীনতা, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ইত্যাদি বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকে। যেমন এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি আইন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্ম, নীতি আদর্শ, নেতৃত্বও নিয়েও ব্যাখ্যা থাকে। এর ফলে নাগরিকগণ বাহ্যিক ও আত্মিক উভয়ভাবেই নিয়ন্ত্রণে থাকে। এভাবে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন নিশ্চিত হয়।

আলোচনা থেকে জানা যায় যে, পৌরনীতি, পুরের বা নগরের অধিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করে। এর সাথে জড়িত থাকে নাগরিকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়। সনাতনী বিষয়গুলো ছাড়াও এখন পৌরনীতি ও নাগরিকতায়

মানবিক নিরাপত্তা, শান্তি ও সংঘর্ষ, নারীর ক্ষমতায়ন, শাসন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির প্রয়োগ বেশ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টিতে নাগরিকের সুকুমার মনোবৃত্তির বিকাশ ও আরও উন্নত জীবন-যাপন নিশ্চিত করায় তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সৃষ্টির জন্যই এর অধ্যয়ন।

শিক্ষার্থীর কাজ	একজন নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা কোন বিষয়ের কোন অংশে আলোচিত হবে?

সারসংক্ষেপ

পৌরনীতি ও নাগরিকতা, নগর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র, নাগরিকের জীবন সব কিছু নিয়ে আলোচনা করে। নাগরিকের মর্যাদা, অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ জাতীয়, আইন সাম্য, স্বাধীনতা, নীতি নৈতিকতা আদর্শ ইত্যাদি সকল দিক এর অন্তর্ভূক্ত। পরিধির বিস্তৃতি এ বিষয়টিকে অনন্য করেছে। আধুনিক নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আরও নতুন নতুন অনেক বিষয় যোগ হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পৌরনীতি ও নাগরিকতা এর কেন্দ্র বিন্দু কী?
ক) পৌর বা নগর (খ) রাষ্ট্র (গ) জাতি সংঘ (ঘ) নাগরিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

করিম খুবই বিজ্ঞানমনস্ক ছেলে। বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশোনা ও কাজকর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর বন্ধুদের সাথে ঘুরতে বের হয়ে অনেকটা বেসুরো হয়ে যায়। অন্যান্য বন্ধুরা অনেক সময় দেশের রাজনৈতিক বিষয় ও নাগরিক সমস্যা-সুবিধা নিয়ে কথা বলে। কিন্তু করিম এসবে কোন আগ্রহ দেখায় না।

২। করিমের কোন বিষয়ের জ্ঞানের অভাব রয়েছে?
ক) পদার্থবিজ্ঞান (খ) গণিত (গ) রসায়ন (ঘ) পৌরনীতি ও নাগরিকতা

৩। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের আলোচনা হল−
i) নাগরিকের আচার-আচরণ
ii) নাগরিকের ব্যক্তিগত বিষয়
iii) নাগরিকের স্থানীয় বিষয়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও iii গ) i, ii ও iii ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১.৩ পরিবার, পরিবারের শ্রেণীবিভাগ ও কার্যাবলি
(Family, Classification of Family and Necessity of Family)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবার কাকে বলে জানতে পারবেন।
- পরিবারের শ্রেণি বিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পরিবারের কার্যাবলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আদি প্রতিষ্ঠান, রক্তের বন্ধন, অনু পরিবার, নৈতিক আদর্শ, ধর্মীয় মূল্যবোধ।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও চিরন্তন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। মানুষ সামাজিক জীব। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব মানুষের জন্য দুর্বিষহ ও পীড়াদায়ক। তাই মানুষ একাকী বসবাস করতে চায় না। বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তের বন্ধন হল পরিবারের ভিত্তি। বয়োজ্যেষ্ঠ ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তিই হল পরিবারের কর্তা। সামাজিক রীতিনীতি এবং নৈতিক বিধি-বিধান দ্বারা পরিবার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং বলেন, "সমাজ স্বীকৃত পন্থায় সন্তান-সন্ততির অধিকারী এক বা একাধিক পুরুষ এবং এক বা একাধিক মহিলার দ্বারা গঠিত সামাজিক সংস্থাকে পরিবার বলে।"
সমাজবিজ্ঞানী আর.এম.ম্যাকাইভার ও সি.এইচ.পেজ বলেন, "সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের জন্য যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র ও স্থায়ী সংঘ হল পরিবার।"
সমাজবিজ্ঞানী এম.এফ.নিমকফ বলেন, পরিবার হচ্ছে এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।

অর্থাৎ সমাজ স্বীকৃত পন্থায় নারী ও পুরুষ সন্তান-সন্ততিসহ বা ছাড়া একত্রে বসবাস করলে সে সংঘটিকে পরিবার বলা যায়।

পরিবারের শ্রেণি বিভাগ
পরিবার হল আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সময়ের বিবর্তনে পরিবার নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণি বিভাগ নিম্নে বর্ণনা করা হল–

১. বংশানুক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাগ:

(ক) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার: যে পরিবারের সন্তান পিতার বংশধর হিসেবে গণ্য হয় এবং সন্তানের পরিচয় পিতার পরিচয়ের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয় সেই পরিবারকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। এ ধরনের পরিবারে পিতা বা উপার্জনক্ষম বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই পরিবারের কর্তা।

(খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার: যে পরিবারের সন্তান মায়ের বংশধর হিসেবে পরিচিত এবং পরিচয় নির্ধারিত হয় তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারে মাতা বা উপার্জনক্ষম বয়োজ্যেষ্ঠ নারীই পরিবারের কর্ত্রী। আসামের খাসিয়া উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

২. বিবাহের ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাগ:

(ক) একপত্নিক পরিবার: যে পরিবারে স্বামীর একজন স্ত্রী এবং স্ত্রীরও একজন স্বামী থাকে সে পরিবারকে একপত্নিক পরিবার বলে।

(খ) বহুপত্নিক পরিবার: যে পরিবারে স্বামীর একাধিক স্ত্রী একসাথে থাকে সে পরিবারকে বহুপত্নিক পরিবার বলে।

(গ) বহুপতি পরিবার: বহুপতি পরিবার বলতে সেই পরিবার ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকে।

৩. কাঠামোভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ:

(ক) একক পরিবার: যখন স্বামী ও স্ত্রী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততিরা একত্রে বসবাস করে তখন তাকে একক পরিবার বলে।

(খ) যৌথ পরিবার: যে পরিবার দাদা-দাদী, পিতা-মাতা ও নাতি-নাতনি নিয়ে গড়ে ওঠে সে পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তি হলো যৌথ পরিবার।

(গ) অণু পরিবার: অণু পরিবার হল সে ধরনের পরিবার যেখানে একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থাকে। অণু পরিবার হল পরিবারের ক্ষুদ্র ও সর্বাধুনিক রূপ।

পরিবারের কার্যাবলি

পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে থাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে পরিবারের কার্যাবলি উল্লেখ করা হল।

১। সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন : সমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর অসহায় অবস্থা থেকে শিশুর স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত সেবা ও প্রতিপালনের কাজ পরিবার সুষ্ঠুভাবে করে থাকে।

২। অর্থনৈতিক কার্যাবলি : পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সকল পরিবারই তার অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক চাহিদা সাধ্যমত পূরণ করে।

৩। সামাজিকীকরণ : পরিবারের মধ্যেই শিশু সমাজে প্রচলিত নিয়মানুবর্তিতা, বিধি-ব্যবস্থা, নৈতিক আদর্শ, আচার-আচরণ, আদব-কেতা প্রভৃতির সাথে পরিচিত হয় এবং অর্জন করে। শিশুর সামাজিকীকরণের হাতে-খড়ি পরিবারেই হয়ে থাকে।

৪। শিক্ষামূলক কাজ : শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদিত হয় পরিবারেই। পরিবারকে বলা হয় ‘প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র’। পরিবারের তত্ত্বাবধানেই শিশু শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করে। এছাড়া শিশু শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি গুণাবলি পরিবার থেকে শিক্ষালাভ করে।

৫। মনস্তাত্ত্বিক কাজ : শিশু তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে স্নেহ- ভালোবাসা পায় তা তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। শিশুরা বড় হলে তারাও স্নেহ- ভালোবাসার অধিকারী হয়। তাই পরিবার হল মানসিক প্রবৃত্তি সাধনের অনন্য প্রতিষ্ঠান।

৬। ধর্মীয় কাজ : পরিবারের মধ্যেই সন্তান-সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষা সম্পাদিত হয়ে থাকে। ধর্মীয় রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাথে শিশুরা পরিবারে পরিচিত হয়। যা শিশুর মনে ধর্মীয় অনুরাগ এনে দেয়।

৭। অবকাশমূলক কাজ ; এক সময় পরিবারই ছিল অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের একমাত্র কেন্দ্র। মানুষ সারাদিনের কাজ শেষে ঘরে ফিরে পরিবার-পরিজনদের সাথে গল্প-গুজব, খেলা-ধূলা, গান-বাজনা ইত্যাদি করে অবসর বিনোদন করত। বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, বই-পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পারিবারিক বিনোদন করা হয়।

৮। রাজনৈতিক কার্যাবলি : শিশুরা পরিবারের মাধ্যমেই দায়িত্ব, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করে, যা সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে সকল জ্ঞান শিশুরা পরিবার থেকেই অর্জন করে।

অতএব, বলা যায়, পরিবার হল আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মাধ্যমেই একটি শিশু যথার্থ জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ সুনাগরিক হয়ে উঠে। তাই এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনন্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

আদি এবং চিরন্তন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার স্বীকৃত। পরিবারের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ থাকলেও কার্যের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পরিবারের মাধ্যমেই শিশু বিকশিত হয় এবং পরিবারের মাধ্যমেই শিশু পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্য শিখে নেয়। প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোনটি আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান?
ক) সমাজ খ) পরিবার গ) গোত্র ঘ) উপজাতি

২। পরিবারের ভিত্তি হল−
ক) স্নেহ-ভালবাসা খ) ঘনিষ্ঠ মেলামেশা গ) রক্তের সম্পর্ক ও বিবাহ ঘ) প্রেম-ভালবাসা

৩। মানুষ সৃষ্টি করেছে−
i) সমাজ ii) রাষ্ট্র iii) সৌর জগৎ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i ও ii

৪। পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসা পেলে শিশু কেমন হয়?
i) কর্তব্য পরায়ণ
ii) কাণ্ডজ্ঞানহীন
iii) সুনাগরিক

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৪ সমাজ (Society)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমাজের অর্থ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সমাজের ক্রমবিকাশ বলতে পারবেন।
- সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মৌলিক প্রয়োজন, উপজাতি, গোষ্ঠী, রক্তের সম্পর্ক, নৈতিক মূল্যবোধ

সমাজ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Society'। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Socious' থেকে যার অর্থ- সহযোগিতা বা পারস্পরিক বন্ধুত্ব। সমাজ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের স্থান। মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের সূচনা ঘটে সমাজে। মানুষ সমাজেই জন্মগ্রহণ করেন, সমাজেই লালিত-পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। এখানে মানুষ তার খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা লাভ করে থাকে। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির সমগ্র জীবন আবর্তিত হয়। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা।"

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, 'সমাজ মানুষের বহুবিধ সামাজিক সম্পর্কের এক সামগ্রিক পদ্ধতি'। সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্গ বলেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের সেই জাল, যা দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাদের সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই বলা যায়, সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।"

সমাজের ক্রমবিকাশ

সমাজের উৎপত্তি কখন, কীভাবে হয়েছে এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করে সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সমাজের ক্রমবিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে পরিবার। পরিবার রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐক্য বদ্ধ থাক। পরিবার থেকে সৃষ্টি হয় নানা গোষ্ঠী, উপজাতি। এসব গোষ্ঠী ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। এরূপ বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীই কালের বিবর্তনের সমাজে পরিণত হয়।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

১। ঐক্য : ঐক্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্ম, ভাষা, অভ্যাস, মনোভাব, কৃষ্টি ও আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে।

২। স্বায়িত্ব ; সমাজ চিরস্থায়ী বর্গ। তবে সময়ের সাথে সাথে মানব সভ্যতা ও সমাজের রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এ রূপান্তর ধারাবাহিক সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে।

৩। সাধারণ উদ্দেশ্য : একটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে ওঠে। আর এ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিচ্ছিন্ন জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং একে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে।

৪। বৈচিত্র্য : সমাজ একটি বিচিত্ররূপের মানবিক সংগঠন। সমাজে পারস্পরিক ঐক্য-অনৈক্য, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, সহযোগিতা-বিরোধিতা, অবহেলা-সহমর্মিতা, হাসি-কান্না সবকিছুই বিদ্যমান।

৫। নৈতিক মূল্যবোধ : সমাজের ভিত্তি হল নৈতিক মূল্যবোধ। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিকতা। স্নেহ-মায়া-মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদির সমষ্টিই মূল্যবোধ। সমাজ এ সকল মূল্যবোধের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে।

অতএব বলা যায়, সমাজ সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা মানুষকে মূল্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

সমাজের উদ্দেশ্য

মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই করাই সমাজের মূল উদ্দেশ্য। সমাজের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১। নিরাপত্তা প্রদান : সমাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে ব্যক্তি জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা-বিধান করা।

২। ব্যক্তিত্ব বিকাশ : সমাজের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয়। সমাজ মানুষের মানবিক গুণাবলিকে পারস্পরিক লেনদেন ও সাহচর্যের বন্ধনে বিকশিত করে থাকে।

৩। মৌলিক চাহিদা পূরণ : সমাজ নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। সমাজে মানুষ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন পথ খুঁজে নেয়।

৪। শিক্ষা ও সচেতনতা দান : সমাজের মধ্যেই মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও চেতনার বিকাশ ঘটে। শিক্ষা মানুষের আত্মবিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

৫। সংকীর্ণতা দূরীকরণ : সমাজ জাতীয় প্রগতির সাথে ব্যক্তির কল্যাণের সমন্বয় সাধন করে। স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মনোভাবকে দূর করতে সমাজ কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

অতএব, ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার মাধ্যম সমাজ মানুষের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন। সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সমাজ হচ্ছে একটি মানবীয় সংগঠন। সমাজ ছাড়া কোন সভ্য, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের কথা কল্পনা করা যায় না। পরস্পর নির্ভরশীলতা সমাজস্থ মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে সমাজের মানুষ তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। মানুষ কোন ধরনের জীব?
ক) সামাজিক খ) রাজনৈতিক গ) অর্থনৈতিক ঘ) সাংস্কৃতিক

২। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে–
i) ধন সম্পদ অর্জনের জন্য
ii) ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য
iii) সংকীর্ণতা দূর করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। মানুষ সামাজিক জীব হলেও কিছু মানুষ সমাজের বাইরে বাস করে, তারা হলেন–
i) ফকির-সন্যাসী
ii) মুনী ঋষি
iii) শিক্ষক, সমাজকর্মী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Evolution of State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিধাতার প্রতিনিধি, প্রকৃতির রাজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনৈতিক চেতনা, রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কখন, কোথায় এবং কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে সঠিক কোন ঐতিহাসিক দলিল বা প্রমাণ নেই। তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অতীত ইতিহাস, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলো হচ্ছে: ১। ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ ২। বল প্রয়োগ মতবাদ ৩। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ ৪। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ ৫। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ৬। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

১। ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঈশ্বর বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদই সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এ মতবাদের মূল কথা হল ঈশ্বর বা বিধাতা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রের রাজা বা শাসক বিধাতার প্রেরিত প্রতিনিধি। শাসক বিধাতার নির্দেশেই শাসন কাজ পরিচালনা করে থাকেন। তাই শাসকের আদেশ অমান্য করা রাষ্ট্রীয় অপরাধ। কেননা তাঁর আদেশ-নির্দেশ স্বয়ং বিধাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত। শাসকের আদেশ অমান্য করার অর্থ হল বিধাতাকে অমান্য করা। রাজা জনগণের প্রতিনিধি নয় বরং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা তাঁর কাজকর্মের জন্য জনগণের কাছে নয়, ঈশ্বরের কাছে দায়ী থাকবেন। এ মতবাদের সমর্থক ছিলেন মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট টমাস এ কুইনাস, ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস এবং তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস।
সমালোচনা: আধুনিক যুগে গণতন্ত্র ও প্রগতির ধারায় ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং, এ মতবাদ ভ্রান্ত, অচল, স্বৈরাচারী, অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক।

২। বল প্রয়োগ মতবাদ : বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হল– বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং বলের দ্বারা রাষ্ট্র শাসিত হয়। মানুষ স্বভাবত কলহপ্রিয়, ক্ষমতালিপ্সু এবং কর্তৃত্বপরায়ণ। এ ভাবে ধীরে ধীরে গোত্র-গোত্রে, রাজায়-রাজায় বল প্রয়োগ করে একজন আরেকজনকে পরাজিত করে তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে লাগল। বিজয়ীরা শাসক হল এবং পরাজিতরা সে শাসকের অধীনস্থ প্রজা হল। এভাবে জোর যার মুল্লুক তার নীতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র নামক একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। ডেভিড হিউম, জেংকস্, জেলেনিক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ মতবাদের সমর্থক।
সমালোচনা: রাষ্ট্রের মত একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান। বল প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং এ মতবাদ অযৌক্তিক, মানবতা বিরোধী ও অবিশ্বাস্য।

৩। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ : পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের একটি স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ক্রমাগত সম্প্রসারণই রাষ্ট্র। বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ প্রধানের বংশের দিক হতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বংশ গণনা করা হত। এভাবে পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে বহু পরিবারের সৃষ্টি করে এবং উপজাতিতে পরিণত হয়। এ উপজাতির প্রধান হন প্রথম পরিবারের যিনি প্রধান ছিলেন তিনি। এভাবে কয়েকটি উপজাতি একত্রিত হয়ে একটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তা হলেন স্যার হেনরী মেইন, মরগান, জেংকস প্রমুখ চিন্তাবিদ।
সমালোচনা: পিতৃতান্ত্রিক পরিবার মানব সমাজ বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু তাই বলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার যে রাষ্ট্র সৃষ্টির একমাত্র ও প্রধান উপাদান এ মতবাদের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

৪। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ : মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের মূল বিষয় হল– মাতৃপ্রধান পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। আদিম সমাজে বিবাহ প্রথা ছিল না। কয়েকজন পুরুষ মিলে একজন নারীকে কেন্দ্র করে পরিবার গঠন করে। ঐ নারীরাই

ছিল পরিবারের প্রধান। একটি পরিবারে একাধিক পুরুষ থাকায় পুরুষের মাধ্যমে নয় বরং পরিবারের একমাত্র পরিচালক হওয়াতে মহিলার দিক থেকেই বংশ পরিচয় গণনা করা হত। এভাবে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলো সম্প্রসারিত হয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। এমতবাদের সমর্থক ছিলেন– মর্গান, জেংকস, ম্যাকলিনান প্রমুখ চিন্তাবিদ।
সমালোচনা: ইতিহাসে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তবে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এরূপ কোন নজির নেই।

৫। সামাজিক চুক্তি মতবাদ : সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি লাভের পূর্বে মানুষ 'প্রকৃতির রাজ্য' বসবাস করত এবং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। প্রকৃতি রাজ্যে মানুষ প্রাকৃতিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু একসময়ে প্রাকৃতিক আইনের কার্যকারিতা ও প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করা অনিশ্চিত ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরূপ অনিশ্চিত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় ও সুচিন্তিতভাবে পরস্পর চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে। চুক্তির দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক সংগঠনের হাতে মানুষ সমল ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক অধিকার হস্তান্তর করে। বিপরীতে তারা সামাজিক অধিকার হস্তান্তর করে। বিপরীতে তারা সামাজিক অধিকার ও নিরাপত্তা লাভ করে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তাগণ চুক্তি তত্ত্বের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেও একটি বিষয়ে সকলে একমত যে, জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এ মতবাদের সমর্থক হলেন– প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্টগণ, গ্রিক চিন্তাবিদ প্লেটো, এরিস্টটল, রোমানচিন্তাবিদ পলিবিয়াস, ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস্, জন লক এবং ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো।
সমালোচনা: মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে কোন চুক্তির মাধ্যমে নয়। স্যার হেনরি মেইন সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 'অসার', টমাস হিল গ্রীন একে 'উপন্যাস'; বেথাম একে 'প্রমোদ ধ্বনি' এবং ভলটেয়ার একে 'বন্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৬। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদসমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত। বর্তমান আধুনিককালে তাই এ মতবাদ সর্বজন স্বীকৃত। যদিও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা নির্ধারিত হয়নি তথাপি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাষ্ট্র ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র বিধাতা কর্তৃক হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয় নি, এটি বল প্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয় নি; একটি মানুষর চুক্তিরও ফল নয়। এ মতবাদের মূল কথা হল, মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক বার্জেস যথার্থই বলেছেন, "রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ফল।" কিন্তু কোন একক ঐতিহাসিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি বরং রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি উপাদানের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এ মতবাদের অন্যান্য সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে অধ্যাপক গার্নার, ম্যাকাইভার, লীকক্ প্রমুখ চিন্তাবিদ।
তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

মানব কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। তবে এই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হঠাৎ করে হয় নি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য রয়েছে। অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, কেউ কেউ বলেন পিতা বা মাতা অথবা বল প্রয়োগ বা কোন চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তবে আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মোটামুটি একমত যে বিবর্তনের ধারায় রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক চেতনার সংমিশ্রণে ব্যক্তির ইচ্ছায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল এ প্রসঙ্গে বলেন, "মানুষের মৌলিক প্রয়োজনে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ কোনটি?
ক) ঐশ্বরিক মতবাদ খ) ঐতিহাসিক মতবাদ গ) বল প্রয়োগ মতবাদ ঘ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে নিচের কোন্ কোন্ উপাদানের সমন্বয়ে?
i) রক্তের সম্পর্ক
ii) যুদ্ধ-বিগ্রহ
iii) রাজনৈতিক চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক ও খ রাষ্ট্রের অবস্থান পাশাপাশি। ক রাষ্ট্র তার পাশ্ববর্তী দুর্বল 'গ' রাষ্ট্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে দখল করে নেয়। খ রাষ্ট্র সেই ভয়ে তার পাশ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে কালক্রমে সকলে মিলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
ক) দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন?
খ) রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কি?
গ) 'খ' রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পেছনে কোন মতবাদ কাজ করে?
ঘ) ক রাষ্ট্র কর্তৃক গ রাষ্ট্রকে দখল করে নেয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদের সমর্থন করে। ব্যাখ্যা দিন।

২। জনাব পারভেজ এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই কর্মজীবী হওয়ায় তাদের একমাত্র পুত্র রিপনকে ছোটবেলা থেকেই হোস্টেলে রেখে পড়াশুনা করান। ছুটিতে বাড়ি আসলেও তাদের ব্যস্ততার কারণে ছেলেকে বেশি সময় দিতে পারেন নাই। ছেলে বেশিরভাগ সময় একা একা কাটান। সামাজিকতা তেমন বুঝেন না। তেমনিভাবে নিজের সুখ-দু:খ কারো সাথে ভাগাভাগি করতে পারেন না কিংবা অন্যের দু:খ-সুখও তেমনভাবে তাকে নাড়া দেয় না। একদিন পারভেজ তার বন্ধু রমিজের বাসায় বেড়াতে গেলে তার ছেলে দরজা খুলেই সালাম ও কুশল বিনিময় করে। তাকে সম্মানের সাথে বসিয়ে বাবাকে ডেকে দেন এবং নিজেই চা-নাস্তা নিয়ে আসে। পারভেজ মুগ্ধ হন এবং নিজের ছেলেকে এভাবে গড়ে তুলতে পারেন নাই বলে অনুতপ্ত হন।
ক) পারিবারিক কাঠামো অনুসারে পরিবার কত প্রকার ও কী কী?
খ) রমিজের ছেলের শিষ্ঠাচার ও ভদ্র ব্যবহার পরিবারের কোন ধরনের কাজের ফল?
গ) রিপনের মানসিক বিকাশ সমৃদ্ধ না হওয়া পরিবারের কোন কাজের ব্যর্থতার কারণে?
ঘ) ছেলেকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য জনাব রমিজের পরিবারের যে কাজটির ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ : ১। ক ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ : ১। ঘ ২। ঘ

নাগরিক ও নাগরিকতা
(Citizen and Citizenship)

ইউনিট ২

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে নাগরিক হল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। নাগরিকের– জীবন, অধিকার, কর্তব্য, নাগিরক হিসেবে তার পরিচয় এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য পৌরনীতির মূল উপজীব্য। অতীতে গ্রীক নগর রাষ্ট্রের যেমন সকল অধিবাসী রাষ্ট্রের নাগরিক হত না তেমনি বর্তমানেও কোন ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রে বসবাস করলেও সে নাগরিক নাও হতে পারে। অর্থাৎ নাগরিক হবার জন্য তাঁর একটি স্বীকৃতি প্রয়োজন হয়। এই ইউনিটে নাগরিকতা, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, সুনাগরিকের গুণাবলি, অধিকার ও কর্তব্য এবং অধিকার ও কর্তব্যের সার্বিক নিয়ে আলোচনা থাকবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-২.১ নাগরিক ও নাগরিকতা (Citizen & Citizenship)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিক কে তা জানতে পারবেন।
- নাগরিকতার ধারণা লাভ করবেন।
- নাগরিক হওয়ার শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	নগর, অধিবাসী, অংশগ্রহণ, প্রজা, বিদেশী, আনুগত্য

নগরের প্রাণ হলো তার অধিবাসী। সাধারণভাবে নগরে বসবাসরত সব অধিবাসীই নাগরিক হবার কথা। কিন্তু পৌরনীতিতে সকল অধিবাসী নাগরিক নয়। এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল বলেন নগরের শাসনকার্যে যে সকল অধিবাসী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কেবল তারাই নাগরিক। নাগরিক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো "Citizen" অনেক অধিবাসী আবার নগরের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ না করতে পারলেও রাষ্ট্রের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেসব অধিবাসীর অবস্থান নিয়ে অনেক ধরনের মতামত রয়েছে। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে আসছে আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে। তারও অনেক পরে নগর, রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নাগরিক এর ধারণা অনেকটা আধুনিক একটি প্রত্যয়। অনেক পরিবর্তন হয়ে নাগরিক শব্দটির এক বিশেষ অর্থ হয়ে উঠেছে। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে ও জনসংখ্যায় অনেক বড়। ফলে প্রত্যেক অধিবাসীর পক্ষে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। অবস্থার প্রেক্ষিতে নাগরিক এর ধারণাও পরিবর্তন হয়েছে। এখন একজন অধিবাসী যদি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তবে তাকে নাগরিক বলা হয়। প্রাচীন গ্রীসে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে যে সকল অধিবাসী রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতো কেবল তারাই নাগরিক বলে পরিচিত হত। তাছাড়া যেকোন

নগরে বসবাসকারী অধিবাসীদেরকেও নাগরিক বলা হত। আধুনিককালে রাষ্ট্রে কে নাগরিক আর কে নাগরিক নয় তা নির্দিষ্ট আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ এটি বর্তমানে আইনগত বিষয়।

অন্যদিকে নাগরিক হিসেবে তাদের আচার-আচরণ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা হলো নাগরিকতা। নাগরিকতা একজন নাগরিকের মানসিক অবস্থা। অন্যকথায় নাগরিক হিসেবে একজন অধিবাসীর অবস্থান এর বিষয়টি হল নাগরিকতা। নাগরিকতার সাথে নাগরিকের গুনাবলি, রাষ্ট্র থেকে নাগরিকের অধিকার ও রাষ্ট্রের স্বার্থে আত্মত্যাগ করার মতো বিষয়গুলো জড়িত। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি রাষ্ট্র অধিক প্রাধান্য দেওয়ায় নাগরিকতা বিষয়টি আজ খুব গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়।

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে লাস্কি'র মতে "কোন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকেই নাগরিক বলে।" অন্যদিকে তিনি বলেন "সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির লব্ধ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই নাগরিকতা"।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যান্স কেলসন বলেন "নাগরিকতা হচ্ছে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির স্ট্যাটাস বা মর্যাদা।"

নাগরিক শব্দটির অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝার জন্য প্রজা ও অধিবাসী এ দুটি শব্দের অর্থও জানা প্রয়োজন।

প্রজা হল রাষ্ট্রে বসবাসকারী যারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে কিন্তু রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল অধিকার ভোগ করতে পারে না। প্রজারা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সকল কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। রাজা-বাদশাগণের সময়কালে প্রজা শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হত। কেননা তখন প্রজারা শাসকদের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারতো না। কেউ যদি বলতে সাহস দেখাত তাকে অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হত। এছাড়া বিট্রিশ শাসন আমলে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত জনগণও প্রজা হিসেবেই পরিগণিত হত।

অন্যদিকে-রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অধিবাসী। একজন বিদেশীও অধিবাসী হতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে একটি দেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীই ছিলেন অধিবাসী। এক্ষেত্রে কিছু অধিকার ভোগের বিষয় জড়িত। একজন ব্যক্তি যখন কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল অধিকার ভোগ বা দাবি না করতে পারে তখন সে অধিবাসীর পর্যায়ে পড়ে।

বিদেশী- যে ব্যক্তি অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। তবে সাময়িকভাবে অনুমতি নিয়ে কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই বিদেশী। বিদেশীরা সাধারনত নানা ধরনের শর্ত সাপেক্ষে কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে। বিদেশীরা ইচ্ছে করলে শর্ত পূরণ করে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে।

নাগরিকতার প্রকাশ

সাধারণত একজন অধিবাসীর কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস, রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির নাগরিকতার প্রকাশ পায়। তবে দেশপ্রেমের মাধ্যমে নাগরিকতার প্রকৃত প্রকাশ ঘটে থাকে। নাগরিকতা প্রকাশের বিষয়টি নাগরিক ও রাষ্ট্র উভয়ের উপরই নির্ভরশীল। কেননা একজন নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি খুব দায়িত্বশীল, অনুগত ও দেশপ্রেমিক হয় তাহলে রাষ্ট্র অনেক বেশি উন্নতি লাভ পারে, অন্যদিকে রাষ্ট্র যদি উন্নত হয় তবে রাষ্ট্র থেকে নাগরিকগণ মৌলিক অধিকারসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকে। তবে আদর্শ নাগরিকগণ অনেক সময় রাষ্ট্র থেকে কি পেল, তা না ভেবে রাষ্ট্রকে কি দিতে পারল তাই ভেবে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নাগরিক ও নাগরিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন

সারসংক্ষেপ

সাধারণত একটি রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক। তবে নাগরিক হবার জন্য অতীতে যেমন নানাবিধ শর্ত ছিল বর্তমানেও কিছু কিছু শর্ত রয়েছে। প্রত্যেকেরই মৌলিক ও কিছু মানবাধিকার থাকে, যা কেবল একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হলেই ভোগ করা সম্ভব। একজন নাগরিক যখন নিজেকে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দাবি কওে তখন তার নাগরিকতা প্রকাশ পায়। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে থাকে রাষ্ট্রের মাধ্যমেই নাগরিকতার প্রকাশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

বহুনির্বাচনী অভিক্ষা

১। "সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির লব্ধ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই নাগরিকতা"- উক্তিটি কার?

ক. এরিস্টটল খ. লাস্কি গ. লর্ড ব্রাইস ঘ. ফাইনার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

অনুপম একজন ব্যবসায়ী। এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে তিনি প্রচুর অনুদান দিয়ে থাকেন। তিনি নির্বাচন এলে ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমেও তেমন একটা অংশগ্রহণ করেন না। তিনি প্রায় সময়ই রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুনের প্রতি উদাসীন থাকেন।

২। আলোচ্য উদ্দীপকে ব্যবসায়ী অনুপম এর মাঝে কিসের অভাব রয়েছে?

ক. দেশপ্রেমের খ. ভালোবাসার গ. নাগরিকতার ঘ. উদারতার

৩। নাগরিক হিসেবে অনুপম এর কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে

i. বাংলাদেশের নাগরিক নয়

ii. রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয়

iii. রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ. i ii গ. ii iii ঘ. i iii

পাঠ-২.২ নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Methods of Acquiring Citizenship)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি তা জানতে পারবেন।
- কোন পদ্ধতিতে কিভাবে নাগরিক হওয়া যায় তা বুঝতে পারবেন।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কে শিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জন্মসূত্র, অনুমোদন, অর্জন, বিলোপ, দ্বৈত নাগরিকত্ব

নাগরিক একটি সহজ ও সরল শব্দ কিন্তু এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রত্যয়। কেননা যখন একজন অধিবাসী কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয় তখন এর সাথে কিছু অধিকারের বিষয় চলে আসে। যেগুলো কেবল নাগরিক হলেই পাওয়া সম্ভব। ফলে সকল ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে চায়। তবে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হবার জন্য রাষ্ট্র স্বীকৃত কয়েকটি পদ্ধতি বা আইন রয়েছে। একজন অধিবাসী দুইভাবে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। যেমন-(১) জন্মসূত্রে (২) অনুমোদনসূত্রে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা

কোন ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তিনি সে দেশের নাগরিকতা লাভ করে থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রে সাধারনত এভাবেই নাগরিকতা নির্ণয় করা হয়। এ ক্ষেত্রে বয়সের কোন বিধি-নিষেধ নাই। যেমন বাংলাদেশে জন্ম নেয়া সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। তবে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য এ ধরনের নাগরিকতা বাতিল হতে পারে। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই এই ধরনের নাগরিকতা অর্জন স্বীকৃত ও পরিচিত। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন আবার দুই রকম হয়ে থাকে। একটি হল জন্ম নীতি অন্যটি জন্মস্থান নীতি। জন্মনীতি অনুযায়ী কোন সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তিনি সে রাষ্ট্রেরই নাগরিক হয়ে থাকে। আবার জন্মস্থাননীতি অনুযায়ী সন্তান যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে তার পিতা-মাতার জন্মস্থান অনুযায়ী নাগরিকত্ব পাবে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনে কোন শর্তের প্রয়োজন হয় না। তবে আধুনিককালে কোন সন্তানের পিতা-মাতা ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক না হলে সেখানে নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের পরই সে সন্তান নাগরিক বলে গন্য হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশী পিতা-মাতার কোন সন্তান যদি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে তবে সে আমেরিকার নাগরিক হবে। আমেরিকায় জন্ম নেয়া সেই সন্তান আবার বাংলাদেশেরও নাগরিক। নাগরিকতা সম্পর্কিত আইন অনেক সময় পরিবর্তন হয়।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব

কোন রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকতার শর্ত পূরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করলে একজন বিদেশী একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। এভাবে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হলে সে অনুমোদনসূত্র নাগরিক হয়েছে বলে গণ্য হবে। যেমন-কোন বিদেশী নাগরিক এক বছর ছয় মাস বাংলাদেশে বসবাসের পর যদি নাগরিকতার জন্য আবেদন করে তবে তাকে এ দেশের নাগরিকতা দেওয়া হতে পারে। রাষ্ট্রের কোন বিষয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকলে সম্মানস্বরূপ তাকে রাষ্ট্রের নাগরিকতা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক কোচ গর্ডন গ্রীনিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে এ দেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। এই নাগরিকত্ব বাতিলযোগ্য।

দ্বৈত নাগরিকত্ব

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি থাকায় একই ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক। এভাবে একই ব্যক্তি যখন একই সাথে দুই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব উপভোগ করে তখন তাকে দ্বৈত নাগরিকত্ব বলে। অনেক রাষ্ট্র দ্বৈত নাগরিকত্ব সমর্থন করে না। কিন্তু বাংলাদেশ করে। যেমন একজন বাংলাদেশী নাগরিক যদি ব্রিটেনের নাগরিকত্ব লাভ করে তবু তিনি নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশ থেকে তার প্রাপ্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। মূলত জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতির জন্যই দ্বৈত

নাগরিকত্ব দেখা যায়। কেননা একই নাগরিক এক রাষ্ট্রে জন্মস্থান নীতিতে নাগরিক হয়ে আবার জন্মনীতিতে অন্যকোন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে।

বাংলাদেশের নাগরিকতা: অর্জন ও বিলোপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকত্ব আইনের ৬নং ধারা, ১৯৫১ সালে আইন এবং ১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ নির্ধারিত হয়। নাগরিকতা অর্জন সম্পর্কিত কয়েকটি ধারা নিম্নরূপঃ

ক. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পাক হানাদার বাহিনীর ভয়ে অথবা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য যারা দেশত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিল তারা যদি স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরে আসে তবে তারা বাংলাদেশের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে।

খ. যদি কোন ব্যক্তি বা তার মাতাপিতা বা পিতামহ এমন কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যে স্থান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল বা আছে এবং তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন; তাহলে উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবেন।

গ. বাংলাদেশী দম্পত্তির কোন সন্তান বাংলাদেশে অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে জন্মনীতি অনুযায়ী সে সন্তান বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভ করবে।

১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশ এর একটি ধারা

বাংলাদেশী নাগরিক কোন বিদেশী মহিলাকে বিবাহ করলে এবং বাংলাদেশে ২ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সে মহিলা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করতে পারে। রাষ্ট্র তার আবেদন মঞ্জুর করলে সে মহিলা বাংলাদেশী নাগরিক বলে বিবেচিত হবে।

অন্যদিকে, বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশী কোন নাগরিকের নাগরিকত্ব বিলোপও হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী "বাংলাদেশের কোন নাগরিক যদি স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব ত্যাগ করে কিংবা অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে কিংবা দীর্ঘদিন রাষ্ট্রের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হবে"। তাছাড়া রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অপরাধ করলেও নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দ্বৈত নাগরিক এর অসুবিধাগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই নাগরিকতা অর্জন অপরিহার্য। বিভিন্নভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায়, তবে সর্বজন স্বীকৃত দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা: জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এই দুটি পদ্ধতিতেই নাগরিক হবার সুযোগ রয়েছে। ফলে দ্বৈত নাগরিক হয়ে যাবার মতো বিষয়টিও রয়েছে, অর্থাৎ একই ব্যক্তি একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিকতা অর্জন রাষ্ট্রের নিজ নিজ আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফলে উক্ত আইনের ব্যতয় ঘটলে কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব বিলোপও হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

বহুনির্বাচনী অভিক্ষা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন

জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক বেলাল হোসেন ডিভি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকা গিয়ে সেখানে বসবাস করেন। তিনি সেখানে বিয়ে করেন এবং নাগরিকত্বও লাভ করেন।

১। বেলাল হোসেন বর্তমানে- i. বাংলাদেশের নাগরিক ii. বাংলাদেশের নাগরিক আর নেই iii. আমেরিকার নাগরিক
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

পাঠ-২.৩ সুনাগরিক (Ideal Citizen)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুনাগরিক কারা জানতে পারবেন।
- সুনাগরিকের গুনাবলিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	সুনাগরিক, বুদ্ধি, বিবেক, আত্নসংযম, গুনাবলি

সু শব্দের অর্থ হল ভালো বা আদর্শ। তাহলে সুনাগরিক মানে হল আদর্শ নাগরিক। যেকোন রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সুনাগরিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আবার এই সুনাগরিক গড়ে তোলাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেউ একজন খুব সহজে একটা রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও কেবল সুনাগরিকই রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। তাহলে প্রশ্ন হল সুনাগরিক কে বা কারা? এ বিষয়েও বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত দিয়েছেন। অধ্যাপক ই, এম, হোয়াইট এর মতে 'সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা এ তিনটি গুন যদি কোন নাগরিকের থাকে তাহলে সে-ই সুনাগরিক।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তব্যে নাগরিকের অনেকগুলো গুণের উল্লেখ রয়েছে, তবে লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত উপাদানগুলোই এ পর্যন্ত সবেচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তিনি মনে করেন কোন নাগরিক সুনাগরিক হিসেবে পরিগণিত হবে যদি তিনটি গুণ যথা- (১) বুদ্ধি (২) আত্নসংযম (৩) বিবেক থাকে।

এখন তিনটি গুণ সম্পর্কে সংক্ষেপে জানা যাক-

১. বুদ্ধি (Intelligence) : বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। এটি সুনাগরিকের প্রথম ও প্রধান গুন। নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। একজন সচেতন ও বুদ্ধিমান নাগরিক এইসব সেবাগুলো কি, কোথা থেকে পাওয়া যায় ও কিভাবে পাওয়া যায় তা ভালোভাবে জানে। তাছাড়া রাষ্ট্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান রাখে যা তাকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত করতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা প্রত্যেক নাগরিকের অপরিহার্য কর্তব্য। তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালনের জন্যও একজন নাগরিককে প্রথমত বুদ্ধিমান হওয়া প্রয়োজন।

২. আত্নসংযম (Self-control) : ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করা ও অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতাই হলো আত্নসংযম। আত্নসংযম ছাড়া কেউ সুনাগরিক হতে পারে না। এটি নাগরিককে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল করে। অনেক ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আত্নসংযম অপরিহার্য। অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ ঘটে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সচল রাখতে হলে বিরোধী দল, সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিত সকল গোষ্ঠীর মতামত এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহমর্মি হতে হয়। আত্নসংযমের অভাবে জাতীয় নির্বাচনে সহিংসতা ঘটতে দেখা যায়। অর্থাৎ নাগরিকের আত্নসংযমের অভাবে একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জানমালের অনেক ক্ষতি হয়। তাই আত্নসংযমী হয়ে কোন নাগরিক জীবনে সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও সুনাম বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি জাতির জীবনে আসে সফলতা। তাই সুনাগরিক হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই আত্নসংযমী হতে হবে।

৩. বিবেক (Conscience): বিবেক আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তবে সকল মানুষের বিবেক এক রকমভাবে কাজ করে না। এটি স্বকীয় ও মৌলিক একটি সত্তা। এই বিবেকই মানুষকে ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে শেখায়। অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন মানুষ সাধারণত অন্যের ক্ষতি না করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে কাজ করে। অন্যদিকে বিবেকহীন মানুষ অপরের ভালমন্দ চিন্তা না কওে নিজ স্বার্থে লিপ্ত থাকে। সুনাগরিক সবসময় নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে তার

দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। বিবেক পথ প্রদর্শকের ন্যায় ব্যক্তির জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। চলার পথে সব সময় হয়তো অগ্রজদের নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব হয় না, সেসব ক্ষেত্রে নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত তিনটি গুণাবলি সুনাগরিকের জন্য অবশ্যম্ভাবী। এছাড়াও আরও কিছু গুনাবলি থাকা উচিত। যেমন-বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা, কাউকে ঘৃনা না করা, হিংসা না করা, অপরের ক্ষতি চিন্তা না করা, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হওয়া, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেতন থাকা, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি অনুরাগী হওয়া, সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া। নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকাও সুনাগরিকের গুণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুনাগরিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য কেন?

সারসংক্ষেপ

নাগরিক মাত্রই রাষ্ট্র প্রদত্ত কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনটি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে। রাষ্ট্রের উন্নতি ও মর্যাদা একজন নাগরিকের পালিত কর্তব্যের উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে। ফলে সুনাগরিক প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কাম্য। তবে প্রশ্ন হলো সুনাগরিক কারা? বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন গুনাবলির কথা বললেও লর্ড ব্রাইস কর্তৃক চিহ্নিত তিনটি গুনাবলিকে অনেকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই তিনটি গুনাবলি হল-বুদ্ধি. আত্নসংযম ও বিবেক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। সুনাগরিকের কমপক্ষে কয়টি গুণ থাকা বাঞ্চনীয়?
ক. ২টি খ. ৩ টি গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

২। সুনাগরিকতা বিষয়ে তিনটি গুণের কথা বলেছেন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী?
ক. এরিস্টটল খ. লাস্কি গ. লর্ড ব্রাইস ঘ. লর্ড একটন

৩। সুনাগরিক নিচের যে সকল কাজ করতে পারে-
i. প্রতিবেশির বিপদে এগিয়ে আসবে
ii. রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করবে
iii. কর ফাঁকি দিবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ. i ii গ. ii iii ঘ. i iii

পাঠ-২.৪ নাগরিক অধিকার ও অধিকারের শ্রেণিবিভাগ
(Citizen Rights and Classification of Rights)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিক অধিকার কি তা বুঝতে পারবেন।
- নাগরিক অধিকার কোনগুলো তা বলতে পারবেন।
- নাগরিক অধিকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, মানবিক বিকাশ, স্বীকৃত, আইনগত ভিত্তি

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব হিসেবে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের কিছু সুযোগ-সুবিধা আবশ্যক। নাগরিকদের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এ রকম সুযোগ-সুবিধাই হল অধিকার। এ বিষয়ে টি, এইচ, গ্রীন বলেন "অধিকার হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে।"

অধিকার ছাড়া মানুষ তার বক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। রাষ্ট্রের ধরণ প্রদত্ত অধিকার দ্বারা প্রকাশ পায়।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

অধিকার প্রধানত দুই প্রকার- যথা (১) নৈতিক অধিকার ও (২) আইনগত অধিকার

নৈতিক অধিকার (Moral Rights) : নৈতিক অধিকার নীতি এবং বিবেকদ্বারা জাগ্রত। ন্যায়বোধ থেকে এটি তৈরি হয়। নৈতিক অধিকারের আইনগত ভিত্তি নেই। যেমন-ভিখারীর ভিক্ষা পাবার অধিকার। ভিক্ষারীকে ভিক্ষা না দিলেও সে কারও বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তবে নৈতিক অধিকার সমাজ স্বীকৃত। নৈতিক অধিকার সমাজের সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে নাগরিকের সুকুমার মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটে। এই নৈতিক অধিকার সমাজ ও সময়ভেদে পরিবর্তন হতে পারে।

আইনগত অধিকার (Legal Rights) : আইনগত অধিকার নাগরিকের জীবনধারণ ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এ অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত। এটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ অধিকার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। ফলে এরূপ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র শাস্তি বিধান করে। যেমন জীবনধারণের অধিকার, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার ইত্যাদি। সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে এ অধিকারের তারতম্য ঘটে না। অর্থাৎ এটি সার্বজনীন আইনগত অধিকারকে নিম্নরূপভাবে ভাগ করা যায়-

ক. সামাজিক অধিকার : যে সকল অধিকার সভ্য সমাজে বাস করার জন্য প্রয়োজন তাকে সামাজিক অধিকার বলে। যেমন-জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি। এ অধিকার ছাড়া নাগরিকের সমাজ জীবন চিন্তা করা যায় না।

খ. অর্থনৈতিক অধিকার : অর্থনৈতিক অধিকার বলতে সেই সকল সুযোগ-সুবিধা বোঝায় যা নাগরিকের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে জীবন ধারণের নিশ্চয়তা দেয়। অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া নাগরিক জীবন চিন্তা করা যায় না। যেমন-কর্মের অধিকার, ন্যায্য মুজুরি পাবার অধিকার, পেশা পছন্দের অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার অন্যান্য অধিকারের পূর্বশর্ত।

গ. রাজনৈতিক অধিকার : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার কে রাজনৈতিক অধিকার বলে। রাজনৈতিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। তাছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করা যায়। যেমন-ভোটাধিকার প্রয়োগ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকগণই এসব অধিকার ভোগ করতে পারে। রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করলে নাগরিকদের মাঝে সচেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

ঘ. ধর্মীয় অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকের তার নিজ ধর্ম পালন, চর্চা, আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হল ধর্মীয় অধিকার। যেমন একজন মুসলিম নাগরিকের অধিকার আছে নামায পড়ার। ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করে, কেননা ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।

ঙ. সাংস্কৃতিক অধিকার : প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ থাকে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সংস্কৃতিকে ধারণ, বাহন ও বিকাশ ঘটানোর অধিকার হল সাংস্কৃতিক অধিকার। সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র পরিচিত হয়ে উঠে।

চ. ব্যক্তিগত অধিকার : ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিববার নিয়ে সমাজ আর সমাজের সমষ্টি হল রাষ্ট্র। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য তার কিছু সুযোগ-সুবিধা দরকার। এটা তার জন্মগত অধিকার। যেমন জীবন-ধারণের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার। এ অধিকার ছাড়া কোন ব্যক্তি সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	অধিকার নাগরিকের জন্য প্রয়োজন কেন?

সারসংক্ষেপ

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার এবং সুকুমার মনোবৃত্তির বিকাশের জন্য সুযোগ-সুবিধা অপরিহার্য। একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হবার ফলে নাগরিকগণ অনেকগুলো মৌলিক ও মানবাধিকার ভোগ করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকার। এই অধিকারগুলো রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত, ফলে একজন অধিকার বঞ্চিত হলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। অধিকার প্রধানত কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

২। ভিক্ষা পাবার অধিকার কি ধরনের অধিকার?

ক. সামাজিক অধিকার খ. নৈতিক অধিকার গ. আইনগত অধিকার ঘ. অর্থনৈতিক অধিকার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ও প্রশ্নের উত্তর দিন-

ঢাকার একটি গলিতে সাইনবোর্ডে লিখা রয়েছে 'এই গলিতে ফেরি করে জিনিস বিক্রি করা নিষেধ'। গলির একজন অধিবাসী বলল ফেরিওয়ালার চিৎকারে বাসিন্দারা অতিষ্ঠ।

৩। আলোচ্য উদ্দীপকে ফেরিওয়ালা ও বাসিন্দাদের কি ধরনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে-

i. অর্থনৈতিক অধিকার
ii. রাজনৈতিক অধিকার
iii. সামাজিক অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ.i ii ও iii

পাঠ-২.৫ তথ্য অধিকার (Right to Information)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তথ্য অধিকার কি বলতে পারবেন।
- তথ্য কমিশন এর গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ তথ্য কমিশন, তথ্য কর্মকর্তা, গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা

রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবন-যাপন নির্বিঘ্ন ও সুন্দর করার জন্য নানাবিধ অধিকার প্রদান করে থাকে। সাধারণত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করে থাকে। সেবা ভোগ করতে হলে আগে জানতে হবে কে, কোথায়, কখন এই সেবা দিচ্ছে। এ সংক্রান্ত তথ্য জানাও প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। তবে কিছু তথ্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে গোপন রাখতে হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। তথ্য আদান-প্রদানে কোন সমস্যা বা জটিলতার সৃষ্টি হলে তা তদারকির জন্য তথ্য কমিশন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের গঠন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার, তন্মধ্যে একজন নারী সদস্য সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার ছিলেন এম আজিজুর রহমান। তথ্য অধিকার আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রচলিত অন্য কোনো আইনের (ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানবলি এ আইনের বিধানবলি দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানবলি এ আইনের বিধানবলির সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এ আইনের বিধানবলি প্রাধান্য পাবে। ৪র্থ ধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনের বিধানবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

তথ্য কর্মকর্তা

এই আইন জারির ৬০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক সরকারি কার্যালয় একজন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেবে। নতুন সৃষ্ট কার্যালয়ের ক্ষেত্রেও একইরূপ কর্মকর্তা থাকবে।

তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি

রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব খর্ব হয় না এমন বিষয়ে যেকোন নাগরিক সরকার থেকে তথ্য জানতে চাইতে পারে। এজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিযুক্ত তথ্য কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনের ২০-৩০ কার্যদিবসের মধ্যে কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। ক্ষেত্রমতে মৃত্যু বা কারাগারে আটকসংক্রান্ত বিষয় হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে লিখিতভাবে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে বাধ্য না হলে ১০ দিনের মধ্যে তিনি আবেদনকারীকে লিখিতভাবে তা জানাবেন। অহেতুক তথ্য না দিলে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বা দপ্তরের প্রধানের নিকট আপীল করতে পারবে। আপীল কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন, না হয় আপীল খারিজ করে দিবেন।

তথ্য অধিকার আইনের ৮নং ধারায় তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে

১. কোনো ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।

২. উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে:

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি এবং

(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

৩. তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে উপরোল্লিখিত তথ্যাবলি সন্নিবেশ করে সাদা কাগজে বা ক্ষেত্র মতো, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।

৪. তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৫. সরকার তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধক ফিস এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারবে এবং কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে কিংবা যে কোনো শ্রেণির তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

৬. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে বিনামূল্যে যেসব তথ্য সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

তথ্য প্রদান ও প্রাপ্তির সুবিধা

ক. সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়:- সরকার হল জনগণের ব্যবস্থাপক। দেশের অভ্যন্তরীণ ও মানবসম্পদ কাজে লাগিয়ে সরকার জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। জনগণের সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনাই সরকারের মূল কাজ। তাই সরকার জনগণের প্রাপ্য অধিকার, সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে বদ্ধ পরিকর। অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যতয় ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই জনগণ যদি বিভিন্ন দপ্তর থেকে কাঙ্খিত তথ্য পায় তবে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত হয়। একই সাথে জনগণের কল্যাণও হয়।

খ. নাগরিক সন্তুষ্টি: কাঙ্খিত তথ্য প্রাপ্তির মধ্যে সরকারের প্রতি নাগরিকদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। নাগরিকগণ আত্নতৃপ্তি লাভ করে। ফলে নাগরিকদের মাঝে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

গ. টেকসই নীতি প্রণয়নে সহায়ক: সরকারের বা কোন দপ্তরের কর্মকান্ড সম্পর্কে নাগরিকগণ যদি অবগত থাকে তবে সরকারকে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারে। ফলে যেকোন নীতি অধিক টেকসই হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। তাই সরকার তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উন্নত ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারি তথ্য অনেক সহজলভ্য। কিছু অুন্নত দেশে মত প্রকাশের যেমন বাধা থাকে তেমনি তথ্য প্রাপ্তি কঠিন থাকে। তথ্য প্রযুক্তির যুগে সরকারগুলো তথ্য সরবরাহে ক্রমাগত উদার হচ্ছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি কী কখনো তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য দাবি করেছেন? কিভাবে তা করা যায়?

সারসংক্ষেপ

তথ্যই জ্ঞান, তথ্যই শক্তি। তথ্য প্রাপ্তি বর্তমানে নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার প্রণয়ন করেছে। এই আইনের মাধ্যমে তথ্য কমিশন গঠন ও প্রত্যেকটি সরকারি কার্যালয়ে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগদানের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হয়। তথ্য প্রাপ্তি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

বহুনির্বাচনী অভিক্ষা

১। তথ্য অধিকার আইন কত সালে পাশ হয়?
   ক. ২০০৭ খ. ২০০৮ সালে গ. ২০০৯ সালে ঘ. ২০১০ সালে

২। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কি গঠন করা হয়েছে?
   ক. তথ্য অধিদপ্তর খ. তথ্য কমিশন গ. তথ্য পরিদপ্তর ঘ. তথ্য কর্মকর্তা

৩। বাংলাদেশের তথ্য কমিশন-
   i. তিন সদস্য বিশিষ্ট
   ii. তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করবে
   iii. ২০-৩০ কার্যদিবসে তথ্য প্রদান করবে

   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i ii ও iii

পাঠ-২.৬ নাগরিকের কর্তব্য ও কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ
(Citizen's Responsibilities and Their Types)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হবেন।
- নাগরিক কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- নাগরিক কর্তব্য পালন করা উচিত কেন তা অনুধাবন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দায়িত্বোধ, সুনাগরিক, বিবেক-বুদ্ধি, রাষ্ট্রের উন্নয়ন

কর্তব্য হল এক ধরনের দায়িত্ববোধ। রাষ্ট্র নাগরিকদের অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। নাগরিকগণও সেগুলো তার অধিকার হিসেবে ভোগ করে। রাষ্ট্র ও নাগরিক নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ফলে রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের অধিকার দিয়ে থাকে তেমনি নাগরিকদের রাষ্ট্রকে দেয়ার মতো অনেক কিছু থাকে। আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা ও আনুগত্য প্রকাশ করা, নিয়মিত কর প্রদান করা ইত্যাদি। রাষ্ট্রে এ ধরনের দায়িত্ব পালন করাই হল নাগরিকের কর্তব্য। আদর্শ, সুন্দর, সভ্য ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে নাগরিকদের অবশ্যই এসব কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন-নাগরিকগণ যদি নিয়মতি কর পরিশোধ না করে তবে রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবে না, ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এমনি করে অন্যান্য কর্তব্যও যদি নাগরিকগণ পালন না করে তবে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রই বিকল হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের উচিত তার নিজ কর্তব্য পালন করা। তাই হয়তো অধ্যাপক এইচ, জে, লাস্কি বলেন, "আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত"।

নাগরিক কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ

কর্তব্যকে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সামাজিক কর্তব্য (২) রাজনৈতিক কর্তব্য (৩) অর্থনৈতিক কর্তব্য (৪) নৈতিক কর্তব্য (৫) আইনগত কর্তব্য

১) সামাজিক কর্তব্য

মানুষ সমাজে বাস করে। মানুষ সমাজেই জন্ম গ্রহণ করে, সমাজেই লালিত পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। তাই সমাজকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার কর্তব্য মানুষের। সামাজিক সম্প্রীতি, সংঘ গড়ে তোলা, তা পরিচালনা করা, সমাজিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, তাদের মধ্যে আদব-কায়দা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা নাগরিকের সামাজিক কর্তব্য। সামাজিক কর্তব্য হল অন্য সকল কর্তব্যের ভিত্তি। এ কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই তৈরি হয় সুনাগরিক।

২) রাজনৈতিক কর্তব্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল বলেছেন, মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। অর্থাৎ মানুষ যেমন কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে তেমনি তাদের রাজনৈতিক কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। যেমন- রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, আইন মেনে চলা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচনে সহায়তা করা, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সাড়া দেয়া ইত্যাদি।

৩) অর্থনৈতিক কর্তব্য

নাগরিকগণ কিছু অর্থনৈতিক কর্তব্যও পালন করে থাকে। জীবন-জীবিকা ও রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির জন্য এসব কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন-নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান, রাষ্টীয় ও ব্যক্তিগত উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ। ব্যক্তিগত উৎপাদনে কেবল ব্যক্তিই লাভবান হয় না, রাষ্ট্রও অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করে।

৪) নৈতিক কর্তব্য

এ কর্তব্য একান্তই নাগরিকের ব্যক্তিগত ও নৈতিক ব্যাপার। নিজের বিবেক থেকেই সমাজে বাস করতে গিয়ে এসব দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন-দরিদ্রকে সাহায্য করা, অন্ধকে পথ দেখানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করা, অন্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রভৃতি।

৫) আইনগত কর্তব্য

এ কর্তব্য নাগরিকের উপর রাষ্ট্র কর্তৃক আইন দ্বারা আরোপ করা হয়। যেমন-নিয়মিত করা দেয়া, জাতীয় দিবস উদযাপন, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। এ ধরনের কর্তব্য পালন না করলে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক আকার-পরিপূরক। রাষ্ট যেমন নাগরিকদের কিছু সুযোগ সৃষ্টি দিয়ে থাকে তেমনি নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ রয়েছে। একথায় নাগরিকতার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলেই রাষ্ট্রের পক্ষে অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	নাগরিক হিসেবে আপনার সামাজিক কর্তব্যগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

নাগরিকগণ কেবল রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকারই ভোগ করে না, তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যও পালন করে। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে আইনগত কর্তব্য আর কতগুলো হলো নৈতিক কর্তব্য। যেমন নিয়মিত কর প্রদান করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন আইনগত কর্তব্য, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করা নৈতিক কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেকে নাগরিকেরই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নাগরিকগণ নিজের কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করলে-

i. অর্থ সাশ্রয় হয়

ii. সুনাগরিকতার প্রকাশ পায়

iii. দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ও প্রশ্নের উত্তর দিন

জামিল সাহেব প্রতিদিন সকালে হাঁটেন। একদিন সকালে তাঁর উঠতে দেরি হয়। রাস্তায় হাটতে গিয়ে দেখেন রাস্তার সব বাতিগুলো জ্বলছে। তিনি নিকটস্থ সিটি কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে বিষয়টি জানান। কর্তৃপক্ষ তাকে ধন্যবাদ জানায়।

২। জামিল সাহেব এর এই আচরণ থেকে কি প্রকাশ পায়-

ক. আইনের প্রতি শ্রদ্ধা খ. দায়িত্ববোধ গ.কর্তব্যবোধ ঘ. বাহবা পাওয়ার লোভ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। মৃদুল ও জেনিফার ভালো বন্ধু। দুজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক। সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রে অনেকদিন পর দুজনের দেখা। মৃদুল জেনিফারকে দেখে অবাক। মৃদুল বলল জেনিফার তুমি ভোট কেন্দ্রে? ভোট দেবে নাকি? জেনিফার বলল হ্যাঁ মৃদুল আবার অবাক হলো। মৃদুল বলল তোমার জন্ম তো ব্রিটেনে। তুমি তো এদেশের নাগরিক না। জেনিফার বলল আমিও বাংলাদেশের নাগরিক।

ক. নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি?
খ. বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জনের স্বীকৃত পদ্ধতি কয়টি ও কিকি?
গ. আলোচ্য উদ্দীপকে জেনিফার ভোটার হওয়াতে মৃদুল অবাক হল কেন?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জেনিফার কি কারণে বাংলাদেশের নাগরিক ব্যাখ্যা করুন।

২। রতন একজন শিক্ষিত সচেতন নাগরিক। সে চাকুরি সূত্রে শহরে থাকে। সম্প্রতি গ্রামে এসে রাস্তাঘাট দেখে হতাশ হল। রাস্তাগুলো সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে সে উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগে জানতে গেল কোন ইউনিয়নের জন্য কত টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু উপজেলা প্রকৌশলী কিছুতেই তাকে তথ্য দিতে রাজি হল না। পরে যখন প্রকৌশলীকে তথ্য অধিকার আইনের কথা বললেন তখন তিনি তথ্য দিতে রাাজি হলেন। তথ্য পেয়ে দেখলেন যে বেশ কয়েকমাস পূর্বে বরাদ্দ আসলেও তা দিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ না করে বরাদ্দ নেই মর্মে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গরিমশি করছেন। এই প্রেক্ষিতে রতন ইউনিয়নের কয়েক জন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে গেলেন। প্রাপ্ত তথ্য জানিয়ে তারা চেয়ারম্যানকে দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু করতে অনুরোধ করলেন। অবিশ্বাস্যভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই রাস্তার সংস্কার কাজ শুরু হয়ে গেল। ইউনিয়নের অনেকেই রতনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন। রতন বললেন আমি শুধু আমার অধিকার আদায় করতে চেয়েছি, ইচ্ছে করলে যে কোন নাগরিকই তার এই অধিকার ভোগ করতে পারে।

ক. অধিকার কি?
খ. তথ্য অধিকার আইন কত সালে প্রণীত হয়?
গ. আলোচ্য উদ্দীপকে রতন কেন তথ্য জানতে চাইল?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কেন জরুরি তা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১ : ১। খ ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২ : ১। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩ : ১। খ ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪ : ১। ক ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫ : ১। গ ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬ : ১। ঘ ২। গ

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য
(Law, Liberty and Equality)

ইউনিট ৩

স্বাধীনতা ও সাম্য মানুষের চিরন্তন চাওয়া। স্বাধীনতার কোন সীমা নেই, কিন্তু সীমাহীন স্বাধীনতা প্রদান করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানুষের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করে থাকে। যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র তার অস্তিত্বের প্রমাণ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। এসব সুযোগ-সুবিধা সমতার ভিত্তিতে বন্টন হল কিনা তা কেবল আইনের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। ফলে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের মতো বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য ইউনিটটিতে আইন, আইনের প্রকারভেদ, উৎস, আইনের শাসন, স্বাধীনতা, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা, সাম্য, সাম্যের বিভিন্ন রূপ এবং আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-৩.১ আইন (Law)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইনের প্রকারভেদ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মানব কল্যাণ, যুক্তিসিদ্ধ, বাহ্যিক আচরণ, নিয়ম-কানুন, অনুমোদিত, জাতীয়, আন্তর্জাতিক

মানুষ সামাজিক জীব। আইন মানব সমাজের দর্পণস্বরূপ। সমাজে একসাথে বসবাস করার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা অপরিহার্য। মানব কল্যাণের স্বার্থেই নিয়ম-কানুন প্রয়োজন। স্বীকৃত এই নিয়ম-কানুনই হল আইন। আইন হল ফার্সী শব্দ যার অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম। আইন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ “Law”। যার অর্থ ‘স্থির বা অপরিবতর্নীয় এবং সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে আইনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরিস্টটল বলেছেন ” সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন’ (Law is the passionless reason)।
অধ্যাপক হল্যান্ড এর মতে আইন হচ্ছে সেই সাধারণ নিয়ম যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যা প্রয়োগ করেন।”
অর্থাৎ মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে সকল বিধি নিষেধ প্রণয়ন করে সাধারণভাবে সেগুলোকেই আইন বলা হয়।
আইনের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি:
আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের উপর্যুক্ত মতামত থেকে আইনের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-
১. সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক অনুমোদিত ২. সর্বজনীন ৩. বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি ৪. বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক
৫. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক ৬. সুস্পষ্টতা ৭. আইন গতিশীল ৮. দেশকাল ভেদে পরিবর্তনশীল

আইনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন আইনজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করেছেন। আইনের প্রয়োগ ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের উপর ভিত্তি করে আইনকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি আইন (২) বেসরকারি আইন (৩) আন্তর্জাতিক আইন

(১) সরকারি আইন (Public law)

রাষ্ট্র পরিচালনা করতে নানা ধরনের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হয়। এ ধরনের আইনগুলোই সরকারি আইন। সরকারি আইন সাধারনত জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টে প্রণীত হয়ে থাকে। সরকারি আইন আবার কয়েক প্রকার। যেমন-

ফৌজদারি আইন: ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্র মূলত এ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকে। সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি বজায় রাখা, ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং অপরাধীকে দন্ড দেয়ার জন্য ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করা হয়। যেমন- পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত আইন, যৌতুক বিরোধী আইন।

প্রশাসনিক আইন: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনের মানের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত। যেমন- তথ্য অধিকার আইন।

সাংবিধানিক আইন: রাষ্ট্রের ভিত্তি হল সংবিধান। এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। অন্য যেকোন আইন এ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা বাতিল হয়ে যায়। এ আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ, বন্টন ও প্রয়োগকারী নির্ধারণ করা হয়। এটি আবার দুই ধরনের হতে পারে, লিখিত আইন ও অলিখিত আইন। যেমন- বাংলাদেশের সংবিধান।

(২) বেসরকারি আইন (Private law)

এ আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রণীত নয় তবে সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয়। এ আইন দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। যেমন-কোন সংঘের আইন, চুক্তি ও দলিল সংক্রান্ত আইন।

(৩) আন্তর্জাতিক আইন (International law)

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ ও বজায় রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। আন্তর্জাতিক আইনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- শান্তিকালীন আইন, যুদ্ধসংক্রান্ত আইন এবং নিরপেক্ষতার আইন। এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে, বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান, আন্তর্জাতিকভাবে যুদ্ধাপরাধের বিচার ইত্যাদি। যেমন- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন অর্জন ইত্যাদি।

সংকীর্ণ অর্থে বললে আইনের আরও প্রকার রয়েছে। পারিবারিক আইন, ধর্মীয় আইন, দেওয়ানি আইন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রক। এটি মূলত যুক্তিসিদ্ধ বিধি-বিধান। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হয় এবং রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয়। আইনের শাসনের উপরই একটি রাষ্ট্রের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়। তবে কিছু কিছু আইন রাষ্ট্রকেও নিয়ন্ত্রণ করে। সেগুলো আন্তর্জাতিক আইন। বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা বিশেষ করে যুদ্ধ এড়িয়ে চলার জন্য আন্তর্জাতিক আইন খুব কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ‘সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন।’-উক্তিটি কার?

ক) অধ্যাপক হল্যান্ড খ) লর্ড অ্যাকটন গ) অধ্যাপক লাস্কি ঘ) লিংকন

পাঠ-৩.২ আইনের উৎস (Sources of Law)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইনের উৎস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আইন সৃষ্টির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	রীতি-নীতি, অনুশাসন, আইনবিদ, বিল, রায়, অভ্যাস, আদালত

আইন হল রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। আদর্শ রাষ্ট্র সর্বদা আইনের শাসন নিশ্চিত করে। অর্থাৎ আইন অপরিহার্য। এই আইন একদিনে বা একটি উৎস থেকে সৃষ্টি হয় নি। মানব সভ্যতার আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নানা সূত্র থেকে আইনের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আইনের সৃষ্টির বিভিন্ন উৎস রয়েছে। আইনের স্বীকৃত উৎসগুলো নিম্নরূপ-

প্রথা

আইনের অন্যতম উৎস হল প্রথা। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার ব্যবহার রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত, সমর্থিত ও পালিত হচ্ছে তাই প্রথা। সমাজে অনেক ধরনের প্রথাই প্রচলিত থাকে। তার মধ্যে যেসব প্রথা যুক্তিসিদ্ধ ও জনহিতকর তা আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার যেসব প্রথা সমাজ ও জনগণের জন্য অকল্যাণকর তা আইন করে বন্ধ করা হয়। গ্রেট ব্রিটেনে অনেক প্রথা সাংবিধানিক আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে যৌতুক প্রথা সমাজের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় তা আইন করে বন্ধ করা হয়েছে।

ধর্ম

সব ধর্মই মানুষের মঙ্গলের কথা বলে। ফলে ধর্মের বাণীকে সকলেই মেনে চলার চেষ্টা করে। সকল ধর্মের কিছু অনুশাসন রয়েছে, যা ঐ ধর্মের অনুসারীরা মেনে চলে। এসব অনুশাসন সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। এ রকম অনেক অনুশাসন পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে এবং আইনে পরিণত হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অনেক আইনই ধর্মভিত্তিক। যেমন বিভিন্ন মুসলিম আইনের উৎস কোরআন।

আইন সভা

আইন সভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা। আধুনিক রাষ্ট্র সাধারণত জন কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। ফলে সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষের নানাবিধ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্ব। তাই আইন সভার সদস্যগণ জন কল্যাণে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার্থে নতুন নতুন অনেক বিষয়কে আইনে রুপান্তর করার জন্য তা বিল (আইনের খসড়া) আকারে আইনসভায় উত্থাপন করে থাকে। বিষয়টি যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামত প্রাপ্ত হয় তবে তা আইনে পরিণত হয়।

সংবিধান

এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সাধারণত নির্বাচিত প্রতিনিধিগন সংসদে সংবিধান অনুমোদন করেন। সংবিধান রাষ্ট্রের মূল দলিল। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত নানা বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে। এ নির্দেশনা প্রয়োগের সুবিধার্থে সংসদ সদস্যগণ- অন্যান্য আইন প্রণয়ন করে। অর্থাৎ সংবিধান আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

বিখ্যাত গ্রন্থ

রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে লিখিত বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থও আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনবিদদের দ্বারা লিখিত বই বেশি প্রাধান্য পায়। যেমন, এইচ, জে, লাস্কি "A Grammar of Politics" এবং অধ্যাপক ডাইসির "Law of the Constitution" এর উল্লেখ করা যায়।

বিচারকের রায়

আইন তৈরি করা নেই, মানব জীবনের এমন কোন ঘটনা নিয়ে কোন নাগরিক যদি আদালতের দারস্থ হয় তবে বিচারক তার নিজস্ব প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়ে রায় দিয়ে থাকে। এই রায়টি জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলে, রাষ্ট্র সেই রায়কে আইনে পরিণত করে। অর্থাৎ বিচারকের রায়ও আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ন্যায় বিচার

বিচারকগণ সাধারণত দেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু কিছু অবশ্যম্ভাবী সীমাবদ্ধতার কারণে এই আইন সব সময় ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বিচারকগণ তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ন্যায় বিচার করে থাকেন। তাদের এই ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত পরবর্তীতে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

উপর্যুক্ত উৎস ছাড়াও আইনের আরো কয়েকটি উৎস রয়েছে। যেমন- বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, প্রশাসনিক ঘোষণা, সংবিধান, ন্যায়বোধ, জনমত ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনের কয়েকটি উৎস উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র ও মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ ঘটে। এর প্রয়োগ ক্ষেত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি আইনের সৃষ্টিও বিভিন্ন উৎস থেকে। প্রথা, ধর্ম, সংবিধান, আইনসভা, বিখ্যাত গ্রন্থ ইত্যাদি আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। উৎস যাই হোক না কেন আইনের স্বীকৃতি লাভের পর তা স্থান-কাল পাত্র নির্বিশেষে তা সকলের উপর সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ক্লাস শেষে মানবিক বিভাগের দুই শিক্ষার্থী আলোচনা করছে। আলোচনায় আইনের উৎসের কতকগুলো নাম বলল, যেমন-

i. প্রথা, ধর্ম
ii. অধিকার, কর্তব্য
iii. আইনসভা, বিচারকের রায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। "Law of the Constitution" বইটি কার লিখা?

ক) অধ্যাপক ডাইসি খ) লর্ড অ্যাকটন গ. অধ্যাপক লাস্কি ঘ. লিংকন

৩। আধুনিক রাষ্ট্রে কারা আইন প্রণয়ন করেন?

ক) বিচারপতিগণ খ) মন্ত্রীবর্গ গ) উকিলবর্গ ঘ) সংসদ সদস্যগণ

পাঠ-৩.৩ নাগরিক জীবনে আইনের শাসন (Rule of Law in Citizen's Life)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইনের শাসন কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আইনের শাসন নিশ্চিত করার উপায় বলতে পারবেন।
- আইন মান্য করার কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ন্যায় বিচার, নীতি-আর্দশ, যুগোপযোগী, নাগরিক অধিকার, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, স্থিতিশীলতা

রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা অর্থাৎ আইন সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হবে। নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ থেকে অন্যায়, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য দূর হয়। ফলে সমাজে স্থিলিশীলতা আসে এবং শান্তির বিরাজ করে। নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য অধিকার কেবল আইনের শাসনের মাধ্যমে বলবৎ করা যায়। আইনের শাসন না থাকলে সবল-দুর্বল, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান প্রকট হতে থাকে। সমাজ থেকে মায়া, মমতা, সহমর্মিতা, ন্যায়-বিচার, নীতি-আদর্শ হ্রাস পায়। অতএব আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আইনের শাসন নিশ্চিত করার উপায়

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। অন্যদিকে আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য শাসক ও শাসিতের উভয়েরই সমান ভূমিকা রয়েছে। যেমন- রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শাসক নিম্নরূপ ভূমিকা রাখতে পারে-

- যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ
- যুক্তিসংগত ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন
- বিদ্যমান আইন সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করা
- যথাসময়ে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা

আইনের শাসন নিশ্চিত করণে নাগরিক কর্তব্য

আইন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হলেও নাগরিকদেরও কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের বিবেক আইনের মতো কাজ করে। তাই নাগরিকগণ যদি বিদ্যমান আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে তবেই কেবল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন রাস্তায় কোন চুরি ছিনতাই হতে দেখলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যদি তার কাছে কোন তথ্য জানতে চায় তবে তা জানিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাও নাগরিক কর্তব্য। সাক্ষী না দিয়ে যদি কেউ এড়িয়ে চলে তাহলে আইনের এতো বেশি অবমাননা হবে যে কোন আইনেই নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাই যার যার অবস্থান থেকে আইন মান্য করে চললে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আইন মান্য করার কারণ

আইনের শাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হল আইন মান্য করা। আইনের যথাযথ প্রয়োগ যেমন জরুরি তেমনি আইন মান্য করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক আইনেই কিছু নির্দেশনা এবং তা অমান্য বা ভঙ্গ করলে শাস্তির ব্যবস্থা

থাকে। তারপরও দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গ হয়। তবে অধিকাংশ জনগণই আইন মেনে চলে এবং আইনকে শ্রদ্ধা করে। আইন মান্য করার অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটি হলো আইনের উপযোগিতা। জনগণ এটি বুঝতে পারে যে, আইন অধিকার রক্ষা করে, দুর্বলকে সবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে, সমাজে শৃঙ্খলা রাখতে অপরিহার্য তখন তারা সহজেই আইন মেনে নেয়। এছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে যার কারণে জনগণ আইন মেনে চলে। লর্ড ব্রাইস আইন মান্য করার কারণগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন- যথা (ক) যৌক্তিকতার উপলব্ধি (খ) অপরের প্রতি শ্রদ্ধা (গ) নির্লিপ্ততা (ঘ) সহানুভূতি (ঙ) শাস্তির ভয়।

পরিশেষে বলা যায়, আইন ছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজ অচল। যৌক্তিক যুগোপযোগী আইন সকলের উপর প্রয়োগ করা সহজ। আইনের সমপ্রয়োগের উপর রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্ভর করে। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে মৌলিক ও মানবাধিকার নিশ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইন মান্য করার কারণগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

আইন সর্বজনীন। জাতি-ধর্ম, স্থান-কাল নির্বিশেষে এটি সকলের উপর সমানভাবে কার্যকরযোগ্য। সকলের উপর সমভাবে আইনের প্রয়োগই আইনের শাসন। সুশাসন নিশ্চিত করার এটি অপরিহার্য। তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। এর জন্য আইন মান্য জরুরি। আইন যৌক্তিক ও পক্ষপাতহীনভাবে প্রয়োগ হলে সকল নাগরিক আইন মেনে চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। জনগুরুত্বপূর্ণ একটি দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিও একটি মামলায় অভিযুক্ত হন। এক্ষেত্রে উভয়ের প্রতি আদালতের দৃষ্টি কেমন হওয়া উচিত?

i. জনপ্রতিনিধিকে সমীহ করা

ii. সকল দোষ সাধারণ ব্যক্তিকে দেয়া

iii. জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ ব্যক্তির একইভাবে আইন প্রয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) iii

২। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা বেশি

i. নাগরিকের

ii. ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের

iii. সরকারের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-৩.৪ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Liberty and Types of liberty)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্বাধীনতার বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইনসিদ্ধ, জাতীয় স্বাধীনতা, আত্মপরিচয়, স্বাধীনতাহীনতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক অধিকার

‘স্বাধীনতা’ নামক প্রত্যয়টি পৌরনীতি ও নাগরিকতার আলোচনায় খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের অস্তিত্ব বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা থেকেই প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ‘Liberty’ স্বাধীনতাকে শাব্দিক অর্থে বলা যায় নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করা। কিন্তু একজনের স্বাধীনতার সাথে অন্যের স্বাধীনতা ভোগের বিষয় যেহেতু জড়িত তাই পৌরনীতিতে স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা নয়। স্বাধীনতা মানে যৌক্তিক ও আইনসিদ্ধভাবে কোন কিছু করাকেই বুঝায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নানা ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। যেমন-চলাফেরার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। জাতীয় স্বাধীনতা আবার একটু ভিন্ন। এটি অর্জন করা আরও কঠিন। সাধারণত গণভোট বা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে একটি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। নাগরিক বা জাতি সে যা-ই হোক না কেন তাঁর স্বাভাবিক অস্তিত্বের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাই দেখা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংবিধানেই নাগরিকদের স্বাধীনতা ভোগের বিষয়ে নানান ধরনের ধারা সংযুক্ত থাকে।

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টি, এইচ, গ্রিন বলেন, “যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে”।

প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়। স্বাধীনতা এক ধরনের নাগরিক অধিকার। জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের জন্য এটি অপরিহার্য। আর্দশ নাগরিক সৃষ্টিতে স্বাধীনতা ভোগের বিকল্প নেই। স্বাধীনতার বিপরীত হল পরাধীনতা বা স্বাধীনতা হীনতা। স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বাচতে চায় না। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য অনেক জাতি যুগের পর যুগ সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আত্মপরিচয়ের এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বাধীনতা প্রদান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতা হীনতায় মানুষ দাসে পরিণত হয়। সকল মৌলিক অধিকার যেমন প্রয়োজন স্বাধীনতাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারলে রাষ্ট্রের মর্যাদারও সমৃদ্ধি ঘটে। ব্যক্তি জীবনে বিরাজ করে প্রশান্তি। পরাধীনতায় ব্যক্তি নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পায় না, ফলে তার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বিঘ্নিত হয়। স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে ব্যক্তি কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এর ফলে সভ্য জীবন-যাপন সহজ হয়।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ

একটি রাষ্ট্রে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এটি আবার ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- (১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (২) সামাজিক স্বাধীনতা (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (৪) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও (৫) জাতীয় স্বাধীনতা

১. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

এই স্বাধীনতা একান্তই ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগে অন্যের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। যেমন- ধর্ম-পালন করা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

২. সামাজিক স্বাধীনতা-

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। যেমন জীবন ধারণের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ করা, সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা ইত্যাদি। সামাজিক স্বাধীনতা মানুষকে সুন্দর জীবনের পথ দেখায়। তার মনের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটায়। সামাজিক স্বাধীনতা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

৩. রাজনৈতিক স্বাধীনতা-

ভোটার হবার স্বাধীনতা, ভোটদানের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ন্যায় সঙ্গতভাবে একজন নাগরিক সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগের অধিকার রাখে। নেতৃত্বের বিকাশের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা উচিত। একনায়কতান্ত্রিক, সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণ এ ধরনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

এ ধরনের স্বাধীনতার মধ্যে পেশা ও জীবিকার স্বাধীনতা অন্যতম। মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিকল্প নেই। তাছাড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে শ্রেণি-বৈষম্য বেড়ে গিয়ে যেকোন শ্রেণি শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে পারে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আইনগত ভিত্তি রয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতাও খর্ব হয়।

৫. জাতীয় স্বাধীনতা

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র। অর্থাৎ তারা স্বাধীন জাতি হিসেবে রাষ্ট্র গঠন করেছে। একটি জাতির নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠার সক্ষমতাই হল জাতীয় স্বাধীনতা। জাতি হিসেবে স্বাধীন থাকা যেমন গর্বের তেমনি তা অর্জন করাও কষ্টসাধ্য। অনেক ক্ষেত্রে তা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়। যেমন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ | মানবজীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা মানব জীবনের চিরক্ষণ প্রত্যাশা। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে স্বাধীনতার সাথে যৌক্তিকতার বিষয়টি জড়িত। নাগরিকগণ ইচ্ছে করলেই যা খুশি তা করতে পারবে না। এক্ষেত্রে অন্যের স্বাধীনতা, অধিকার খর্ব হল কিনা সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। এভাবে একজন নাগরিক ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে। মানব চিত্তের বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। স্বাধীনতার সাধারণত কয়টি রূপ দেখা যায়?
ক) ২ টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২। স্বাধীনতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো-
ক) Liberty খ) Liberal গ) Living ঘ) Liability

৩। বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে অর্জিত হয়েছে?
ক) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খ) জাতীয় স্বাধীনতা গ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঘ) সামাজিক স্বাধীনতা

পাঠ-৩.৫ আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইন ও স্বাধীনতার সাদৃশ্য চিহ্নি করতে পারবেন।
- আইন ও স্বাধীনতার বৈসাদৃশ্য চিহ্নি করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বাধীনতার পরিমাপ, পরিপন্থী, যৌক্তিকতা, সংবিধান, স্বাধীনতার সম্প্রসারণ

নাগরিক জীবনে আইন ও স্বাধীনতার অনেক প্রভাব রয়েছে। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং পরস্পর নির্ভরশীল। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থীও মনে হয়। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক সংক্রান্ত দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রথম দলটি মনে করেন, আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এরিস্টটল, মন্টেস্কু, রিচি, উইলোবি, আর্নেস্ট বার্কার, জন লক প্রমুখ মনীষী এই মতের সমর্থক। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। হার্বার্ট, এ ভি ডাইসি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই দলের অন্তর্গত। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হল-

আইন স্বাধীনতার ভিত্তি

স্বাধীনতার কোন পরিমাপ নেই। আবার অবাধ স্বাধীনতা নাগরিকের কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির কারণই হয়ে থাকে। তাই কোন কোন স্বাধীনতা কতটুকু উপভোগ করা যাবে তা আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আইন ব্যতীত স্বাধীনতা স্বেচ্ছারিতায় পরিনত হয়।

আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

একজনের স্বাধীনতা যেন অন্যের অধিকার খর্ব না করে বা তার নিকট অত্যাচার মনে না হয় সে জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে। স্বাধীনতা বঞ্চিতরা আইনের আশ্রয় নিতে পারে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে (constitution) নাগরিকদের জন্য অনেক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। জন লকের মতে, যেখানে আইন থাকে না, সেখানে কোন স্বাধীনতাও থাকে না।

আইন স্বাধীনতার পরিপূরক

আইন যেমন কেবল নিয়ন্ত্রণ নয় তেমনি স্বাধীনতা মানে যা ইচ্ছে তা করা নয়। উভয়টির সাথেই যৌক্তিকতা বিষয়টি রয়েছে। আইন স্বাধীনতাকে পূর্ণ করে। স্বাধীনতা কোনভাবে বাধাগ্রস্থ হলে আইনের মাধ্যমে তা বলবৎ করা হয়। অর্থাৎ আইন ছাড়া স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় না।

আইন স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটায়

সমাজে আইনের অভাবে অনেক সময় মৌলিক স্বাধীনতাও খর্ব হয়। সেসব ক্ষেত্রে আইনের শাসন নিশ্চিত হলে নাগরিকগণ প্রাপ্য স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আইন না থাকলে এক জনের দ্বারা অন্যের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হলে স্বাধীনতার সম্প্রসাবণ ঘটে।

আইন স্বাধীনতার বিরোধী

অর্থাৎ আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। তবে আইন সবসময় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে না। কেবল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা প্রণীত আইনই স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। স্বেচ্ছাচারী ও

স্বৈরাচার কর্তৃক প্রণীত আইন সব সময়ই স্বাধীনতা বিরোধী। যেমন- সামরিক আইন, স্বৈরাচার প্রণীত আইন স্বাধীনতা খর্ব করে।

তাই আর্নেস্ট বার্কারের ভাষায় বলা যায় "স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই" (Liberty and law do not quarrel).

শিক্ষার্থীর কাজ	আইন ও স্বাধীনতা বিভিন্নমুখী সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন

সারসংক্ষেপ

আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক। যেখানে আইন অনুপস্থিত সেখানে স্বাধীনতা অবান্তর। আইন ছাড়া মানবাধিকার ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না অর্থাৎ আইন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। আবার স্বাধীনতা যেন অসীম না হয় সেজন্য আইন প্রণীত হয়। সে জন্য আইনকে অনেক সময় স্বাধীনতা বিরোধীও বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। আইন ও স্বাধীনতা হল-

i. পরস্পর বিরোধী
ii. এক ও অভিন্ন
iii. পরস্পরের পরিপূরক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii, iii খ) i, ii গ) i, iii ঘ) ii, iii

২। "স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই"- উক্তিটি কার?

ক) লর্ড অ্যাকটন খ) এরিস্টটল গ) উইড্রো উইলসন ঘ) আর্নেস্ট বার্কার

পাঠ-৩.৬ সাম্য ও সাম্যের বিভিন্ন রূপ (Equality and Types of Equality)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাম্য কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাম্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমান, সুকুমার বৃত্তির বিকাশ, সুযোগ-সুবিধা, প্রাপ্ত বয়স্ক,

সাম্য এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty. এর অর্থ সমান। সমান বলতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করাকে বুঝায়। কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীকে পৃথকভাবে সুযোগ-সুবিধা না দেয়া। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, সকলের সম্মুখে যথার্থ সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রাখার অর্থ হল সাম্য। অর্থাৎ সাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বা পরিবেশ বুঝায় যেন সকল নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে যথার্থভাবে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

সাম্যের প্রকারভেদ

রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এগুলোকে বিভিন্ন সাম্যে বিভক্ত করা যায়-

(ক) সামাজিক সাম্য (খ) রাজনৈতিক সাম্য (গ) অর্থনৈতিক সাম্য (ঘ) আইনগত সাম্য (ঙ) ব্যক্তিগত সাম্য

ক. সামাজিক সাম্য

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার সবার রয়েছে। যেমন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এ রীতি অনুযায়ী অংশগ্রহণের সুযোগ, গ্রাম্য সালিসে ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ ইত্যাদি।

খ. রাজনৈতিক সাম্য

প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই সব সুযোগ-সুবিধা লাভ করাই রাজনৈতিক সাম্য। সংগঠন করার স্বাধীনতা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এর সুবিধা ইত্যাদি রাজনৈতিক সাম্যের পর্যায়ে পড়ে। রাজনৈতিক সাম্য না থাকলে রাষ্ট্রে নেতৃত্বের সংকট তৈরি হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

গ. অর্থনৈতিক সাম্য

নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থাকা, পেশা পরিবর্তনের সুযোগ, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি লাভের সমতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক সাম্য। সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য অত্যন্ত জরুরি। অর্থনৈতিক সাম্য না থাকলে মানুষ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে মনের সুকুমার বৃত্তির বিকাশও বাধাগ্রস্থ হয়। অর্থনৈতিক সাম্য থাকলে রাষ্ট্র ও দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

ঘ. আইনগত সাম্য

ইতোপূর্বে আলোচিত সাম্যের কিছু কিছু আবার আইনের দ্বারা স্বীকৃত। যেমন- চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার, সংগঠন ও সমাবেশ করার অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাম্যের বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার। তাই এই সাম্য আবার আইনগত সাম্যের অন্তর্ভূক্ত। সংবিধান ছাড়াও দেশের বিদ্যমান অন্যান্য আইন দ্বারাও সাম্য স্বীকৃত হতে পারে। আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য আইনের সাম্য থাকা উচিত।

ঙ. ব্যক্তিগত সাম্য

মত প্রকাশের সাম্য, গোপনীয়তা রক্ষার সাম্য, বন্ধু নির্বাচনের মতো বিষয়গুলো ব্যক্তিগত সাম্য, অন্যের ক্ষতি না করে নিজের মতো কাজ করা এক ধরনের ব্যক্তিগত সাম্য। আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত সাম্যকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

অর্থাৎ সাম্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আদর্শ নাগরিক হিসেবে জীবন-যাপনের জন্য সব ধরনের সাম্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ব্যক্তি পর্যায়ে যেন একজন অন্যজনের সাম্য নষ্ট না করে তা খেয়াল রাখা নাগরিকের কর্তব্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাম্য কী কী ধরনের হতে পারে?

সারসংক্ষেপ

সাম্য সভ্যতার এক ধরনের বহি: প্রকাশ। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্যের নীতি অনুসরণ করা হয়। এটি সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত হতে পারে। সাম্য প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করে থাকে। নাগরিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সাম্য অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

বহুনির্বাচনী অভিক্ষা

১। যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি লাভের সমতা কোন ধরনের সাম্য?
ক) অর্থনৈতিক সাম্য খ) রাজনৈতিক গ) সামাজিক সাম্য ঘ) ব্যক্তিগত সাম্য

২। 'সকলের সম্মুখে যথার্থ সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রাখার অর্থ হল সাম্য'-সংজ্ঞাটি কার?
ক) এস ই ফাইনার খ) টমাস হবস গ) অধ্যাপক লাস্কি ঘ) কে সি হুয়ার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন−

রহিম ও করিম ছেলেবেলার বন্ধু। করিম পড়াশোনা করলেও রহিম তেমন একটা করেনি। করিম পড়াশোনা করে একটি চাকুরির জন্য দরখাস্ত করল। রহিমও ঐ একই চাকুরির জন্য আবেদন করল। করিম সেই চাকুরির ইন্টাভিউ কার্ড পেলেও রহিম পেল না। এ অবস্থায় রহিম আদালতে মামলা করল যে আমরা দুই বন্ধুই এ দেশের নাগরিক। তাই করিম চাকুরির কার্ড পেলে আমি কেন পাব না?

৩। উদ্দীপকে করিম এর দাবিকৃত যে সাম্যের কথা বলা হচ্ছে তা আসলে কি ধরনের সাম্য?
ক) আইনগত খ) সামাজিক সাম্য গ) রাজনৈতিক সাম্য ঘ) ব্যক্তিগত সাম্য

৪। উদ্দীপকে রহিমের প্রতি চাকুরিদাতা কি ধরনের সাম্য দেখিয়েছে?
ক) আইনগত খ) সামাজিক সাম্য গ) রাজনৈতিক সাম্য ঘ) ব্যক্তিগত সাম্য

পাঠ-৩.৭ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক (Relation between Equality and Liberty)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে সাদৃশ্য আলোচনা করতে পারবেন।
- সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইনের দৃষ্টিতে সমতা, অধিকার, বৈষম্য, স্বতন্ত্র, অস্তিত্ব, অভিন্ন, বিরোধী, পরিপূরক

সাম্য ও স্বাধীনতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এক কথায় যা সাম্য তাই স্বাধীনতা। কোন সমাজে যদি সাম্য না থাকে তবে সেখানে স্বাধীনতাও থাকে না। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছেমতো যা খুশি করা। কিন্তু স্বাধীনতা যদি এভাবে ভোগ করা হয় তবে তা অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। ফলে স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে অন্যের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা হল সাম্য। কেননা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যখন সাম্য বিরাজ করবে তখন সকলেই সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। জ্যাঁ জ্যাক রুশো, এইচ লাস্কি, আর্নেস্ট বার্কার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক। উভয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড়। রুশো (Rousseau) এর মতে "Liberty cannot exist without equality" অর্থাৎ সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্ব নাই। সমাজে সাম্য না থাকা মানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অর্থ ভেদে বৈষম্য করা। এ অবস্থায় একটি সমাজে কারো পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব নয়। আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার নিশ্চিত হলেই কেবল একজন নাগরিক তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

সাম্য ও স্বাধীনতার ধারণা অভিন্ন। স্বাধীনতা এমন একটি পরিবেশকে বোঝায় যেখানে মানুষ নিজের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে। সাম্যও এমন একটি পরিবেশ বা পরিস্থিতি বোঝায় যা ব্যক্তির সকল নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে যার ফলে এক্ষেত্রে সে নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী অর্থনৈতিক সাম্যকে স্বাধীনতার পূর্বশত হিসেবে বিবেচনা করে। এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সমাজে বেশি বৈষম্য দেখা যায়। অর্থনৈতিক মুক্তির বা বৈষম্যের কারণে মানুষের সর্বোচ্চ শুধু নয় স্বাভাবিক বিকাশও চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে কেউ স্বাধীনতার কথা চিন্তাও করতে পারে না। তাই সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে একটু বিপরীত সম্পর্কও রয়েছে। মানুষ প্রাকৃতিকভাবে সমান নয়। প্রত্যেকেই নিজ গুণে স্বতন্ত্র। ফলে একেক জনের স্বাধীনতার মাত্রা একেক রকম। কিন্তু যখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ ব্যতিরেকে সাম্যের বিষয়টি দেখা হয় তখন কেউ একজন অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। মনে হয় যেন সাম্যের কারণে স্বাধীনতা বাধাগ্রস্থ হয়। লর্ড অ্যাকটন, হার্বার্ট স্পেনসার, বেজহট প্রমূখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক রয়েছে মনে করেন। অ্যাকটন (Acton) এর মতে 'সাম্য অর্জনের আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে। তার কথায় "The passion for equality makes vain the hope for freedom"। তবে মোদ্দাকথা হল, স্বাধীনতা যেহেতু অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা নয়, তাই সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিরোধী হতে পারে না। সাম্য ও স্বাধীনতা একে অন্যের পরিপূরক।

পরিশেষে বলা যায় সাম্য ও স্বাধীনতা দুটি বিষয়ই নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে একজন নাগরিক কতটুকু সাম্য বা স্বাধীনতা ভোগ করবে তা রাষ্ট্র নির্ধারণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	'সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক সমধর্মী'- বিশ্লেষণ করুন

সারসংক্ষেপ

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ঘনিষ্ট। একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণ নয়। সাম্য না থাকলে সবাই অবাধ স্বাধীনতা প্রত্যাশা করবে যা অরাজকতার সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে স্বাধীনতা না থাকলে কোন সাম্য অর্জিত হবে না। স্বাধীনতা এক ধরণের অধিকার। তা ভোগ না করতে পারলে সাম্য অর্জিত হবে না। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন। সাম্য স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্থ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। "Liberty cannot exist without equality" –উক্তিটি কার?
ক) ভলটেয়ার খ) জন লক গ) জে এস মিল ঘ) জ্যা জ্যাক রুশো

২। "The passion for equality makes vain the hope for freedom" –উক্তিটি কার?
ক) লর্ড অ্যাকটন খ) টমাস হবস গ) টি এইচ গ্রীন ঘ) জিন বদিন

৩। পৌরনীতি ও নাগরিকতার শিক্ষক ক্লাসে সাম্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বললেন-
i. একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন ii. পরস্পরের পরিপূরক iii. পরস্পর অভিন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের শিক্ষক ক্লাসে বললেন আমরা আধুনিক বিশ্বে যেসব রাষ্ট্রকে এখন উন্নত ও সভ্য দেখছি তারা কিন্তু আজ থেকে কয়েকশ বছর আগেও এতোটা সভ্য ও সুশৃঙ্খল ছিল না। যেমন বর্তমান যুক্তরাজ্যের কথাই ধরা যাক। ব্রিটেনবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীতেও গৃহযুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। সেখানে নাগরিক অধিকার চরমভাবে বিঘ্নিত হতো। জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। কিন্তু আজ তারা পৃথিবীর বুকে নিজেদের নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে গর্বের সাথে মাথা উচু করে দাড়িয়েছে। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের চারটি উপাদান বিদ্যমান থাকার পরও যদি তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক না থাকে তবে তারা সভ্য জাতি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে না। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র, কিন্তু এখানে যদি আইনের শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এটি পৃথিবীর বুকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক) আইন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কি ও তার অর্থ কি?
খ) আইনের উৎসগুলো উল্লেখ করুন।
গ) আইনের শাসন না থাকায় অতীতে যুক্তরাজ্যের অবস্থা কি রূপ ছিল?-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন কেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১ : ১। ক ২
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪ : ১। ঘ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭ : ১। ঘ ২। ক ৩। গ

রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা
(State and Government)

ইউনিট ৪

এ যাবৎকালে সৃষ্ট সবচেয়ে আর্দশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এ চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত। রাষ্ট্রে অন্যান্য অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশের একটি মাধ্যম হল সরকার। এটি রাষ্ট্রের মুখপাত্র ও মস্তিষ্কের মত কাজ করে। জনগণের কল্যাণ ও চাহিদার সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। ফলে সরকারের সাথে রাষ্ট্রের নানামুখী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন ধরণ। এজন্যই পৃথিবীতে নানা ধরনের রাষ্ট্র ও সরকার লক্ষ্য করা যায়। এ ইউনিটে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র গঠনের উপাদান, রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন ধরণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-৪.১ রাষ্ট্র (State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-
- রাষ্ট্র কী সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলো জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জনসংখ্যা, ভূখন্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব, অপরিহার্য

রাষ্ট্র একটি সুসংগঠিত এবং স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ নিজেদের কল্যাণের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে নিজ ইচ্ছায় রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। আধুনিককালে রাষ্ট্র অনেক বিবর্তনের ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদান রয়েছে-

স্থায়ী জনগণ (Population)

জনসমষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের গুরত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে জনমানববিহীন অঞ্চল রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের জন্য স্থায়ী জনসমষ্টি আবশ্যক। তবে জনসমষ্টির নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। কোন কোন রাষ্ট্রে জনসংখ্যা খুব কম হতে পারে আবার কোন কোন রাষ্ট্রে জনসংখ্যা অধিক হতে পারে। যেমন চীনে জনসংখ্যা শত কোটির উপরে। পক্ষান্তরে ব্রোনাইয়ের জনসংখ্যা দুই লাখের মত। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। রাষ্ট্রের প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য জনসমষ্টি অত্যাবশ্যক।

নির্ধারিত নির্ধারণকৃত ভূ-খন্ড (Land)

রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হল ভূ-খন্ড । ভূ-খন্ড বলতে শুধু ভূমি ও জলাশয়কে বোঝায় না বরং একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও এর আকাশ সীমাকে বোঝায়। কোন রাষ্ট্রের আয়তন খুব কম আবার কোনটির খুব বেশি হতে পারে।

যেমন– চীনের আয়তন ৯.৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। অপরপক্ষে বিশ্বের একটি ছোট রাষ্ট্র নাউরু যার আয়তন মাত্র ২১ বর্গ কি.মি.। আবার মনাকোর আয়তন ২.৫ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কি. মি.।

সরকার (Government)

রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় অন্যতম উপাদান হল সরকার। সরকার হল আয়নার মত যাতে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা প্রকাশ পায় এবং সরকারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। সরকার রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনকাজ পরিচালনা করে। তাছাড়া সরকার রাষ্ট্রের সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখে। সরকার মূলত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভাগ তিনটি হলঃ ১। আইন বিভাগ ২। শাসন বিভাগ ৩। বিচার বিভাগ। রাষ্ট্রভেদে সরকার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমনঃ সংসদীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ইত্যাদি।

সার্বভৌমত্ব (Soveneignty)

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। ফলে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে। সার্বভৌমত্বহীন কোন ভূ-খন্ড, জনসমষ্টি ও সরকারকে রাষ্ট্র বলা চলে না। সার্বভৌমত্ব দুই ধরনের হয়।

(ক) অভ্যন্তরীণঃ অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব দ্বারা রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কোন ব্যক্তি বা সংখ্যার উপর অবাধ ও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং আদেশ ও নিষেধ জারি করে। এ ধরনের সার্বভৌমত্ব দ্বারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

(খ) বাহ্যিকঃ বাহ্যিক চরম ক্ষমতা দ্বারা রাষ্ট্র বহি:শক্তির আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এ ধরনের সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিস্তৃত।

অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সার্বভৌমত্ব এবং এ তিনটি উপাদানের সমন্বয়ের জন্য সরকার নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জেলাকে কি রাষ্ট্র বলা যাবে? যদি না যায় তবে কেন?

সারসংক্ষেপ

এ যাবৎকালে সৃষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য জনসংখ্যা, ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব অপরিহার্য। রাষ্ট্রের জন্য জনসংখ্যা ও ভূ-খন্ডের নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। রাষ্ট্রভেদে সরকারের ধরণ ভিন্ন কিন্তু সার্বভৌমত্ব একই রকমভাবে ভোগ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা

১। সার্বভৌমত্ব কয় ধরনের?
(ক) চার (খ) দুই (গ) পাঁচ (ঘ) তিন

২। রাষ্ট্রের উপাদানগুলো হল-
সার্বভৌমত্ব ii) বিচার বিভাগ iii) সরকার iv) জনসমষ্টি
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i + ii + iv (খ) i + iii + iv (গ) ii + iii + iv (ঘ) i + iv

পাঠ-৪.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র (Economic System and State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্রকে কিসের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তা জানতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণিকৃত রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা, অর্থনীতি, জনকল্যাণ, সম্পদ, উৎপাদন, বন্টন, সমান

মানব সমাজের কল্যাণের তাগিদে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে শ্রেণি বিভাগ করা হয়।

১। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
২। ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে
৩। ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে
৪। উত্তরাধিকার সূত্রে
৫। উদ্দেশ্য অনুসারে

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে মালিকানার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র (Capitalist state) এবং
২। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Socialist state) ।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ঃ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে পুঁজি সংগ্রহ, বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের উপর রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা থাকে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ বিদ্যমান। সাধারণত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মুক্ত বাজার অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবে না বরং চাহিদা ও যোগান দ্বারা বাজার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক ব্যয় কম হয় এবং সরকার পুঁজি বিনিয়োগের যাবতীয় কাঠামোগত ও নীতিগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। ফলে ধনী-দরিদ্র্যের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপাদান যেমন-ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপনা সবকিছুর মালিকানা থাকে রাষ্ট্রের হাতে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা নেই। বরং ব্যক্তির জীবনে প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বীয় হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আয়ের উপর করারোপ করে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য রাষ্ট্র সর্বদা সচেষ্ট থাকে। রাষ্ট্র শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করে দেয় এবং রাষ্ট্র তার রাজস্ব আয় জনকল্যাণে ব্যয় করে। বিলুপ্ত হওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে চীন, ভেনিজুয়েলা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো হল

১। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। অন্য দলের অস্তিত্ব থাকে না।
২। উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বলবৎ করা হয়।
৩। সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না।

৪। সরকার গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে।
৫। এ ধরনের রাষ্ট্রে দল ও সরকার একই হয়। দলই সব ক্ষমতা ভোগ করে।

অর্থাৎ অর্থনীতি রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয়ে গুরুত্বপুর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রীয়-সম্পদ, পুঁজি, বিনিয়োগ, শ্রম ও মুনাফা এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকলে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অন্যদিকে এসব বিষয়ে যদি রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে তবে তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের প্রকারভেদের ভিত্তিগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

নানাবিধ কারণে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মিশ্র অর্থনীতি ভিত্তিক রাষ্ট্র, ইসলামী অর্থব্যবস্থা ভিত্তিক রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা ও বাজারের অবাধ ও অনেক সময় অসম প্রতিযোগিতা। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রাধান্য পায় কিন্তু সামাজিক বৈষম্যও পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পদ ও বাজার ব্যবস্থা রাষ্ট্র মালিকানায় থাকে এর ফলে সমাজে একটা সমতার পরিবেশ বজায় থাকে। কিন্তু নাগরিকগণ চরমভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা বঞ্চিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন ধারণার উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।
ক) মুক্ত বাজার অর্থনীতি খ) সম্পদের সুষম বন্টন
গ) নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ঘ) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

২। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র “ এ ধরনের শ্রেণি বিভাজন কিসের ভিত্তিতে ?
ক) সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে খ) ক্ষমতা বন্টন নীতির ভিত্তিতে
গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতেঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৪.৩ ক্ষমতার উৎস এবং রাষ্ট্র
(Sources of Power and State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে কত ভাগে ভাগ যায় তা জানতে পারবেন।
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	জনগণ, ক্ষমতার উৎস, গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বশীল, একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার

রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয়ে ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য একটি নিয়ামক। ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ১। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Democratic State) এবং ২। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Autocratic State)।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গণতন্ত্র হল জনগণের সরকার। জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। লর্ড ব্রাইস এর মতে, "যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা কোনো বিশেষ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত না থেকে সমাজের সকল সদস্যের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে।" একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল মানুষের স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। আধুনিক গণতন্ত্রে জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। মতামত প্রকাশের অধিকার ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সরকারের সমালোচনার সুযোগ থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। এতে জনগণের স্বার্থ রক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেয়া থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেমন: বাংলাদেশ , ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুনাবলি

গণতন্ত্র জনগণের অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। এটি আধুনিককালে সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের অনেক ভাল দিক রয়েছে। নিম্নে গণতন্ত্রের গুনাবলি আলোচনা করা হল-

১. **দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা :** এ শাসন ব্যবস্থায় সরকার জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। সরকার রাষ্ট্রের যে কোন কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে এবং পরবর্তী নির্বাচনে জয় লাভের জন্য জনস্বার্থমূলক কাজ করে থাকে। এর ফলে দেশে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. **ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা-কবচ :** গণতন্ত্র নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণ মতামত প্রকাশের অধিকার ভোগ করে। ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। সকলে মিলে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। এতে নাগরিকের অধিকার রক্ষা হয়।

৩. **সমানাধিকার :** গণতন্ত্রে সবাই সমান। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রত্যেক ক্ষেত্রে সবার অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে।

৪. **সরকারের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি:** জনগণের আস্থা যত দিন থাকে সরকার তত দিন স্থায়ী হয়। তাই জনসমর্থন লাভের আশায় দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা করতে স্বচেষ্ট হয়। এতে সরকারের সুনাম ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৫. নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি : রাষ্ট্রে পরিচালনার ভার থাকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অন্যতম হাতিয়ার হল নির্বাচন। এটি জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ফলে নাগরিকদের সংস্কৃতি উন্নত হয় এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং নাগরিকের সম্মান বেড়ে যায়।

৬. বিপ্লবের সম্ভাবনা হ্রাস : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার পরিবর্তনশীল। সুনির্দিষ্ট সময় পরপর সরকার পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ থাকায় বিপ্লবে সম্ভাবনা কম থাকে।

৭. রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যম : গণতন্ত্র সকলকে রাজনৈতিক চর্চার সমান সুযোগ দেয়। ফলে সকলেই রাজনীতি চর্চা ও রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা লাভ করে। তাই জে.এস. মিল বলেন, "গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থার শিক্ষা দান করে।"

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষ

গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থা হলেও এর কিছু ত্রুটি আছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল:

১. দলকানা শাসন ব্যবস্থা : গণতন্ত্রে ক্ষমতাশীল দল সর্বদাই নিজ দলের স্বার্থ রক্ষা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি অনেকটা অবজ্ঞা করে।

২. অজ্ঞ ও অযোগ্যদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক মনোনয়ন করা হয়। ফলে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লেকি (Lacky) বলেন, "গণতন্ত্র, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অযোগ্যদের শাসন।" বিজ্ঞ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ নির্বাচনের জটিলতায় অংশ নিতে চায় না বলেই অদক্ষ মানুষ যে সুযোগ নিয়ে থাকে।

৩. যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার প্রাধান্য : গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। ফলে এখানে গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার গুরুত্ব প্রাধান্য পায়। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার নির্বাচিত হয় বিধায় মেধা ও যোগ্যতার অবমূল্যায়নের সুযোগ রয়ে যায়।

৪. ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন : ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন গণতন্ত্রের অন্যতম সীমাবদ্ধতা। একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করার পর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিকল্পনা তৈরি করে। কিন্তু ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে এসব পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না।

৫. আবেগ দ্বারা পরিচালিত : গণতন্ত্রে আবেগের প্রভাব বেশি। অনেক সময় বক্তাগণ আবেগময় বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে বশ করে ফেলে। এর ফলে দূর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হয়।

তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থারও কিছু সমস্যা থাকে। আইনের শাসন, উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, বাকস্বাধীনতা, সাম্য, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ইত্যাদি টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হল যেখানে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা শাসকের হাতে অর্পিত থাকে। তিনি একক সিদ্ধান্তে উক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন। এ ধরনের ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ থাকে আজ্ঞাবাহী অর্থাৎ শাসকের আদেশ নিষেধ মেনে চলে। একক রাজনৈতিক দল থাকে এবং শাসকের জবাবদিহিতা অনুপস্থিত।

একনায়কতন্ত্রে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার (রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র) সীমিত স্বাধীনতা থাকে এবং এসব মাধ্যম সরকারের প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত হয়। আইন ও বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একনায়কতন্ত্রের মূলমন্ত্র হল এক জাতি, এক নেতা ও এক দেশ। হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো ছিলেন একনায়কদের মধ্যে অন্যতম।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুবিধা

একনায়ক রাষ্ট্রের উন্নতি চাইলে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। উন্নয়ন প্রকল্প ও ধারা অব্যাহত থাকে। নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বেশি স্বাধীন। একনীতি ও আদর্শে রাষ্ট্র শাসিত হওয়ায় রাষ্ট্রের ঐক্য বজায় থাকে। বিভিন্ন দল-উপদল, গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন করতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনা তুলনামূলক সরল প্রকৃতি এবং ব্যয় বহুল নয়।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ:

একনায়কতন্ত্র চরম ও স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির সরকার ব্যবস্থা। এটি মূলত একটি অকল্যাণকর শাসন ব্যবস্থা। এর ত্রুটিসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল:

১. স্বৈরাতান্ত্রিক: একনায়কতন্ত্র সর্বাত্মক প্রকৃতির এবং স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কারণ একনায়ককে কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা এক জনের হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি তার ইচ্ছামত ক্ষমতা ব্যবহার করেন। তিনি সংবিধানের উর্ধ্বে উঠে নিজের খেয়াল খুশিমত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

২. ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী: এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী। শাসকের নির্দেশই হল আইন। ফলে এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করে। এতে ব্যক্তির স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগ নেই।

৩. বিপ্লবের সম্ভাবনা: এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় বিপ্লবের ভয় থাকে কারণ এতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। শাসক জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনতে চান না। আইনের অনুশাসন ও ন্যায় বিচার সাধারণত উপেক্ষিত হয়। রাষ্ট্রনায়কের অসীম ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণ ঐকবদ্ধ হয়। প্রয়োজনে তারা বিপ্লবের ডাক দেয়।

৪. নেতৃত্ব সৃষ্টির অন্তরায়: একনায়কতন্ত্রে একক নেতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ খুবই কম থাকে। উপরন্তু রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বাধাগ্রস্ত হয় কারণ এতে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে না।

৫. বিশ্বশান্তির হুমকিস্বরূপ: বিশ্বে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা বেশি হলে রাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তি বিরোধী কারণ এটা উগ্রজাতীয়তাবোধকে ধারণ ও লালন করে। জার্মানির হিটলার ও ইতালির মুসোলিনী এমন মনোভাব দেখিয়ে বিশ্বযুদ্ধ উস্কে দিয়েছিলেন।

৬. আইনের শাসন উপক্ষো : একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন থাকে না। বরং এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি বা একনায়ক তার ইচ্ছানুযায়ী সংবিধান ও বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৭. রাষ্ট্রের প্রাধান্য : "রাষ্ট্রই সব, সকলেই রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রই সকল ক্ষমতার উৎস"- একনায়কতন্ত্র এরূপ পরিস্থিতি তৈরি করে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র ও সরকারের মধে কোন ব্যবধান থাকে না। তাই জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকে না।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের কোন সুযোগ থাকে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে?

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রধানত দুই প্রকার- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। এ ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণ, ভোটাধিকার প্রয়োগসহ রাজনীতি চর্চার সুযোগ থাকে। অন্যদিকে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক ব্যক্তির শাসন বহাল থাকে। ফলে সেই একনায়কের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজস্ব মত প্রকাশের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। জনগণ স্বাধীনভাবে রাজনীতি চর্চা করতে পাওে না, তাছাড়া এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন অবকাশও নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। সার্বভৌম ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় ধরনের?

ক) এক খ) দুই গ) তিন ঘ) চার

পাঠ-৪.৪ ক্ষমতার বন্টন নীতি এবং রাষ্ট্র (Distribution of Power and State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষমতার বন্টন নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা অর্পণ, ফেডারেশন, দ্রুত, ধীর, সাংবিধানিক, কেন্দ্র ও প্রদেশ

রাষ্ট্রের আয়তন, জনসংখ্যা ও জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভিন্ন বিভাগ ও অঞ্চলে বন্টন করা হয়। ক্ষমতা বণ্টনের ধরণ ও নীতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- (১) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State) এবং (২) যুক্তরাষ্ট্র (Federal State)।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা (Unitary State)

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সার্বিকভাবে কেন্দ্রিয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। এতে কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা উৎসারিত হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে শাসনকার্যের সুবিধার্থে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিগণও সেসব অঞ্চলের প্রশাসনিক অবস্থা তদারকি করেন। বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় সমগ্র রাষ্ট্রে একই প্রকার নীতি আইন ও পরিকল্পনা একযোগে বলবৎ করা হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রশাসনিক সামঞ্জস্যতা রক্ষা পায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। কারণ এ ধরনের রাষ্ট্র বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকলেও আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন থাকে না। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সর্বাধিক উপযুক্ত এবং একটি জনপ্রিয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

আবার এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, বৃহদায়তন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে খুব বেশি কার্যকর নয়। কারণ সকল অঞ্চলের জন্য গ্রহণযোগ্য নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা জটিল ব্যাপার। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের বাড়তি চাপ পড়ে। যার ফলে কেন্দ্র অন্যান্য প্রদেশ বা অঞ্চলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পারে না। তাছাড়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যখন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় তখন সকল প্রদেশ বা এলাকার জন্য একক ও অভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অথচ ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র কঠোর সমালোচনার শিকার হয়।

সর্বোপরি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত।

যুক্তরাষ্ট্র (Federal State)

ইংরেজি ফেডারেশন (Federation) শব্দের পারিভাষিক রূপ হল যুক্তরাষ্ট্র যার উৎপত্তি ল্যাটিন Foedus শব্দের অর্থ মিলন। সুতরাং শাব্দিক অর্থে যুক্তরাষ্ট্র বলতে একাধিক রাষ্ট্র মিলিত হয়ে একরাষ্ট্রে পরিণত হওয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। Prof. Diceye বলেন "যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হল জাতীয় ঐক্যের সাথে অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন"।

এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে শাসন পরিচালনার সুবিধার্থে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সবসময় শক্তিশালী হয়। কারণ পাশাপাশি কতগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে এ ধরনের রাষ্ট্র গঠন করে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার সম্পদ আহরণের মাধ্যমে শক্তিশালী ও বৃহৎ অর্থনীতি গঠন করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। সে কারণে পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রই কম বেশি উন্নত। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ। আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতও একটি যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণ দুটি সরকারের প্রতি অনুগত্য দেখায়। দুই প্রকার আইন ও আদেশ মেনে চলে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা বজায় রেখে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে। যেমন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় না।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জটিল প্রকৃতির। কারণ বাহির থেকে এটি শুধু একটি রাষ্ট্র কিন্তু ভেতর থেকে এটি বহুরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টনের ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশগুলো স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসিত হওয়ায় কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। যেমন- কানাডার কুইবেক প্রদেশটি বিচ্ছিন্ন হতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ত্রুটি থাকলেও নিঃসন্দেহে এটি একটি কাম্য শাসন ব্যবস্থা।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কি কার্যকরী হবে?

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতার বন্টণ নীতিতে দুই ধরণের রাষ্ট্র দেখা যায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা হয়। সরকার, জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারী একটি কেন্দ্রের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। তুলনামূলক ক্ষুদ্র আয়তনের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা খুব কার্যকর কিন্তু বৃহৎ আয়তনের রাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা থাকলে জনগণ প্রকৃত জনসেবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। অন্যদিকে যে ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশের মাঝে নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় তাই হল যুক্তরাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্রে সাধারণত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা প্রদেশে ভাগ করে দেওয়া হয়। যেমন- আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা

১। ক্ষমতা বন্টনের ধরণ ও নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় ধরনের?

ক) এক খ) দুই গ) তিন ঘ) চার

২। ভারত + বাংলাদেশ হল−

i) এককেন্দ্রিক + যুক্তরাষ্ট্রীয় ii) গণতান্ত্রিক + এককেন্দ্রিক
iii) যুক্তরাষ্ট্রীয় + এককেন্দ্রিক iv) এককেন্দ্রিক + এককেন্দ্রিক

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) ii খ) iii গ) ii+iv ঘ) iii + iv

পাঠ-৪.৫ উত্তরাধিকার এবং রাষ্ট্র
(Heredity and State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কত প্রকার তা জানতে পারবেন।
- নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হবে।
- নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ধরন বুঝতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজা বা রানী, নামমাত্র, উত্তরাধিকার, স্বেচ্ছাচারিতা, সীমিত

কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বন্টন করা হয়। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। উত্তরাধিকার বলে রাজতন্ত্রে রাজার পুত্র অথবা কন্যা রাষ্ট্রের রাজা বা রানী হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজতন্ত্র ছিল ইতিহাসের ফল ও জনপ্রিয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা। বিংশ শতাব্দীতে এসে কিছু কিছু রাষ্ট্র ব্যতীত সবখানেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। রাজতন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ

১। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং

২। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র

এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা বা রাণী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এতে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সকল ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকায় জরুরি মূহুর্তে রাজা দ্রুত এবং চটজলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। আবার নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা বেশি দিন ধরে ক্ষমতায় থাকার দরুন অভিজ্ঞ হয়। সেই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্যের মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে পারে। যেমন ইংল্যান্ডের এলিজাবেথ, রানী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ তারা খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।

অন্যদিকে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রধান অসুবিধা হল উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সময় অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য ব্যক্তি রাজা বা রানী হতে পারে। এতে করে প্রশাসনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। আবার নিরঙ্কুশ রাজা তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারি হয়। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের রাষ্ট্রের সংখ্যা খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ জর্দান ও সৌদি আরবের শাসন ব্যবস্থা কে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বলা যায়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা বা রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে নতুবা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রের প্রধান হন। রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকে। রাজা বা রানী এক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের একটি বিশেষ সুবিধা হল এতে গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয় এবং প্রশাসনিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে জনপ্রতিনিধিদের পূর্ণ অংশগ্রহণ থাকে। এক্ষেত্রে রাজা বা রাণী কোন দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না বরং তিনি কাউন্সিলসর অব মিনিস্টারসদের প্রতি পক্ষপাতহীন থাকেন। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা বা রাণী নামমাত্র রাষ্ট্র প্রধান হন। রাজা বা রানীর সম্মানসূচক একটি অবস্থান থাকে এবং বিশেষ কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজার কর্তৃত্ব সীমিত থাকে এবং মন্ত্রিরা প্রকৃত ক্ষমতা চর্চা করে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন রাজার নিকট নন।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পার্থক্য করুন।

সারসংক্ষেপ

রাজার সন্তান রাজা হবে এটাই রাজতন্ত্র বা উত্তরাধিকার সূত্রে গঠিত রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য। এই রাজতন্ত্র দুই ধরনের হয়ে থাকে, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের এ যুগে রাজতন্ত্র খুব একটা কার্যকর নেই। তবু সৌদি আরব, কাতার, ওমান, ব্রুনাই এর মত রাষ্ট্রে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র রয়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক অনেক রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে। যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের রাজতন্ত্রে রাজা বা রাণী জনপ্রতিনিধিদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং তারাই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের এ ধরনের শ্রেণীকরণ কিসের ভিত্তিতে ?
ক) উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে
খ) উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে
গ) ক্ষমতা বন্টন নীতির ভিত্তিতে
ঘ) আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে

২। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে নামমাত্র ও প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন যথাক্রমে কারা?
ক) রাজা বা রানী ও জনপ্রতিনিধি
খ) জনপ্রতিনিধি ও ন্যায়পাল
গ) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি
ঘ) রাজা বা রাণী ও বিচারবিভাগ

পাঠ-৪.৬ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র
(Types of State on Purpose)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কেমন হয় তা জানতে পারবেন।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কল্যাণ, মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা, জীবনমান, গ্রহণযোগ্যতা

রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ। মানুষ নিজেদের অধিকার, কল্যাণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। এই উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে গঠিত রাষ্ট্র হল কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State)

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করে থাকে। মানবিক চিত্ত বিকাশে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রগুলো সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে না। উদাহরণস্বরূপ- ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি। কল্যাণমুলক রাষ্ট্র সনাতন রাষ্ট্রের একটি আধুনিক রূপ। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ ধরনের রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। পূর্বে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহি:শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা। রাষ্ট্র এখন আর পুলিশি দায়িত্ব পালন করছে না। জনকল্যাণ সাধনই আজকের যুগে রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। বর্তমানে রাষ্ট্র শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র। নিম্নে সে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হল−

- রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। পাশাপাশি রাস্তাঘাট, এতিমখানা, সরাইখানা, খাদ্য ভর্তুকি প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াও বেকার ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, অবসরকালীন ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনী থাকে না বললেই চলে। এসব রাষ্ট্র সামরিক ব্যয় হ্রাস করে জনকল্যাণমূলক কাজে ভর্তুকি বৃদ্ধি করে।
- এ ধরনের রাষ্ট্র কর ব্যবস্থার মাধ্যমে (ধনীদের উপর উচ্চহারে ও দরিদ্রদের উপর কম হারে কর ধার্য করা) গরীব, অসহায় ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- নুন্যতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষক শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া সমবায় সমিতি ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সর্বদাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার স্বীকার করে এবং তা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- জনসাধারণের জীবনমান বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। যেমন-পেনশন প্রদান, যৌথ বীমা, বেকার ভাতা প্রদান, কল্যাণ ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ কী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র?

বাংলাদেশ পুরোপুরি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়। কেননা বাংলাদেশে এখনও সকলের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত নয়। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের তথ্যমতে এখন প্রায় ৩১ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। তবে দারিদ্রের হার যে গতিতে হ্রাস পাচ্ছে তাতে বাংলাদেশ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে এটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কাছাকাছি চলে এসেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র? আপনার উত্তর ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, যদিও মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল শোষণের হাতিয়ার। তবে এটাও সত্যি আধুনিক কালে রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। কেননা রাষ্ট্র নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তাসহ জীবনের জন্য অনেক অপরিহার্য চাহিদা মিটিয়ে থাকে। অনেক সুকুমার বৃত্তির বিকাশেও ভূমিকা রাখে। তবে পৃথিবীতে কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলো জনগণের জন্য অধিক কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে সেগুলোকেই কল্যাণ রাষ্ট্র বলা হয়। যেমন-সুইডেন, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত কল্যাণরাষ্ট্র। তবে অনেক রাষ্ট্র কল্যাণরাষ্ট্রের মত কাজ করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও পুরো কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোন্টি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক) মৌলিক চাহিদা পূরণ করা
খ) সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া
গ) কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করা
ঘ) দরিদ্রদের উপর অপেক্ষাকৃত কম হারে কর ধার্য করা

২। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পর্কে বলা যায়–
i) একবিংশ শতাব্দীতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে
ii) কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সর্বদা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী
iii) যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে একমাত্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র
iv) কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে

নিচের কোন্টি সঠিক?
ক) iii ও iv খ) i+ iii গ) i+ ii+ iii ঘ) i+ iv

পাঠ-৪.৭ সরকার (Government)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কোন্ কোন্ ভিত্তিতে সরকারকে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় তা স্পষ্ট হবে।
- সরকারের বিভাগ সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিচালনা, নির্বাহ, ক্ষমতার বন্টন, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়

রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হল সরকার। সরকার ব্যতিরেকে রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। সরকার হল রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম। সরকারের মাধ্যমে মূলত রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সরকার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সরকার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাও সরকারের দায়িত্ব। অধ্যাপক আর জি গেটেল বলেন, "সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি যন্ত্র বা সংস্থা।" (Government is the organization or machinery of the state.)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল সরকারকে মস্তিষ্কের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি জীবদেহের মতো হলে তাকে পরিচালনার জন্য যেমন মস্তিষ্কের প্রয়োজন তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার অপরিহার্য।

সরকার মূলত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে। যথা–

১। আইন বিভাগ (Legislature),

২। শাসন বিভাগ (Executive) এবং

৩। বিচার বিভাগ (Judiciary)।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

দার্শনিকগণ সরকারের ধারণার সৃষ্টি কাল থেকে সরকারকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। গ্রীক পন্ডিত এরিস্টটল তার বিখ্যাত The Politics গ্রন্থে দুটি মূলনীতির ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্রথমটি হল উদ্দেশ্যমূলক নীতি ও অন্যটি হল সংখ্যানীতি। এ দুটি নীতির উপর ভিত্তিকে তিনি ছয় ধরনের সরকার ব্যবস্থা উল্লেখ করেন।

শাসকের সংখ্যা	*স্বাভাবিক রূপ*	*বিকৃত রূপ*
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচারতন্ত্র
কয়েকজনের শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজনের শাসন	গণতন্ত্র	জনতন্ত্র

পরবর্তী সময়ে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তবে স্টিফেন লীকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণিবিভাগটিই এ পর্যন্ত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। লীকক সরকারকে মূলত দু ভাগে ভাগ করেছেন। যথা গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র। গণতন্ত্রকে তিনি আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসেবে শ্রেণিভূক্ত করেছেন। পরোক্ষ গণতন্ত্র আবার দু'ধরনের: একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র অন্যটি সাধারণতন্ত্র। ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র আবার এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে পারে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আবার সংসদীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার নামক দুটি রূপের কথা বলেছেন। তবে আধুনিক কালে নিম্নরূপ সরকার ব্যবস্থা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

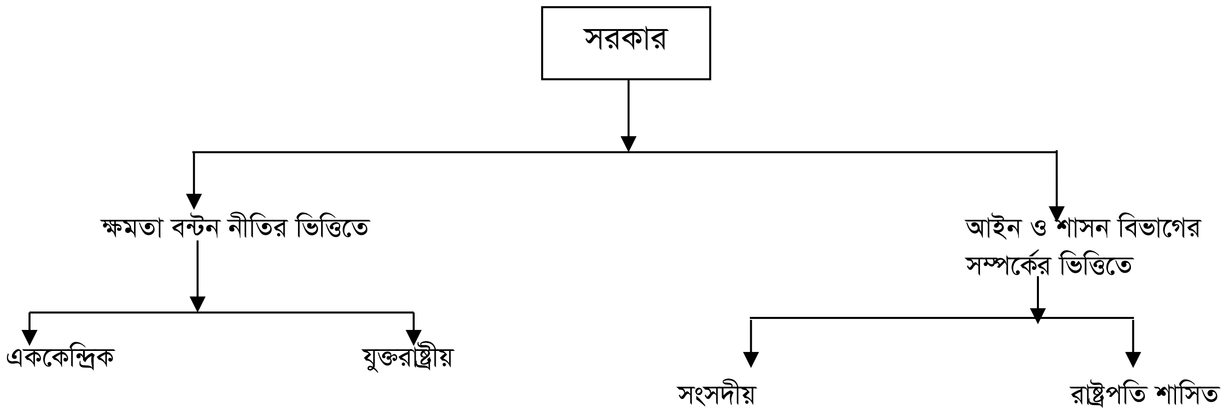

সরকারের ধরণ যেমনই হোক সরকার হল রাষ্ট্র নামক জাহাজের কান্ডারী। সরকারের উপরই নির্ভর করে জনগণের কল্যাণ। আধুনিককালে যে সরকার জনমত ও কল্যাণকে যত প্রাধান্য দিচ্ছে সে সরকারই বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সরকারের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতার বিন্যাস ও প্রয়োগভেদে সরকার ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোন ব্যবস্থায় সরকার কেন্দ্র হতে পরিচালিত হয় আবার কোন ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশ দুই অংশ থেকে; কোথাও সরকার আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকে; আবার কোথাও এক ব্যক্তির নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সরকার ব্যবস্থা যে ধরণের হোক সব ধরণের সরকারেরই আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ক্ষমতা বন্টন নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীকরণ কোন্‌টি?
ক) এককেন্দ্রিক ও রাষ্ট্রপতি শাসিত
খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয়
গ) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়
ঘ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ও রাষ্ট্রপতি শাসিত

২। কোন্‌টি ঠিক?
ক) ভারত ঃ এককেন্দ্রিক ও সংসদীয়
খ) যুক্তরাষ্ট্র ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত ও যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ) বাংলাদেশ ঃ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ও এককেন্দ্রিক।
ঘ) যুক্তরাজ্য ঃ সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয়।
ক) i ও iv খ) ii ও iii গ) ii, iv ও i ঘ) ii, iii ও iv

পাঠ-৪.৮ ক্ষমতার বন্টন নীতি অনুসারে সরকার (Government on Principles of Distribution of Power)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষমতার বন্টন নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীগুলো জানতে পারবেন।
- এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কী বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্র ও প্রদেশ, সরকার প্রধান, রাষ্ট্র প্রধান, জাতীয় ঐক্য, জটিল, স্বেচ্ছাচারিতা

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাংবিধানিকভাবে একটি অংশের কাছেও রাখা যায়, আবার রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে তা কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়। এভাবে ক্ষমতা বিভাজনই ক্ষমতা বন্টন। ক্ষমতা বণ্টনের নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:
এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government) এবং
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)।

এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government)
এই সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকার থাকে না। তবে প্রাদেশিক প্রশাসন থাকতে পারে যা কোন প্রাদেশিক সরকার নয়। প্রাদেশিক প্রশাসন কেন্দ্রিয় প্রশাসনের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের প্রয়োজন নেই। যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, জাপান প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার রয়েছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধাসমূহ
এককেন্দ্রিক সরকারের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল-

১. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা
এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশ থাকলেও প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন থাকে না। একারণে সারাদেশে একই নীতিমালা, পরিকল্পনা ও আইন প্রণয়ন করা সুবিধাজনক হয় যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়।

২. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের স্বার্থ আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হয় না। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝামেলা কম হয়।

৩. সাংগঠনিক সহজবোধ্যতা
এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং এর সাংগঠনিক ব্যবস্থা সরল প্রকৃতির হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব থাকে না। তাছাড়া সারাদেশে অভিন্ন পরিকল্পনা, নীতি ও আইন বাস্তবায়ন করা হয় বিধায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়। ফলে সাংগঠনিক দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্যতা ঠিক থাকে।

৪. সরকারি ব্যয় কম
শুধুমাত্র কেন্দ্রে সরকার গঠন করায় এককেন্দ্রিক সরকারে প্রশাসনিক ব্যয় খুবই কম। কেন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য প্রশাসনিক অঞ্চলে কোন সংসদ বা মন্ত্রিপরিষদ না থাকায় সরকারের ব্যয় কম হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাহায্যে সরকার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হয়।

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ

এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধার পাশাপাশি বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে।

এককেন্দ্রিক সরকার নেতৃত্ব বিকাশের পরিপন্থী। সমগ্র দেশের কার্যক্রম একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হবার ফলে সরকারি কাজ স্থবির হয়ে যায়। কেন্দ্র প্রায়শ স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব দেখায়। সর্বোপরি এটি বৃহ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)

একাধিক স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ মিলে যখন একটি সরকার গঠন করে তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। বস্তুত এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা আংশিকভাবে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রদেশ ও কেন্দ্র উভয়েই ক্ষমতা লাভ করে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বজায় রেখে নিজ নিজ শাসন পরিচালনা করতে পারে। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দ্বৈত সরকারও বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুবিধা বা গুণাবলিগুলো হল-

১. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বকীয়তা ও ভিন্নতা বজায় থাকে। এ ধরনের ব্যবস্থা স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিতকরণ ও জাতীয় ঐক্য তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্য থাকলেও এক ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠে।

২. স্থানীয় সমস্যা সমাধান

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার স্থানীয় সমস্যাগুলো সহজে চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা সমাধান করতে পারে। এক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ হ্রাস পায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর থেকে কাজের চাপ লাঘব হয় এবং কেন্দ্র তার দায়িত্ব পালনে অধিক সুযোগ পায়।

৪. শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে উপযোগী

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হবার সুযোগ পায়। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রগুলো কম বেশি উন্নত হয় কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজি গঠনপূর্বক রাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৫. নেতৃত্বের বিকাশ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। স্থানীয় সমস্যাগুলো স্থানীয় জনসাধারণই সমাধান করে। ফলে তারা রাষ্ট্রীয় কার্যে জড়িয়ে পড়ে। এতে করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

৬. রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণ দু'টি সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায় এবং দু প্রকার আইন ও আদেশ মেনে চলে। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মানুষ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসার ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অসুবিধাসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ

১. জটিল সরকার ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। বাইরে থেকে এটি এক রাষ্ট্র মনে হলেও ভেতরে এটি অনেক রাষ্ট্রের সমন্বিতরূপ। এ ধরনের রাষ্ট্রে কেন্দ্রিয় সরকার ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারের অস্তিত্ব থাকে অর্থাৎ সরকারের ভিতর সরকার। এখানে

আঞ্চলিক ও কেন্দ্রিয় সকল ধরনের আইনই বলবৎ থাকে যা কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে (আইন তৈরিও তা বাস্তবায়ন, ক্ষমতা বণ্টন) জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

২. ব্যয়বহুল শাসন ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একটি ব্যয়বহুল সরকার ব্যবস্থা। এতে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারের দুটি আলাদা শাসন কাঠামো থাকে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশাসনে বহুসংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করে। এতে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৩. সাংগঠনিক দুর্বলতা

সাংগঠনিক দুর্বলতা এ ধরনের সরকারের একটি অন্যতম সমস্যা। ক্ষমতা ভাগাভাগি হওয়ার ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের মতামত প্রয়োজন হয়। তাই জরুরি অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

৪. বিচ্ছিন্নতামুখী

এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রদেশগুলো স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসিত। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে আঞ্চলিকতার জন্ম হয়। এর ফলে কোন কোন প্রদেশ বা অঞ্চল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুবিধা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা বন্টণের ভিত্তিতে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়। সরকারের প্রধান নির্বাহী ও সকল জনপ্রতিনিধি একই আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সাধারণত ক্ষুদ্র আয়তনের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকার খুব কার্যকর হয়। অন্যদিকে যে সরকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশ এই ভাগে বিভক্ত থাকে তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে জড়িত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সাধারণত প্রাদেশিক সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বৃহৎ আয়তনের রাষ্ট্রে সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বেশি দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোনটি এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধা নয়?

ক) জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা খ) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ গ) স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের পরিপন্থী ঘ) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার–

i) স্থানীয় সমস্যা দ্রুত সমাধান করে।
ii) জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে
iii) ক্ষমতা বন্টন নিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে
iv) বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i+ iv খ) ii + iii গ) iii + iv ঘ) সবকটিই।

পাঠ-৪.৯ আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অনুযায়ী সরকার
(Types of Government according to Relation between Legislature and Executive)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অনুযায়ী সরকারের শ্রেণি জানতে পারবেন।
- সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, রাষ্ট্রপ্রধান, আইন প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য, দায়িত্বশীল

সরকারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল আইন ও শাসন বিভাগ। এ দু'টি বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে দু ভাগে ভাগ করা যায় যথা:
সংসদীয় সরকার (Parliamentary form of Government) ও
রাষ্ট্রপতি শাসতি সরকার (Presidential form of Government)।

সংসদীয় সরকার (Parliamentary form of Government)
সংসদীয় সরকারের অপর নাম মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। সংসদীয় সরকার হল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারের সকল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে। নির্বাহী বিভাগ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং দলের একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ প্রদান করেন। এ সরকার ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন যিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয় বলে একে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে সংসদীয় সরকার প্রচলিত আছে।

সংসদীয় সরকারের গুণাবলি
সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা হল একটি জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা। নিম্নে এর গুণাবলি বর্ণিত হল-

১. আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়
এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে। কারণ শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইন সভার সদস্য হন।

২. দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা
সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারের মন্ত্রীগণ একক ও যৌথভাবে আইনসভা অর্থাৎ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন বলে একে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা বলে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণ জনগণের নিকট দায়ী থাকেন।

৩. বিরোধীদলের গুরুত্ব

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দল হল কার্যকর সংসদ গঠনের পূর্বশর্ত। বিরোধী দলকে ছায়া সরকারও বলা হয়। বিরোধী দলের অস্তিত্ব মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের জন্য অপরিহার্য। বিরোধী দল সরকারের দোষ-ত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরে। তাছাড়া জাতীয় সংকটে অথবা যে কোন অবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

৪. নমনীয়তা

সংসদীয় সরকার নমনীয় প্রকৃতির। এখানে সংসদ জনগণের প্রয়োজনে ও দেশের স্বার্থে যে কোন সময় সহজেই সংবিধান সংশোধন করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া জনসাধারণ প্রয়োজনে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করতে পারে।

৫. রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার

সংসদীয় সরকার জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। সরকারি ও বিরোধী দল জনমতকে তাদের অনুকূলে রাখার জন্য সবসময় তৎপর থাকে। তাছাড়া সরকারের কাঠামো ও নীতিমালা এবং রাষ্ট্রের কার্যক্রম নিয়ে সংসদে বিতর্ক হয়। এতে করে জনসাধারণ তাদের করণীয় ঠিক করে নিতে পারে। ফলশ্রুতিতে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৬. একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থান

সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। এতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করে। আর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না তারা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এভাবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় একাধিক দলের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

৭. ঐতিহ্য রক্ষা

সংদীয় সরকার দেশের শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে। যেমন- ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

সংসদীয় সরকারের ত্রুটি

বর্তমান সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা খুব জনপ্রিয়। কিন্তু এ সরকারের কিছু ত্রুটি রয়েছে। সংসদীয় ব্যাবস্থায় একই ব্যক্তি শাসন ও আইন বিভাগের দায়িত্বে থাকে ফলে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি কার্যকর সম্ভব হয় না। সকল ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। সংসদ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার সরকারের অস্থিতিশীলতা থাকে না। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ট দল সরকার গঠন করে বলে দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য দেয়া হয় এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রপতি শাসতি সরকার (Presidential form of Government)

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার হল এমন এক সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রপতির হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। তিনি তার কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন না। অর্থাৎ শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রকৃত শাসক ও নির্বাহী প্রধান একই ব্যক্তি হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের কতগুলো উল্লেখযোগ্য গুণাবলী আছে। নিম্নে সেগুলো বর্ণিত হল-

১. স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষাপকৃত স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন। রাষ্ট্রপতি আইনসভার আস্থা বা অনাস্থার উপর নির্ভর করেন না। অভিশংসন (কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে অপসারণ করা) ছাড়া তাকে ক্ষমতাচ্যূত করা যায় না। তাই নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার পতনের সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

২. ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ভারসাম্য নীতির সহায়ক

এ ধরনের সরকারের একটি বিধান হল ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি। এ শাসন ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগ অর্থাৎ শাসন, আইন ও বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়। অপরদিকে একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। ফলে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ভারসাম্যের সুফল পাওয়া যায়।

৩. জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় উপযোগী

জরুরি অবস্থা কিংবা সংকট মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিশেষভাবে উপযোগী। এ ব্যবস্থায় যে কোন সংকটময় মুহূর্তে এবং জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ না করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফলে যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা ও অন্য কোন সংকটকালে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার দক্ষতার পরিচয় দেয়।

৪. দলীয় প্রভাবমুক্ত

এ ধরনের সরকার দলীয় প্রভাবমুক্ত। আইন পাশের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের ভোটাভুটি সরকারের স্থায়ীত্বের উপর প্রভাব ফেলে না ফলে এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় দলীয় মনোভাব কম প্রদর্শিত হয়। আইনসভায় রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ের উপর রাষ্ট্রপতির স্থায়ীত্ব নির্ভর করে না। তাই রাজনৈতিক দল সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

৫. দক্ষ শাসন ব্যবস্থা

এতে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ নন। তাই তাদেরকে আইন প্রণয়ন নিয়ে বেশি চিন্তা করতে হয় না। অর্থাৎ এ শাসন ব্যবস্থায় আইন বাস্তবায়ন সহজ হয় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতা পায়।

৬. দ্রুত উন্নয়ন

এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক স্থিতিশীলতাও বজায় থাকে। এর ফলে দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের ত্রুটিসমূহ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বর্তমানে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু এ সরকারের অনমনীয় প্রকৃতি, দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান, রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাচারী মনোভাব সমালোচনায় সম্মুখীন হয়। তাছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কের টানাপোড়েন ও জবাবদিহিতার অভাব দেখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি কোন্ ধরণের সরকার বেশি কার্যকর বলে মনে করেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে দুই ভাগে করা হয়েছে। একটি হল সংসদীয় সরকার ও অন্যটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার সকল কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট তথা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একই সাথে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি তাঁর কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। ফলে অনেক রাষ্ট্রে 'ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি' অনুসরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্‌টিতে সকল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে কুক্ষিগত থাকে?

ক) সংসদীয় সরকার খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গ) উভয়ই ঘ) কোনটিই নয়।

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় ------------- বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী নয়।

ক) শাসন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ গ) শাসন ও বিচার বিভাগ ঘ) সবগুলো।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনাব আবদুল্লাহ সাহেব পারফেক্ট গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাধারণ ব্যবস্থাপক। তিনি তার সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের নিকট ভীতির পাত্র। কারণ তিনি অনমনীয় প্রকৃতির। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত তিনি একাই নেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেন না। অপরদিকে রহমান সাহেব থার্মেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপক। তিনি যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অধ:স্তন কর্মকর্তাদের সাথে এবং শ্রমিকদের সাথে পরামর্শ করেন।
ক) সার্বভৌমত্ব কয় ধরণের ও কী কী?
খ) আবদুল্লাহ সাহেব সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত একাই নেন
গ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী কী? এ প্রেক্ষিতে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদের মমার্থ অনুযায়ী একনায়কতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তফাৎ বের করুন।

২। তপুর বড় ভাই তপুকে পড়াচ্ছিলেন- বাংলাদেশের সরকারকে বলা হয় সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার অপর পক্ষে আমেরিকা হল রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার। তপু জিজ্ঞাসা করল বাংলাদেশের সরকারকে কেন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলা হয় না। ভাই বললেন, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের যে সব বৈশিষ্ট্য থাকার কথা বাংলাদেশ সরকারের তা নেই। তিনি আরও বলেন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার একটি দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। তাই বাংলাদেশে এটিকে গ্রহণ করা হয়।
ক) "সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত" কিসের ভিত্তিতে এ ধরনের শ্রেণীকরণ করা হয়?
খ) সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?
গ) "বাংলাদেশের সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির নয়"- প্রমাণ করুন।
ঘ) বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কেন?

৩। শিক্ষক ক্লাসে এসে বললেন, "আজ আমরা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পর্কে জানবো। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ ধরনের রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। স্যার আরও বললেন এ ধরনের সরকার ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। সবশেষে তিনি বললেন যে, যদিও বাংলাদেশ জনকল্যাণমূলক কাজ করছে, এটি পুরোপুরি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হতে পারেনি। একজন ছাত্র প্রশ্ন করলো স্যার কেন হতে পারে নি?
ক) কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কি?
খ) কয়েকটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ দিন।
গ) আলোচ্য উদ্দিপকে বর্ণিত রাষ্ট্রটির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
ঘ) উদ্দিপকে বর্ণিত ছাত্রটির প্রশ্নের উত্তর দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩ : ১। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯ : ১। খ ২। ক

সংবিধান
(Constitution)

ইউনিট ৫

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সর্বোচ্চ কিছু বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এগুলি লিখিত ও অলিখিত হতে পারে। এসব বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর সমষ্টিকে সংবিধান বলে। সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্রের আয়নাস্বরূপ। আয়নার মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের নিজেদের চেহারা দেখতে পাই তেমনি সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ভেসে ওঠে। সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের ক্ষমতা এবং নাগরিক ও শাসকের সম্পর্ক কিরূপ হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কাজেই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সংবিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ ইউনিটে সংবিধানের অর্থ ও প্রকৃতি, শ্রেণিবিভাগ, সংবিধানের ভাল-মন্দ নানাদিক সংবিধান তৈরির পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে জানা যাবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৫.১ সংবিধানের ধারণা (Concept of Constitution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংবিধান কী বলতে পারবেন।
- সংবিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা জানতে পারবেন।
- সংবিধান ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্র পরিচালনা, নিয়মকানুন, ক্ষমতা বন্টন, কর্ম বিভাজন, শাসনতন্ত্র, জনকল্যাণ

মানব কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত সর্বোত্তম ব্যবস্থা হল রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তন ও জনসংখ্যায় বৃহৎ। যা পরিচালনা অত্যন্ত জটিল। তাই এটি বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের সাহায্যে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রে একটি শাসকগোষ্ঠী থাকে যা সরকার নামে পরিচিত। সাধারণত সরকার বলতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে বোঝায়। সরকারের এ বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কিভাবে হবে, কিভাবে সরকারি কাজ পরিচালিত হবে এবং রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিসমূহের সাথে সরকারের সম্পর্ক কী হবে প্রভৃতি বিষয়ে কতগুলো কলা-কানুন থাকে। আর এসব কলা কানুনই হলো সংবিধান।

সংবিধানের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Constitution)

ইংরেজি প্রতিশব্দ Constitution. যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এ্যারিস্টটল বলেন, সংবিধান হল এমন এক জীবন পদ্ধতি, যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ক্ষমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও

সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে- এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। সংবিধানকে তাই রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি বলা হয়।

লর্ড ব্রাইস বলেন, "শাসনতন্ত্র হল এমন কতগুলো আইন বা প্রথার সমষ্টি যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয়"

কে. সি. হোয়ার বলেন, "কোন দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়ম-কানুনকে বোঝাবার জন্য সংবিধান শব্দটি ব্যবহৃত হয়।"

সংবিধান অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাই সংবিধানকে এড়িয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা সরকারের থাকে না।

সংবিধান ও রাষ্ট্র (Constitution and State)

প্রকৃত অর্থে সংবিধান হল লিখিত বা অলিখিত কতগুলো আইনের সমষ্টি যা রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের ধরণ নির্দেশ করে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মাঝে ক্ষমতা নির্ধারণ করে এবং শাসক শাসিতের মাঝে সম্পর্ক নির্দেশ করে। একটি রাষ্ট্রের সংবিধানই ঐ রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রকাশ করে। যেমন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংবিধানে সকল ক্ষমতা জনগণের নিকট থাকে এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। অন্যদিকে স্বৈরাচারী বা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে জনগণের কল্যাণের চেয়ে তাদেরকে কিভাবে দমিয়ে রাখা যায়, ক্ষমতায় অংশ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করাসহ মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করার মত বিধি-বিধান সংবিধানে যুক্ত করে। এ ধরনের জনবিরোধী সংবিধান ও স্বৈরাচারী শাসক দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	সংবিধান ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিজের ভাষায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মৌলিক নিয়ম-কানুনসমূহ হল সংবিধান। সংবিধান রাষ্ট্রের আয়নাস্বরূপ। সংবিধান নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, শাসকের ক্ষমতা এবং নাগরিক ও শাসকের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করে। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি বলা হয়। সংবিধান থেকে সরকার পরিচালনার সকল ক্ষমতা উৎসারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। "শাসনতন্ত্র হল এমন কতগুলো আইন বা প্রথার সমষ্টি যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয়"- সংবিধানের এই সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

ক) কে সি হোয়ার খ) লর্ড ব্রাইস গ) রামসে মুর ঘ) কাল মার্কস

২। সংবিধান হল –

(i) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন
(ii) রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ
(iii) রাষ্ট্রের জীবন-প্রণালি

কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) সব ক'টি

পাঠ-৫.২ সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Constitution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংবিধান শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি জানতে পারবেন।
- সংবিধানের সার্বিক শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দলিল, প্রথা, রীতি-নীতি, পরিবর্তনশীল, কার্যকরি

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও জনগণের পছন্দ অনুযায়ী সংবিধানে বিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান যুক্ত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে আইনের সমষ্টিগত রূপ। এই আইন বা ধারাগুলো কাগজে (দলিলে) একত্রে লিপিবদ্ধ থাকতে পারে বা দীর্ঘদিনের প্রচলিত বিষয়ও হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা পরিবর্তন করা সহজ বা কঠিন হতে পারে। সে হিসেবে সংবিধান বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । সংবিধানকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায় যেমন:

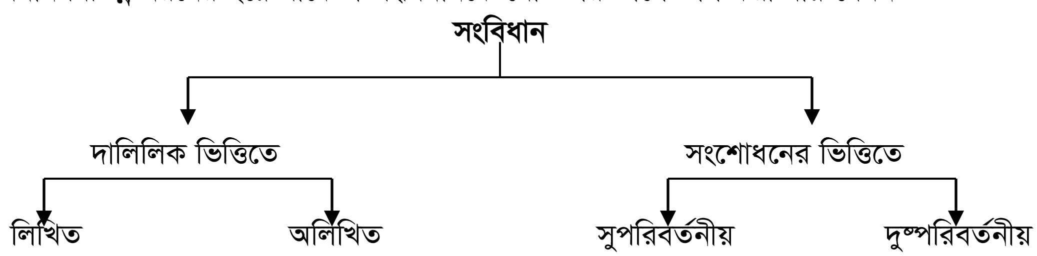

সংবিধান কাগজ বা দলিলে লিপিবদ্ধ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

১। **দালিলিক ভিত্তিতে সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ :** দালিলিক ভিত্তিতে সংবিধানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ক। লিখিত সংবিধান (Written Constitution) ও খ। অলিখিত সংবিধান (Unwritten Constitution)।

লিখিত সংবিধান : লিখিত সংবিধানের ধারা-উপধারা ও নিয়মকানুনগুলো নির্দিষ্টভাবে দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। তার মানে এই নয় যে, লিখিত সংবিধানে সব বিষয় লিখা থাকে। কিছু অলিখিত উপাদানও থাকতে পারে।

অলিখিত সংবিধান : অলিখিত সংবিধানের নিয়মকানুন কোন দলিলে বা কাগজে লিপিবদ্ধ নয়। প্রথা ও রীতিনীতি, সমাজের মানুষের আচার-আচরণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে অলিখিত সংবিধান তৈরি হয়। যেমন ব্রিটিশ সংবিধান একটি অলিখিত সংবিধান।

২। **সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান:** সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন নীতির উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার হয়ে থাকে: সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান : এ সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কোন ধরনের জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ ছাড়াই এই সংবিধানের কোন নিয়ম বা ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। তবে আইনসভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হয়। ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।

দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান: যে সংবিধানের কোন নিয়ম বা ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না তাই দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান। এটি সংশোধনের জন্য জটিল পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

লিখিত সংবিধানের ভাল দিক

লিখিত সংবিধানের বেশ কিছু ভাল দিক বা গুণ রয়েছে, যা এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হল-

১। সুস্পষ্ট : লিখিত সংবিধান সাধারণত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। কারণ এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা সুস্পষ্টভাবে এক বা একাধিক দলিলে লেখা থাকে। তাই সংবিধান বলবৎ করতে কোন সন্দেহ থাকে না।

২। স্থিতিশীল : লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। এ জন্য অনেক সময় জটিল প্রক্রিয়া ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন পড়ে। ফলে শাসক তাঁর ইচ্ছামত এটি পরিবর্তন করতে পারে না। তাই লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় বেশি উপযোগী : যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় লিখিত সংবিধান বেশি কার্যকরি। যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চল ও ক্ষমতা নানাভাবে ভাগ করতে হয়। লিপিবদ্ধ হলে সকল প্রদেশ, বিভাগ, শ্রেণি গোষ্ঠীর জনগণ তা মেনে চলতে বাধ্য হয়। ফলে রাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য অটুট থাকে।

৪। জনমতের প্রতিফলন: লিখিত সংবিধান জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত হয়। ফলে এখানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে।

বিভিন্ন কারণে লিখিত সংবিধানই উত্তম। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত। কিন্তু এ সংবিধানের সংশোধনীর জটিল পদ্ধতি, জরুরি প্রয়োজনে অনুপযোগী হওয়ার মতো কিছু কিছু সমস্যাও রয়েছে।

অলিখিত সংবিধানের ভাল দিক

অলিখিত সংবিধানের কিছু ভাল দিক রয়েছে যা নিচে আলোচনা করা হল:

১। প্রগতিশীল: অলিখিত সংবিধান সমাজের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে চলতে পারে। অর্থাৎ এটি সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। সুতরাং অলিখিত সংবিধান অগ্রগতির সহায়ক।

২। বিপ্লবের ঝুঁকি কম : অলিখিত সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে বিধায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে।

৩। জরুরি প্রয়োজনে সহায়ক : অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়। তাই জরুরি প্রয়োজন মিটাতে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

অলিখিত সংবিধানের ভাল দিক থাকলেও ঘন ঘন পরিবর্তনের সুযোগ থাকায় সরকার ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ধারা বা নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ না থাকায় প্রায়শই অস্পষ্টতা, অনিশ্চিতয়তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। বৃহৎ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অলিখিত সংবিধান আরও জটিলতা সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র পরিচালনার হাতিয়ার হল সংবিধান। সংবিধানকে মোটা দাগে চার ভাগে ভাগ করা যায় লেখার ভিত্তিতে দুই ধরনের যথা-লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান। আবার সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই রকমের যথা- সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয়। প্রত্যেক প্রকারের সংবিধানেরই কিছু সুনির্দিষ্ট সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

(১) সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান কয় ধরনের?

(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার

(২) নিচের কোন্টি লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নয়?

(ক) সুস্পষ্ট (খ) স্থিতিশীল (গ) অসম্পূর্ণ (ঘ) একটিও নয়

পাঠ-৫.৩ উত্তম সংবিধান (Ideal Constitution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উত্তম সংবিধান কাকে বলে বলতে পারবেন।
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	লিখিত, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, মৌলিক অধিকার, সংশোধন পদ্ধতি

কোন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের সংবিধানের উপর। জনগণ যে ধরনের সংবিধানে স্বাচছন্দ্যবোধ করে তাই সে রাষ্ট্রের উত্তম সংবিধান। যে রাষ্ট্রের সংবিধান যত বেশি ভাল বা উত্তম সে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও তত বেশি উত্তমভাবে পরিচালিত হয়।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

উত্তম সংবিধানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

১। **লিখিত :** উত্তম সংবিধান লিখিত হবে। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা কোন কাগজ বা দলিলে লেখা থাকবে। ফলে এতে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না।

২। **সুস্পষ্ট :** উত্তম সংবিধানের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হয়। এ সংবিধানের প্রত্যেকটি ধারা-উপধারা মাতৃভাষায় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কোন একটি ধারা সহজবোধ্য করার জন্য প্রয়োজনে উপধারা যুক্ত করা হয়।

৩। **সংক্ষিপ্ত :** এ সংবিধানে কোন অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ও কোন ব্যাখ্যা থাকে না। কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার মূল বিষয়ে দিক-নির্দেশনা থাকে। সংবিধানের উপর ভিত্তি করে তাই নানাবিধ আইন ও নীতিমালা তৈরি হয়।

৪। **মৌলিক অধিকার:** মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি উত্তম সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সংবিধানে মানবাধিকারের সাথে সমন্বয় করে সকল প্রকার মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকে এবং তা নিশ্চিতকরণে বাধ্যবাধকতা থাকে।

৫। **ভারসাম্য রক্ষা :** উত্তম সংবিধান ভারসাম্যপূর্ণ। এটি খুব সুপরিবর্তনীয় কিংবা খুব বেশি দুস্পরিবর্তনীয় হবে না। এর ফলে উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়।

৬। **স্পষ্ট সংশোধন পদ্ধতি:** একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তম সংবিধানের কোনো ধারার সংশোধন বা পরিবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ এ সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। সংবিধানের কোনো অংশ কীভাবে সংশোধন করা হবে তা উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

৭। **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি:** রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে মতাদর্শ বা মুলনীতি কি হবে তা সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এ গুলোর ভিত্তিতে রাষ্ট্র যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে। যেমন- বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি যথাঃ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

শিক্ষার্থীর কাজ	উত্তম সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের শাসন প্রকৃতির ধরণ নির্ভর করে তার সংবিধানের উপর। সংবিধান যত বেশি উত্তম হবে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও তত বেশি উন্নত হবে। উত্তম সংবিধানের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এটি সাধারণত লিপিবদ্ধ, সুস্পষ্ট দুষ্পরিবর্তনীয়, সংক্ষিপ্ত, মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়। যা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

বহুনির্বচানী অভীক্ষা

১। উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য-
(i) লিখিত
(ii) সংক্ষিপ্ত
(iii) মৌলিক অধিকারের উল্লেখ
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i + ii (খ) i + iii (গ) i + ii + iii

২। উত্তম সংবিধানের ভাষা --- হয়।
ক) প্রাঞ্জল খ) দুর্বোর্ধ্য গ) সাধু ঘ) বিদেশী

পাঠ-৫.৪ সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি (Methods of Constitution Making)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোন পদ্ধতিটি বেশি কার্যকর তা নির্ণয় করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কৌশল, অনুমোদন, আলাপ-আলোচনা, বিপ্লব, বিবর্তন, গণ-পরিষদ, প্রথা, রীতি-নীতি

সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার হাতিয়ার স্বরূপ। তাই সংবিধান প্রণয়নে সর্বোচ্চ জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। সংবিধান তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিচে আলোচনা করা হল-

১। **অনুমোদনের দ্বারা: এটি স**ংবিধান প্রণয়নের প্রাচীনতম পদ্ধতি। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সময় রাজা বা রানী তাঁদের ইচ্ছে মত রাজ্য শাসন করত। তাঁরা জনগণের অধিকারের কথা বিবেচনা করত না। অধিকন্তু জনগণ বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হত। ফলে সাধারণ জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে রাজা বা রানীর উপর তাদের অধিকারের বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করত। তখন রাজা বা রানী বিভিন্ন ধরনের অধিকার মঞ্জুর বা অনুমোদন করতেন। এগুলো মূলত কোন চুক্তিপত্র বা দলিল। যার মাধ্যমে রাজা বা রানী তাঁদের ভবিষ্যত শাসন পরিকল্পনা ও জনগণ (প্রজা) এর সাথে সম্পর্কের বিষয়টি পুর্নমূল্যায়ন করতেন। ১৬২৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ১ম চার্লস বাধ্য হয়ে অধিকারের সনদ অনুমোদন করেন। বর্তমানে অধিকারের এই সনদ ব্রিটিশ সংবিধানের অপরিহার্য অংশ।

২। **আলাপ-আলোচনার দ্বারা :** স্বাধীনতা লাভের পর নতুন দেশে সরকার ও জনগণ পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রয়োজন হয়। সংবিধান প্রণয়নে দ্রুত আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। এটি দু'ভাবে হতে পারে–

(১) গণ-পরিষদের মাধ্যমে এবং

(২) আইন পরিষদের মাধ্যমে।

আর এ সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হয়ে থাকে। যেমনঃ ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়। এটিই বর্তমানে সমাদৃত সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি।

৩। **বিপ্লবের দ্বারা :** ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জনগণ স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নতুন শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতা প্রদান করে। নতুন এ শাসক গোষ্ঠী সাধারণ জনগণের মতামত নিয়ে সংবিধান তৈরি করে। এ পদ্ধতিতে প্রণীত সংবিধান সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়।

৪। **ক্রমবিবর্তনের দ্বারা :** সংবিধান কোন দেশের প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। এখানে কোন লিখিত সংবিধানও থাকে না। বিভিন্ন সময়ে কিছু এ্যাক্ট বা আইন পাশ হয়ে থাকে। এভাবে গড়ে ওঠা শাসনতন্ত্রকে অলিখিত শাসনতন্ত্রও বলা হয়। যেমন- ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন

করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। **১২১৫** সালের ম্যাগনাকার্টা থেকে শুরু করে **১৯৪৯** সালের পার্লামেন্ট সংস্কার আইন এর সবগুলোই ব্রিটিশ সংবিধানের অংশ। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধানের আধুনিকীকরণ ও জনবান্ধবও হয়ে ওঠে। যেমনটি হয়েছে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে। বর্তমানে ফ্রান্সে পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান কার্যকর রয়েছে।

সবশেষে বলা যায় সংবিধান বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রণীত হতে পারে। তবে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব প্রক্রিয়া কার্যকর সম্ভব নয়। কেবল সংবিধান নয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সম্মতি ছাড়া কোন নীতি ও আইন প্রণয়ন অসম্ভব। ফলে আধুনিককালে অধিকাংশ সংবিধানই আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়। গণপরিষদ অথবা আইন পরিষদের সদস্যগণ দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সংবিধান প্রণয়নের কোন্ পদ্ধতি উত্তম ? তার কয়েকটি কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

সংবিধান হল রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধান প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে চারটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যথা- অনুমোদনের দ্বারা যেমন ম্যাগনাকার্টা, আলাপ আলোচনার দ্বারা যেমন বাংলাদেশের সংবিধান, বিপ্লবের দ্বারা যেমন ফ্রান্সের সংবিধান এবং ক্রমবিবর্তনের দ্বারা সংবিধান যেমন- ব্রিটিশ সংবিধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

বহুনির্বচনী অভীক্ষা

১। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে সংবিধান নিম্নলিখিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়−

(i) অনুমোদন
(ii) সুপরিকল্পিত আলোচনা
(iii) বিপ্লব

নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i + ii (খ) i + iii (গ) i + ii + iii

২। বিপ্লবের মাধ্যমে নিচের কোন্ দেশের সংবিধান তৈরি হয় নি?
ক) ফ্রান্স খ) রাশিয়া গ) গ্রেট ব্রিটেন ঘ) চীন

পাঠ-৫.৫ বাংলাদেশের সংবিধান (The Bangladesh Constitution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংবিধানের স্বরূপ বুঝতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	খসড়া, গণপরিষদ, গ্রহণ, আদর্শ, মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, দুষ্পরিবর্তনীয়, জনসম্পদ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রয়োজন হয়। সংবিধান তৈরির জন্য ১৯৭২ সালে ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ খসড়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান তৈরি করে এবং তা গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। ১৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয়। গণপরিষদে সদস্যগণ পক্ষে-বিপক্ষে মত দেন অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে একটি আর্দশ সংবিধান প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সংবিধানের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বা দিক রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল-

১। **লিখিত সংবিধান :** বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাসমূহ একটি দলিলে লেখা রয়েছে। এতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ১১টি ভাগ রয়েছে। এর একটি প্রস্তাবনাসহ চারটি তফসিল রয়েছে।

২। **দুষ্পরিবর্তনীয় :** এ সংবিধানের কোন ধারা পরিবর্তন করার জন্য এক জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

৩। **মৌলিক অধিকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নাগরিকগণ কী কী অধিকার ভোগ করতে পারবে তা সংবিধানে উল্লেখ থাকায় এগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- জীবন ধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।

৪। **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি:** সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি রয়েছে যেমন- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার এসব মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৫। **প্রজাতন্ত্র :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এখানে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৬। **সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ এ সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকলেও জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাই শাসন কার্য পরিচালনা করে।

৭। **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রকে অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশে ভাগ করার সুযোগ নেই। তবে প্রশাসনিক সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট রয়েছে। যার সবগুলোই কেন্দ্রিয় প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৮। **এক কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা :** বাংলাদেশের আইন সভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এর নাম জাতীয় সংসদ। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর। বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

৯। **সংবিধানের প্রাধান্য :** বাংলাদেশের সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে।

১০। **আইনের শাসন :** বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের শাসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানে বলা আছে যে আইনের চোখে সকলেই সমান ও সমান নিরাপত্তার অধিকারী।

১১। **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** বাংলাদেশের সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে অন্যান্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করবে।

১২। **সর্বজনীন ভোটাধিকার :** বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ জাতি ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়সের এ দেশের সকল নাগরিক নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ (Amendments)

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী কখনও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আবার কখনও জনগণের প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১৭টি সংশোধনী রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭টি সংশোধনীর প্রধান প্রধান দিক নিম্নে বর্ণিত হল-

সংশোধনী	সময়	সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু
প্রথম সংশোধনী	জুলাই, ১৯৭৩	• ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা।
দ্বিতীয় সংশোধনী	সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	• জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান করা হয় এবং বিনা বিচারে আটকের ক্ষমতা আনয়ন করা।
তৃতীয় সংশোধনী	১৯৭৪	• বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে সম্পাদিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির বৈধতা নিশ্চিত করা।
চতুর্থ সংশোধনী	জানুয়ারি, ১৯৭৫	• সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা আনয়ন করা। রাষ্ট্রপতি ও সংসদের মেয়াদও বৃদ্ধি করা হয়। • উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল প্রবর্তন করা হয়।
পঞ্চম সংশোধনী	এপ্রিল, ১৯৭৯	• ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে সকল সামরিক কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়া এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতির পরিবর্তন সাধন করা। এই সংশোধনীতে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' যুক্ত করা হয়।
ষষ্ঠ সংশোধনী	১৯৮১ সন	• নির্বাচনে বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য উপরাষ্ট্রপতির পদকে অলাভজনক ঘোষণা করা।
সপ্তম সংশোধনী	নভেম্বর, ১৯৮৬	• ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসক এরশাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়া হয়।
অষ্টম সংশোধনী	জুন, ১৯৮৮	• ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের

		ছয়টি বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
নবম সংশোধনী	জুলাই, ১৯৮৯	• প্রত্যক্ষ ভোটে উপ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান করা হয়। • রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল অনধিক দুই মেয়াদের (টার্মের) করা হয়।
দশম সংশোধনী	জুন, ১৯৯০	• জাতীয় সংসদে ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১৫ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় আরও ১০ বছর বাড়ানো হয়।
একাদশ সংশোধনী	আগস্ট, ১৯৯১	• অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন বৈধ করা হয়।
দ্বাদশ সংশোধনী	আগস্ট, ১৯৯	• উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা ও সংসদীয় ব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠা করা হয়।
ত্রয়োদশ সংশোধনী	মার্চ, ১৯৯৬	• সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়।
চতুর্দশ সংশোধনী	মে, ২০০৪	• মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীত করা হয়। • সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণের জন্য আইন করা হয়।
পঞ্চদশ সংশোধনী	জুলাই, ২০১১	• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। • ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পুনঃস্থাপন করা হয় এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫০ এ উন্নীত করা হয়।
ষোড়শ সংশোধনী	সেপ্টেম্বর, ২০১৪	• বাহাত্তরের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুন:স্থাপন করে এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিগণের অপসারণনের ক্ষমতা সংসদ সদস্যের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
সপ্তদশ সংশোধনী	জুলাই, ২০১৮	• সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী গৃহীত হয় ২০১৮ সালের ৮ জুলাই। এ সংশোধনীতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ আরও ২৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ বাংলাদেশের সংবিধান কী আদর্শ সংবিধান বলা যায়? উত্তরের পক্ষে যুক্ত দিন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার পর খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করতে সক্ষম হয়। গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর এটি গ্রহণ করে এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। এ পর্যন্ত ষোল বার বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশের সংবিধান কত সালে গৃহীত হয়?

(ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (খ) ৪ নভেম্বর ১৯৭২ (গ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭২ (ঘ) ৪ নভেম্বর ১৯৭১

২। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয় –

(i) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ (ii) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন

(iii) নারী সংরক্ষিত আসন ৪৫-এ উন্নীতকরণ

(iv) উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) ii + iv (খ) i + iii (গ) iii + iv (ঘ) কোনটিই নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংবিধান হল রাষ্ট্রের আয়নাস্বরূপ। সংবিধান কোনো প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠতে পারে। ব্রিটেনে সাংবিধানিক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। ব্রিটেনের সংবিধান লিখিত নয়। রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ মনে করেন "ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে ওঠেছে।"

ক) সংবিধান কি?
খ) "সংবিধান হলো রাষ্ট্রের আয়নাস্বরূপ"- ব্যাখ্যা করুন।
গ) উদ্দিপকে বর্ণিত দেশটির সংবিধান কোন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে?
ঘ) উদ্দিপকের সর্বশেষ লাইনটি ব্যাখ্যা করুন।

২। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। গণপরিষদ ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধান গ্রহণ করে এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি। এ পর্যন্ত সতের বার বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি সংশোধনী কেবল ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং ক্ষমতা থেকে নিরাপদে প্রস্থান করার জন্য করা হয়েছে। যদিও সংশোধনী জনকল্যাণের জন্যই করা উচিত।

ক) বাংলাদেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে?
খ) 'বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান' আলোচনা করুন।
গ) উদ্দিপকে উল্লেখিত মুলনীতিগুলো কি?
ঘ) বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী জনকল্যাণে করা হয় নি এমন কয়েকটি সংশোধনী বিষয়বস্তুসহ উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫ : ১। ক ২। ক

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা
(The Government of Bangladesh)

ইউনিট ৬

রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 'সরকার'। বিশ্বের সব দেশেই কোনো না কোনো সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। একটি দেশের শাসনব্যবস্থা মূলত সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বোঝা যায়। সকল দেশে সরকার থাকলেও তা এক রকম নয়। নির্বাহী প্রধানের প্রকৃতির উপরই সরকারের প্রকৃতি নির্ভর করে। সাধারণত নির্বাহী প্রধান যদি রাষ্ট্রপতি হয় তবে তা রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার আর নির্বাহী প্রধান প্রধানমন্ত্রী হলে তা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। সরকার গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারি, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে পারে। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৬.১ বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ
(Nature of the Government of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে পারবেন।
- সরকারের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাহী প্রধানের গুরুত্ব নিরুপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অস্থায়ী সরকার, অস্থায়ী সরকার আদেশ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত, মূলনীতি, এককেন্দ্রিক, রাষ্ট্র প্রধান, নির্বাচন

প্রতিটি দেশের সরকারের মাধ্যমে সে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটে থাকে। দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চণা পেরিয়ে ১৯৭১ সালে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বীর বাঙালি এ দেশকে স্বাধীন করে। যার একটিই লক্ষ্য ছিল বাঙালির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রথম মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়। তাঁরা ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। এই সরকার দক্ষতার সহিত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটায়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশের দ্বারা রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সে অনুযায়ী ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এ মন্ত্রিসভা ১৯৭৩ সালের ১৬ মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বাঙালিদের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্বল্পতম সময়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সংবিধানে জনগণকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে বলা হয় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এই চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়। সঙ্গত কারণেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বেছে নেয়া হয়েছে। আয়তনে

ছোট একটি দেশ। সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ভৌগোলিক ঐক্যও নিবিড়। তাই শাসন কাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এর কোন প্রদেশ নাই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধরণ অনুযায়ী সরকারের কার্যাবলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

শাসন বিভাগের কেন্দ্রে রয়েছে মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet)। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান ও মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তিনি তাঁর কাজের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। সরকারের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল আইন বিভাগ। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। তিনি সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯১ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল। এ ধরনের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বিশেষ করে জিয়াউর রহমান ও এরশাদ সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি পদটিকে বাংলাদেশে খুবই আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান সংসদের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়। কিন্তু ১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়। পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা কার্যকর হয়। ফলে রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু সরকার প্রধান নন। রাষ্ট্রপতির নামে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রজাতন্ত্রের সকল কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামেই পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের সংসদে ৩৫০টি আসন রয়েছে। যার ৩০০ টি আসনে সদস্যগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে আর অবশিষ্ট ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। রাষ্ট্রের বিবেক বলে খ্যাত হল বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ বিভিন্ন ধরনের আদালতের মাধ্যমে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে থাকে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান হল প্রধান বিচারপতি। সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানের ব্যাখ্যা কর্তাও বলা হয়। হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগ এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য অধস্তন আদালত নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। আইনের শাসন নিশ্চিত করা বিচার বিভাগের মূল দায়িত্ব।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য সংবিধান সংশোধনও করা হয়েছে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ জনগণের নিকট দায়বদ্ধ একটি সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হয়েছে। এ ব্যবস্থায় সরকার জনগণের নিকট দায়বদ্ধ কিন্তু এখনও জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ চ্যালেঞ্জপূর্ণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কী রূপ আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারই বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এটি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, বিচার ও আইন বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ রয়েছে। সরকার যাবতীয় কার্যাবলির জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। বাংলাদেশ একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের চেষ্টা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশের প্রথম সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের ছিল?

ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত খ) সংসদীয় গ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ঘ) একনায়কতন্ত্র

পাঠ-৬.২ শাসন বিভাগ (The Executive Branch)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শাসন বিভাগ কী বলতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের গঠন কাঠামো জানতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের কাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাহী বিভাগ, অরাজনৈতিক, কেন্দ্রিয় প্রশাসন, প্রশাসনিক, জনকল্যাণ, গুরুত্ব।

সরকারের সর্ববৃহৎ বিভাগ হল শাসন বিভাগ। যাকে নির্বাহী বিভাগও বলা হয়। শাসন বিভাগ আইন প্রয়োগ ও আইনের আলোকে রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জনগণকে সেবা প্রদানের মূল দায়িত্বে থাকে শাসন বিভাগ। শাসন বিভাগের দুটি অংশ থাকে। একটি রাজনৈতিক অংশ ও অন্যটি অরাজনৈতিক অংশ। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ। রাজনৈতিক অংশ অস্থায়ী। তাঁরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত এবং নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আমলাগণ শাসন বিভাগের অরাজনৈতিক অংশ, স্থায়ী ও বেতনভূক্ত।
শাসন বিভাগের ক্ষমতা বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত থাকে। যা কেন্দ্রিয় ও মাঠ প্রশাসন হিসেবে পরিচিত। কেন্দ্রে থাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। মাঠ প্রশাসনে জেলা-উপজেলা প্রশাসন সরকারি দায়িত্ব পালন করে।

শাসন বিভাগের কাজ

আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারের যে অংশটির সাথে প্রত্যেক দিন জনগণের সরাসরি সংযোগ ঘটে তা হল শাসন বিভাগ। শাসন বিভাগের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। নিম্নে শাসন বিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

১. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইন প্রয়োগ করে শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। এজন্য শাসন বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগ করতে পারে। জনগণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার জন্য শাসনের বিভাগের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা: দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসন বিভাগ বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা করে। তাছাড়া সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এসব চুক্তি যাচাই-বাছাই এর সার্বিক দায়িত্বে থাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কূটনৈতিক মিশন বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের সুবিধা-অসুবিধা দেখভাল করে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও শাসন বিভাগ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

৩. সার্বভৌমত্ব রক্ষা: রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণা শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৪. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ: আইন প্রণয়নের কাজটি আইন বিভাগই করে থাকে। কিন্তু কোন একটি বিল (আইনের খসড়া) আইনে রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত তার খসড়া প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে যাচাই-বাছাই, সম্ভাব্যতা নিরুপণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজটি করে থাকে শাসন বিভাগের কর্মচারীগণ। তাছাড়া জাতীয় সংসদের সদস্যগণ শাসন বিভাগে স্থায়ী না হওয়ায় অনেক বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানের অভাব থাকে। ফলে আমলাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। এ কারণেও শাসন বিভাগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. অর্থ সংক্রান্ত কাজ: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় তা ব্যয় করার গুরুদায়িত্ব শাসন বিভাগই পালন করে। আয়-ব্যয়ের বাজেট শাসন বিভাগের বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীগণ প্রণয়ন করে থাকে।

৬. জনকল্যাণমূলক কাজ: শাসন বিভাগ মূলত জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যই দিন দিন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে শাসন বিভাগ জনগণের কাছে থাকে। বর্তমানে রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হওয়ায় শাসন বিভাগের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিধি/পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, শাসন বিভাগ তার কাজের ধরণ ও পরিধির কারণেই অনেক বেশি ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয় হচ্ছে। সংসদীয় কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত যেকোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শাসন বিভাগের তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজ বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

শাসন বিভাগ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, প্রতিরক্ষা, অর্থ সংক্রান্ত কাজ থেকে শুরু করে সরকারের প্রয়োজনীয় সকল কাজই করে থাকে। শাসন বিভাগের বিস্তৃত কর্ম পরিধির কারণে এটি বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত 'রুলস অব বিজনেস' অনুযায়ী শাসন বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারের সফলতা ও স্থায়িত্ব শাসন বিভাগের দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। শাসন বিভাগের কয়টি অংশ

ক) একটি খ) দু'টি গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

২। শাসন বিভাগের অংশ

i. উপজেলা প্রশাসন
ii. উপজেলা পরিষদ
iii. সচিবালয়

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. সবকটি

পাঠ-৬.৩ রাষ্ট্রপতি (The President)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্রপতির অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্পর্কে অবগত হবেন।
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রপ্রধান, নামমাত্র, অভিশংসন, কার্যবিধি, নিয়ুক্তি, পূর্বানুমতি, বিল

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে অবস্থান করেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি একটি অলংকারিক পদ মাত্র। কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানোমোদন প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য তাঁকে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। একই সাথে সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতাও থাকতে হবে। সংসদে অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ (Power and Function of the President)

১। নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা: সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান নয়। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এবং তার সাথে পরামর্শক্রমে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিয়োগ করেন। তাছাড়া সাংবিধানিক পদ (যেমন- নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিরীক্ষক, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ইত্যাদি) ও তিন বাহিনীর প্রধানগণকে নিয়োগ দেওয়া রাষ্ট্রপতির কাজ। সরকারের সকল প্রশাসনিক কাজ রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়।

২। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা: জাতীয় সংসদে কোন বিল পাস হলে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হয়। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ভেঙ্গে দিতে পারেন। তিনি সংসদে উপস্থিত না হয়েও বাণী দিতে পারেন। কেবল অর্থ বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন।

৩। আর্থিক ক্ষমতা: রাষ্ট্রপতি সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন (অনুচ্ছেদ-৮৫)। কোনো কারণে সংসদ কোন অর্থ মঞ্জুর করতে না পারলে রাষ্ট্রপতি ৬০ দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট তহবিল হতে সে অর্থ মঞ্জুর করতে পারে।

৪। রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলি বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ (Rules of Business) প্রণয়ন করেন।

৫। জরুরি অবস্থা ঘোষণা: রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার কোন অংশ যে কোন নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন তবে তিনি সর্বোচ্চ ১২০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমতি প্রয়োজন রয়েছে।

৬। অন্যান্য কাজ: রাষ্ট্রপতি অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন। যেমন রাষ্ট্রপতির পূর্বনানুমিত ছাড়া কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারে না। তিনি বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে থাকেন। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় খেতাব, সম্মাননা ও পদক প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশী কূটনীতিকদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় চুক্তি, দলিল তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সম্পাদিত হয়। তাছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতিগণের শপথ বাক্য পাঠ করান।

৭। ক্ষমা প্রদর্শন: রাষ্ট্রপতি কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা রাষ্ট্র প্রদত্ত যেকোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও মঞ্জুর করতে পারে। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে দেশের কোন আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের বা গ্রেফতার বা কারাবন্দির জন্য পরোয়ানা জারি করতে পারে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান হলেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রের সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামেই সম্পাদিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পাঁচটি কাজ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান হল রাষ্ট্রপতি। এটি একটি অলংকারিক পদ। কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিক কোন রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। তাছাড়া তিনি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা বর্ণিত রয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ?
ক) ১৮ অনুচ্ছেদে খ) ২৮ অনুচ্ছেদে গ) ৮৫ অনুচ্ছেদে ঘ) ৪৮ অনুচ্ছেদে

২। 'ক' একটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান। তাঁর নামে রাষ্ট্রের সকল কার্য সম্পাদন হয়। তিনি রাষ্ট্রের আইন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া সরকার প্রধানও তিনি নিয়োগ করে থাকেন।

উদ্দীপকটিতে 'ক' কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান?

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) ফ্রান্স খ. মালদ্বীপ গ. বাংলাদেশে ঘ. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পাঠ-৬.৪ প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা ও নিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজ কি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাহী প্রধান, সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংসদীয় সরকার, মেয়াদ, প্রজাতন্ত্র, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদ নেতা

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময় নির্বাহী প্রধান পদের পরিবর্তন হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের সময় সরকার প্রধান ছিল রাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতা অর্জনের পরেই ১৯৭২ সালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারী আবার রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৯১ সালে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে যারা সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। সংসদীয় সরকারের রেওয়াজ অনুযায়ী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর পছন্দ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনের পর এ পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতভাবেই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ ৫ বছর।

প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা ও নিয়োগ

বাংলাদেশ সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ট দলের প্রধানই প্রধানমন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য পদের যোগ্যতা ও প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা একই। অর্থাৎ ২৫ বছর বয়স্ক যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক সংসদ সদস্য থাকা সাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ পেতে পারেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তবে অপ্রকৃতিস্থ, ফৌজদারি অপারাধি সাজাপ্রাপ্ত এবং ঋণখেলাপি কোন নাগরিক প্রধানমন্ত্রী হবার অযোগ্য বিবেচিত হন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্তম্ভ। তাঁর নেতৃত্বেই সরকার পরিচালিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলির পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। নিচে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

ক. সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

খ. প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার প্রধান। তিনি তাঁর প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্রি নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং দপ্তর বন্টন করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি মন্ত্রীদেও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় করেন।

গ. প্রধানমন্ত্রী যেকোন সময়ে যেকোন মন্ত্রীকে পদত্যাগের অনুরোধ করতে পারেন। এ অনুরোধ এক ধরনের নির্দেশের মত কাজ করে। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব থাকে না।

ঘ. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদ নেতা। সংসদ অধিবেশন আহবান, স্থগিত বা ভেঙ্গে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণীত হয়।

ঙ. আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পানে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

চ. বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে নিয়োগ রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার হলেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

ছ. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তিনি একটি দলের প্রধান হলেও প্রধানমন্ত্রী সকল নাগরিকের। জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থ রক্ষায় প্রধামন্ত্রী সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

জ. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বা প্রতি-স্বাক্ষরে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাছাড়া মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় মন্ত্রিগণ তাঁর নির্দেশনা ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

পরিশেষে বলা যায় মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যমনি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হল প্রধানমন্ত্রী। সংবিধানের অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সরকারের স্তম্ভ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ, আইন পরিষদ, শাসন বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর উপরই একটি দেশের উন্নতি নির্ভর করে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সরকারের পতন ঘটে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। সংসদের নেতা কে?

ক) স্পীকার খ) রাষ্ট্রপতি গ) চিপ হুইপ ঘ) প্রধানমন্ত্রী

২। প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন–

i. সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের

ii. নির্বাহী বিভাগের

iii. আইন বিভাগের

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. সবকটি

পাঠ-৬.৫ মন্ত্রিপরিষদ (The Cabinet)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মন্ত্রিপরিষদের গঠন জানতে পারবেন।
- মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্তম্ভ, নীতি-নির্ধারণ, খসড়া আইন, স্বীয় স্বাক্ষর, পরিকল্পনা

বাংলাদেশে বর্তমানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারও বলা হয়। কেননা মন্ত্রিপরিষদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী থাকে। শাসন বিভাগের স্তম্ভ হল মন্ত্রিপরিষদ। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় পরিচ্ছেদে মন্ত্রিপরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার কেন্দ্রে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়াও প্রয়োজনীয় সংখ্যক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পছন্দ ও প্রয়োজন-মাফিক সংসদ সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তবে জাতীয় সংসদ সদস্য নয় এমন ব্যক্তিকেও মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করা যায়। মন্ত্রিসভার মেয়াদ ৫ বছর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চাইলে মন্ত্রিসভা রদবদল ও পুনর্গঠন করতে পারেন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ চাইলে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারেন। তবে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভাও বিলুপ্ত হয়।

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজ

মন্ত্রিসভার হাতে যেহেতু শাসনবিভাগের চাবিকাঠি তাই মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি অনেকটা শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজের মতোই। নিম্নে মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজ আলোচনা করা হল:

ক. নীতি-নির্ধারণ: সরকারি নীতি নির্ধারণে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণ করে থাকে। জনকল্যাণে উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদেই নেয়া হয়। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলো বিজ্ঞ মন্ত্রীদের আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

খ. আইনের খসড়া তৈরি: জনগুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে প্রথমে তা মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা হয়। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে যৌক্তিক মনে হলে তা বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়। সে বিষয়ে সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা হয়।

গ. বাজেট তৈরি: শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি সেক্টরের জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। বাজেট প্রণয়নের সময় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রীদের নিকট তাঁদের মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রস্তাব আহবান করেন। মন্ত্রিপরিষদে অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী আয়-ব্যয়ের হিসাব করে থাকেন। যা সংসদে বাজেট আকারে উত্থাপন করা হয়।

ঘ. উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ: জনকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচি মন্ত্রিপরিষদই প্রণয়ন করে থাকে। যেমন পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা কর্মসূচি এ রকম ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি মন্ত্রিপরিষদ থেকেই নেওয়া হয়।

ঙ. মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয়: শাসন বিভাগকে একটি ইউনিট হিসেবে পরিচালনা করে মন্ত্রিপরিষদ। এখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতি-সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীবর্গও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তাঁদের বিজ্ঞ মতামত দিতে পারে। এখানে যে কোন মন্ত্রণালয়ের কোন বিষয়ে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

মন্ত্রিপরিষদ অনেকটা সরকারের ভেতর সরকার। আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে উন্নয়নমূলক কাজ সকল বিষয়ে মন্ত্রিসভা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। যা অনেক সময় সংসদে বহাল থাকে। এ ব্যবস্থায় দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। ফলে অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ খুব গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রিপরিষদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। তিনি প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠন, যোজন-বিয়োজন ও ভেঙ্গে দিতে পারেন। আইন প্রণয়ন, মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয়সহ সকল নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ থেকে নেয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে মন্ত্রিসভার মেয়াদ কত বছর?

ক) ৩ বছর খ) ৫ বছর গ) ৭ বছর ঘ) ৯ বছর

২। মন্ত্রিসভার কাজ হল–

i. আইন প্রণয়ন
ii. বাজেট প্রণয়ন
iii. নীতি-নির্ধারণ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬.৬ বাংলাদেশের আইনসভা (The Legisture of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের আইনসভা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আইনসভার গঠন প্রণালী বলতে পারবেন।
- আইনসভার পরিধি, ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কক্ষ, সরাসরি, নির্বাচন, সংরক্ষিত, স্পীকার, হুইপ, অধিবেশন, সংসদীয় কমিটি, বিল, ভোটদান

বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এক কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০। ৩০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অন্য ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। নারী সংসদ সদস্যগণ ৩০০ জন সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ রাজধানীতে অবস্থিত। সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ অধিবেশন আহবান করেন। অধিবেশন পরিচালনার জন্য স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করা হয়। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া সংসদ অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে সদস্যগণের মধ্য থেকে চীফ হুইপসহ কয়েকজন হুইপ মনোনয়ন করা হয়। দশম জাতীয় সংসদের প্রধান হলেন স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা (Qualification for Membership)

সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৫ বছর বয়স্ক বাংলাদেশী যেকোন নাগরিক সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা রাখে। তবে অপ্রকৃতিস্থ, দেউলিয়া, বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জন, কোন অপরাধে দুই বছরের জন্য সাজাপ্রাপ্ত নাগরিক সংসদ সদস্য হতে পারবে না।

সংসদের মেয়াদ ৫ বছর। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। অধিবেশন আরম্ভ করার জন্য ৬০ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হতে হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল সরকারি দলের এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসনে বিজয়ী দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। সংসদ সদস্যগণ অনেকে একইসাথে হুইপ, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

কোন সংসদ সদস্য নিজের ইচ্ছায় পদত্যাগ দাখিল করলে অথবা একাধারে ৯০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে। তাছাড়া তিনি যে দল থেকে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সেই দল থেকে পদত্যাগ করলে অথবা সংসদে সে দলের বিপক্ষে ভোট দান করলেও তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১. আইন প্রণয়ন বিষয়ক: জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা। সংসদ কোন বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন করতে পারেন। আইনের প্রস্তাব বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

২. সংবিধান সংশোধন: জাতীয় সংসদ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। সেজন্য সংসদের মোট দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়।

৩. শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ: প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। সংসদ কোন কারণে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির মাধমে জাতীয় সংসদ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

৪. অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা: জাতীয় সংসদের অনুমতি ছাড়া কোন কর বা খাজনা আরোপ ও সংগ্রহ করা যায় না। সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ বাজেট জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট উত্থাপনের পর তার উপর সংসদ সদস্যগণ আলোচনা, বির্তক ও সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব করেন। সে অনুযায়ী বাজেটটি সংসদে পাশ হয়।

৫. বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা: সংবিধানের ১৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ বিচারক অপসারণের ক্ষমতা পায়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদই সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। সংবিধান লঙ্ঘিত হলে সংসদ রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারে এবং অপসারণের ব্যবস্থা নিতে পারে।

৬. অন্যান্য কাজ: উপরে আলোচ্য কাজ ছাড়াও সংসদ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন এবং অধিবেশন না থাকলে সে সময়ে প্রণীত বিভিন্ন অধ্যাদেশ অনুমোদন বা বাতিলের কাজগুলো জাতীয় সংসদ করে থাকে।

মোটের উপর জনগণের প্রতিনিধি হল জাতীয় সংসদ সদস্যগণ। তাঁরা সংসদে স্ব-স্ব এলাকার সমস্যা-সুবিধা নিয়ে দাবি-দাওয়া তুলে ধরে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ সে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে। সংসদে আলোচনার মধ্য দিয়েই জনগণের নিকট দায়বদ্ধতার বহি:প্রকাশ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আইনসভার গঠন বর্ণনা করুন

সারসংক্ষেপ

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হল জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। তার মধ্যে ৩০০ জন সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্যেও মূল দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন করা। তাছাড়া তাঁরা তাদের নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। সংসদ সদস্যদের আলোচনা ও দাবির প্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এ পর্যন্ত দশবার জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কত বছরের সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য?

ক) ১ বছর খ) ২ বছর গ) ৩ বছর ঘ) ৪ বছর

২। রসুলপুর গ্রামের যোগ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ১৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। তারা মাসে একবার গ্রামের সমস্যা ও সুবিধা নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনার প্রেক্ষিতে গ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে। যেসব সমস্যা তাঁদের এখতিয়ারের বাইরে সেগুলো স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে।
আলোচ্য উদ্দীপকের গঠন কাঠামো নিচের কোন্ সংস্থাটির মত?

ক) বিশ্ববিদ্যালয় খ) আদালত গ) জাতীয় সংসদ ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ

পাঠ-৬.৭ বাংলাদেশের বিচার বিভাগ (The Judiciary of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিচার বিভাগের গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের কাঠামো চিত্রায়ন পেতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি জানতে পারবেন।
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিবেক, স্বাধীনতা, বিচারক, ট্রাইব্যুনাল, বিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, অধ্বস্তন, ফৌজদারী, দেওয়ানী

বিচার বিভাগ হল রাষ্ট্রের বিবেক। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ অপরিহার্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যা নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা যায়

বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কাঠামো
↓
সুপ্রীম কোর্ট
↓
আপিল বিভাগ
↓
হাইকোর্ট বিভাগ
↓
জেলা ও দায়রা জজ আদালত
↓
সাব জজ ও সহকারী জজ আদালত
↓
গ্রাম আদালত
ও
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

সুপ্রীম কোর্টের গঠন

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান হল প্রধান বিচারপতি। এ আদালতের দু'টি বিভাগ রয়েছে যথা- হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ। এ বিভাগগুলোতে বিচারকের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। প্রধান বিচারপতির পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশী কোন নাগরিক ১০ বছর এডভোকেট হিসেবে অভিজ্ঞতা থাকলে বা ১০ বছর বিচার বিভাগীয় কোন পদে চাকুরি করলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

হাইকোর্ট বিভাগ

প্রাথমিক মামলা গ্রহণের সর্বোচ্চ আদালত হল হাইকোর্ট। বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় শতাধিক বিচারপতি রয়েছে। সংবিধানে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে লিখিত নির্দেশনা রয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলি রয়েছেঃ

ক. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে কোন সরকারি কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারেন।

খ. প্রজাতন্ত্রের (সরকারের) কোন কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে বেআইনী কাজ বন্ধ করতে অথবা করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

গ. অধঃস্তন আদালতের কোন রায়ের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে আপিল করতে পারবেন।

ঘ. কোন ব্যক্তির আবেদন সত্ত্বেও যদি হাইকোর্ট মনে করে উন্নয়ন কাজ বা জনস্বার্থ বাধাগ্রস্থ হবে তবে কোন আদেশ দান না করার ক্ষমতা হাইকোর্টের রয়েছে।

ঙ. অধস্তন আদালত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আদেশ, নির্দেশ জারি করতে পারে হাইকোর্ট।

আপিল বিভাগ

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হল আপিল বিভাগ। হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের প্রেক্ষিতেই কেবল এখানে আপিল করা যায়। এ বিভাগের বিচারকের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই তবে এখানে হাইকোর্ট বিভাগের চেয়ে স্বল্প সংখ্যক বিচারক থাকে। নিচে আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

১. হাইকোট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানির ও তাহা নিস্পত্তির এখতিয়ার ও ক্ষমতা রয়েছে।
২. এ বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে।
৩. রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন মোতাবেক আপিল বিভাগ আইন বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করতে পারে।
৪. সম্পূর্ণ ন্যায় বিচারের স্বার্থে কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করা ও কাগজপত্র পেশ করার আদেশ দিতে পারে।

অধস্তন আদালত

সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধস্তন আদালত গঠন করা হয়েছে। জেলা ও দায়রা জজ আদালত, সাব জজ ও সহকারী জজ আদালত দেশের অধস্তন আদালত। রাষ্ট্রপতি অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ করে থাকেন। এছাড়াও গ্রাম পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম আদালত রয়েছে।

অধস্তন আদালতের কার্যাবলি

(১) ফৌজাদারী বিষয় অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি, হত্যা, সংঘর্ষ, ধর্ষণ, পারিবারিক কলহসহ জনজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক মামলা গ্রহণ ও বিচার করে থাকে।

(২) দেওয়ানী বিষয়ে যেমন জমি-জমা সংক্রান্ত, চুক্তি, অর্থ ঋণ সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার করা অধস্তন আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

গ্রাম আদালত

গ্রামীণ পর্যায়ে সংগঠিত বিভিন্ন অপরাধ ও জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয় নিস্পত্তির প্রাথমিক প্রচেষ্টা হল গ্রামীণ আদালত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ থেকে দুই করে মোট ৫ পাঁচ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠন করা হয়। এ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ জন দেশের যেকোন আদালতে মামলা করতে পারে।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

প্রজাতন্ত্রের (সরকারের) কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি, অর্থদন্ড বা অন্য দন্ডের বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিস্পত্তি করে থাকে। এ আদালতের এখতিয়ার রয়েছে এমন কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোন কার্যক্রম গ্রহণ বা রায় দিতে পারে না। সংবিধানের **১১৭** অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এর গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য পৃথিবীর উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও দক্ষ বিচার ব্যবস্থার কথা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। বিদ্যমান বিচার কাঠামো ছাড়াও জাতীয় সংসদ আইনের মাধ্যমে আরও এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন বা বিলোপ করতে পারে। বর্তমানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং দক্ষ ও বিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ করা বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের বিচার কাঠামো চিত্রায়িত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ রয়েছে। যার প্রধান হল প্রধান বিচারপতি। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ, অধস্তন আদালত যেমন জেলা ও দায়রা জজ আদালত, সাব জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। তাছাড়া প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও গ্রাম আদালতও বিচারকার্য করে থাকে। রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিয়োগ করেন। অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগের তদারকি করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশের বিচার কাঠামোর সর্বোচ্চ বিভাগ কোন্‌টি?

ক) জেলা জজ আদালত খ) প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল গ) হাইকোর্ট বিভাগ ঘ) আপিল বিভাগ

২। অধস্তন আদালতের মধ্যে রয়েছে ....।

i. জেলা জজ আদালত

ii. হাইকোর্ট

iii. নীতি-নির্ধারণ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ. i ও iii গ. i, ii ও iii ঘ. সবকটি

পাঠ-৬.৮ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো (Administrative Structure in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এককেন্দ্রিক, কেন্দ্রিয়, স্থানীয়, বিকেন্দ্রিকরণ, কার্যবিধি, অনুবিভাগ, অধিনামা, সচিবালয়

বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কেন্দ্র হতে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। তবে সরকারি সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোর জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক কাঠামোর কাজের প্রকৃতি দুই ধরণের। একটি হল নীতি-নির্ধারণী কাঠামো অন্যটি বাস্তবায়নধর্মী। যেমন-রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রণালয় নীতি-নির্ধারণী অংশ। জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন নীতি বাস্তবায়নের কাজ করে থাকে। তাই বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় দু'টি অংশ রয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকারের শাসন বিভাগের অধীন। সরকারের কার্যাবলি, সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকটা প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে।

প্রশাসনিক কাঠামো

- কেন্দ্রিয় প্রশাসন
  - কেন্দ্রিয় দপ্তর: রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ↓ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ↓ মন্ত্রণালয় ↓ বিভাগ ↓ অধিদপ্তর
  - কেন্দ্রিয় পদসোপান: রাষ্ট্রপতি ↓ প্রধানমন্ত্রী ↓ মন্ত্রী ↓ সিনিয়র সচিব ↓ সচিব ↓ অতিরিক্ত সচিব ↓ যুগ্ম সচিব ↓ উপসচিব ↓ সিনিয়র সহকারী সচিব ↓ সহকারী সচিব
- স্থানীয় প্রশাসন
  - স্থানীয় দপ্তর: বিভাগীয় প্রশাসন ↓ জেলা প্রশাসন ↓ উপজেলা প্রশাসন
  - স্থানীয় পদসোপান: বিভাগীয় কমিশনার (যুগ্ম সচিব) ↓ ডেপুটি কমিশনার (উপসচিব) ↓ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সিনি: সহ: সচিব) ↓ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সিনি: সহ: সচিব) ↓ সহকারী কমিশনার (সহকারী সচিব)

মন্ত্রণালয়

কেন্দ্রিয় প্রশাসনের প্রধান কার্যালয় মন্ত্রণালয়। এর প্রধান হল মন্ত্রী। জনগুরুত্বপূর্ণ এক বা একাধিক বিষয়ের কার্যক্রম একটি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকে। কার্যপ্রণালি বিধি (Rules of Business) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের কাজ ভাগ করা হয়। মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে থাকে। তাছাড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজ্যতা, হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। যেমন- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

বিভাগঃ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক বা একাধিক বিভাগ থাকে। যার প্রশাসনিক প্রধান হল সচিব/সিনিয়র সচিব। তিনি মন্ত্রণালয়ের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন। এই দপ্তরে বা ইউনিটে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন- সড়ক বিভাগ, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, জন নিরাপত্তা, সেবা বিভাগ ইত্যাদি।

অধিদপ্তরঃ বিভাগের অধীনে একাধিক অধিদপ্তর থাকে। অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হল মাঠ প্রশাসনের সাথে সরাসরি যুক্ত থেকে তা সমন্বয় করা। একজন অতিরিক্ত সচিব বা সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এ দপ্তরের প্রধান। যেমন- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ইত্যাদি।

অনুবিভাগঃ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে এক বা একাধিক অনুবিভাগ থাকে। এ অনুবিভাগের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব থাকে। অনুবিভাগের দায়িত্বে থাকেন একজন অতিরিক্ত সচিব। যেমন- বাজেট অনুবিভাগ

অধিশাখাঃ অনুবিভাগের অধীন একাধিক অধিশাখা থাকতে পারে। অধিশাখার প্রধান উপসচিব। সাধারণত মাঠ পর্যায়ে প্রযোজ্য বিভিন্ন বিষয়ের আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপন জারি করে থাকে। মন্ত্রণালয় বা বিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী অধিমালা নির্ধারণ করে।

শাখাঃ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীন অনেকগুলো শাখা থাকে। মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি অনুযায়ী শাখা নির্ধারণ করা হয়।

বিভাগীয় প্রশাসন

স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর হল বিভাগীয় প্রশাসন। বিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্বে থাকেন একজন বিভাগীয় কমিশনার। তিনি যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। গুরুত্ব ও কাজের পরিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাও এ পদে নিয়োজিত থাকতে পারে। বিভাগীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসনের কাজের তদারকি করে।

জেলা প্রশাসন

স্থানীয় প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন জেলার আইন-শৃঙ্খলা, জনসেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত সব ধরনের বিষয়ের তদারকি করে। তাছাড়া জেলা বিভিন্ন রাজস্ব ও খাজনা আদায় করে থাকে। সরকারি সম্পত্তির ইজারা প্রদান জেলা প্রশাসনের আওতাধীন। জেলা প্রশাসনের প্রধান উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

উপজেলা প্রশাসন

স্থানীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর কিন্তু সাধারণ মানুষের খুব নিকটবর্তী ইউনিট হল উপজেলা প্রশাসন। এ কার্যক্রমকে স্থানীয় সচিবালয় বলা যায়। কেননা একই স্থানে নানামুখী সেবা প্রদান করা হয়। পার্থক্য হল কেন্দ্রিয় সচিবালয় নীতি নির্ধারণ করে আর উপজেলা প্রশাসন সরাসরি সেগুলো বাস্তবায়ন করে। ১৯৮২ সালে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর উপজেলা প্রশাসনের কর্মকান্ডে আরও গতিশীলতা এসেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানীয় প্রশাসনের পদসোপান উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের একটি বিস্তৃত প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা প্রশাসন সবই প্রশাসনিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রত্যেকটি ইউনিটের নির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য পালনে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা রয়েছে। এই প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর সমন্বিত কাজের উপরই সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো কয় স্তর বিশিষ্ট?

ক) দুই খ) চার গ) পাঁচ ঘ) ছয়

২। কেন্দ্রিয় প্রশাসনের কর্মকর্তা হল ....।

i. সচিব ii. উপ-সচিব iii. সহকারি সচিব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। গত মাসে রহমান সাহেব একটি সেমিনারে সভাপতিত্ব করছিলেন। সেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাদের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ের বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাগণই নিজের বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপনের চেষ্টা করছিলেন। রহমান সাহেব বিভাগগুলোর মাঝে একটি বিভাজন লক্ষ্য করলেন। পরবর্তীতে রহমান তাঁর মূল্যবান বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে প্রত্যেকটি বিভাগই জনগণের সেবায় নিয়োজিত। সেখানে একটির চেয়ে অন্যটির শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ নেই। তাই সকলকে মিলে-মিশে কাজ করার এবং প্রত্যেকের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি থাকার পরামর্শ দেন।

ক. সাধরণত সরকারের কয়টি বিভাগ থাকে?

খ. সরকারের বিভাগগুলোর নাম লিখুন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম বিষয়টি কী এবং কেন ঘটে?

ঘ. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মাঝে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায়? ব্যাখ্যা করুন।

২। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে বললেন, তাদের উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাকে দুই বছর পূর্বে মন্ত্রণালয়ের একটি শাখার দায়িত্ব পালন করতে দেখেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, মন্ত্রণালয়ের একটি শাখার দায়িত্ব পালন করতে দেখেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হয়ে তিনি উপজেলার কাজ করছেন কেন? উত্তরে শিক্ষক বলল প্রশাসক দুটি পর্যায়ে কাজ করে। তাঁরা প্রশাসন বিভাগের অংশ। তাই যেকোন সময় স্থানীয় ও কেন্দ্রিয় উভয়ই প্রশাসনেই কাজ করতে পারেন।

ক. প্রশাসনের কয়টি পর্যায় থাকে?

খ. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্তরগুলো উল্লেখ করুন।

গ. উদ্দীপকে কোন প্রশাসনের কথা বলা হয়েছে? উক্ত প্রশাসনের কাঠামো কেমন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় প্রশাসনের পদসোপানের একটি তুলনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ : ১। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ : ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ : ১। ঘ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬ : ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭ : ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮ : ১। ক ২। ঘ

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন
(Political Party and Election in Democracy)

ইউনিট ৭

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের আবশ্যকীয় একটি প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন নীতি ও আদর্শ দ্বরা পরিচালিত হয়। এ দলগুলো জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং নীতি-নির্ধারণ করে জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার পরিচালনা করে থাকে। তবে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ও সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অত্যাবশ্যক। এ ধরনের নির্বাচন কেবল দক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দিয়েই সম্ভব নয়। সে জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল ও জনগণের ইচ্ছা অত্যন্ত জরুরি। এ ইউনিটে মূলত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নির্বাচন ও বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৭.১ রাজনৈতিক দল
(Political Party)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- কোন সংগঠন রাজনৈতিক দল আর কোনটি নয় তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নীতি-আর্দশ, কর্মসূচি, সাংবিধানিক, ইশতেহার, স্থানীয়-জাতীয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতি

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম। এটি মূলত এক দল জনসমষ্টি যারা নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শ এবং লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ। রাজনৈতিক দল মূলত জনগণের দাবি দাওয়া প্রকাশের প্লাটফর্ম। জাতি ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গ, শ্রেণি পেশা নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠী কোন রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা এবং নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশের মধ্য দিয়ে জনগণকে আকর্ষণ করা। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। তবে যে সব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই সে সব রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলও নেই। যেমন সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান, কাতার এ রাজতন্ত্র বিদ্যমান। তাই এসব দেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ। রাজপরিবার ও পরিষদই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাছাড়া সামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ থাকে। তবে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে রাজনৈতিক দল সৃষ্টির প্রবণতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হচ্ছে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

হ্যারল্ড লাসওয়েল এর মতানুসারে- "রাজনৈতিক দল হল এমন একটি সংগঠন যা নির্বাচনে কর্মসূচী স্থিও কওে এবং প্রার্থী দাঁড় করায়।"

অধ্যাপক এলান আর বল বলেন "যখন কোন জনসংগঠন এককভাবে বা অন্যান্য দলের সঙ্গে একযোগে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে এবং তা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে"।

অর্থাৎ রাজনৈতিক দল হল একটি সংগঠন যা কোন নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচির মাধমে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে এবং সরকার গঠন করতে পারে। যেমন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টি ইত্যাদি।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক দলের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

(১) সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি: সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি রাজনৈতিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ, লিঙ্গের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও লক্ষ্য করা যায়।

(২) নির্দিষ্ট নীতি ও আর্দশ: প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলেরই নির্দিষ্ট কিছু নীতি ও আদর্শ থাকে। এ নীতি ও আর্দশের ভিত্তিতেই জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা লাভ করলে দলটি তাদের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চায়। যেমন জার্মানির গ্রীন পার্টি, পরিবেশ সংরক্ষণই এ রাজনৈতিক দলের মূল উদ্দেশ্য।

(৩) সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা লাভ: বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা লাভের কোন বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলগুলোও সেভাবে তাদের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। কোন একটি দলের পক্ষে এককভাবে ক্ষমতা লাভ সম্ভব না হলে জোটগতভাবে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে।

(৪) সাংগঠনিক কাঠামো: রাজনৈতিক দল একটি সংগঠন। তাই এটি পরিচালনার জন্য লিখিত নিয়মকানুন (গঠনতন্ত্র) থাকে। যার ভিত্তিতে একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। আদর্শ রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামো গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়।

(৫) স্থানীয় ও জাতীয় অবস্থান: রাজনৈতিক দল স্থানীয়, জাতীয় বা উভয় অবস্থানেই কার্যক্রম পরিচালনা করে। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোতে অনেক স্থানীয় রাজনৈতিক দল দেখা যায়। যেমন ভারতের সমাজবাদী দল কেবল দক্ষিণ ভারতে সক্রিয়।

অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট নীতি-আর্দশ ও কর্মসূচি থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমের উপর একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ও ইতিবাচক রাজনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। মোদ্দাকথা রাজনৈতিক দল ইচ্ছে করলে একটি দেশের প্রভূত উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাজনৈতিক দলের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজস্ব নীতি-আর্দশ দ্বারা কর্মসূচি পরিচালনা করে। রাজনৈতিক দল একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি যারা সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে রাজনৈকি দলগুলোর আর্দশভিত্তিক কার্যক্রম বেশ লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। রাজনৈতিক দল হল - i. সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি ii. আদর্শহীন iii. স্থানীয় ও জাতীয়

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা (Role of Political Party)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বলতে পারবেন।
- রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক দিক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিনিধিত্বশীল, সংগঠন, গঠনমূলক, বিরোধীতা, অতন্ত্র প্রহরী, রাজনৈতিক সহিংসতা

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র বিদ্যমান। এ ব্যবস্থাটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মধ্য দিয়েই সফল হয়ে থাকে। কেননা একমাত্র রাজনৈতিক দলই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব সম্পর্কে R.M. McIver বলেন, রাজনৈতিক দল ছাড়া কোন আদর্শ, নীতি, নিয়মিতভাবে সাংবিধানিক ও সংসদীয় নির্বাচন, বা কোন প্রতিষ্ঠানেরই কার্যকর ও পরিচালনা সম্ভব নয়। নিম্নরূপ ভূমিকার কারণে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

(ক) নেতৃত্ব সৃষ্টি: রাজনৈতিক দলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে। যেখানে বিভিন্ন ইউনিট, বিভাগ বা পর্যায় থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কয়েক জন ব্যক্তি নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। ফলে একজন সদস্য রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে কখনও একটি ইউনিটের নেতৃত্ব দেবার সুযোগ লাভ করেন। এভাবে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেবার মতো নেতৃত্বও সৃষ্টি হয়।

(খ) জনগণকে সংঘবদ্ধ করা: রাজনৈতিক দল একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি। জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে থাকেন। দলের নীতি আর্দশ ও কর্মসূচির মাধ্যমে দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে।

(গ) রাষ্ট্র পরিচালনা: চূড়ান্ত বিচারে রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তারাই সাধারণত সরকার গঠন করে। এভাবে তারা নীতি আদর্শ ও নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

(ঘ) রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি: রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক এরিস্টটল এর মতে মানুষ মাত্রই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। তাই রাজনীতির প্রতি সকলের একটা আকর্ষণ থাকে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল তাদের বক্তৃতা, সেমিনার, পথসভা, নির্বাচনী প্রচার ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে থাকে। ফলে কোন নাগরিক সরাসরি রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলেও তার রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। যা তাকে আদর্শ নাগরিক হতে সহযোগিতা করে।

(ঙ) জাতীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ: বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে রাজনৈতিক দল দেশের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে। ফলে জাতীয় কোন সমস্যা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। সরকারি দল হলে তা সরাসরি সমাধান কার্যক্রম গ্রহণ করে অন্যদিকে বিরোধী দল হলে তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

(চ) গঠনমূলক বিরোধীতা করা: বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের কার্যক্রমের ভূলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া অর্থহীন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রহরী হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসহ সকল বিষয়ে রাজনৈতিক দল সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ কওে থাকে। সাধারণ জনগণ এক ধরনের রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করে এবং রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে গণতন্ত্রেও মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়।

রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক দিক

রাজনৈতিক দল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক সংস্কৃতির তেমন উন্নতি না হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে না। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বিরোধী দল দমন করার মতো অনেক অভিযোগ উঠে।

অনদিকে বিরোধী দলগুলো সরকারি দলকে সহযোগিতা না করে বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা করে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। বিরোধী রাজনৈতিক দল অনেক সময় দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, রাজনৈতিক সহিংসতা সৃষ্টি করে থাকে।

মোটের উপর বর্তমান রাজনৈতিক দল ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পুর্ণ নয়। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকলে দল দেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক কর্মকান্ড উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে প্রমাণিত। তবে এর গুন ও দোষ উভয়ই রয়েছে। নেতৃত্ব সৃষ্টি, সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতায় যাওয়াসহ রাজনৈতিক দল অপরিহার্য অনেক কাজ করে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল সরকারকে অসহযোগিতাও করে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি থাকায় সরকারি দল বিরোধী দলগুলোকে দমনের চেষ্টা করে। বিরোধীদলও কেবল বিরোধীতার কারণে বিরোধীতা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্ ব্যবস্থার জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য?

ক) একনায়কতন্ত্র খ) মধ্যতন্ত্র গ) গণতন্ত্র ঘ) অভিজাততন্ত্র

২। রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ কারণ.....।

i. নেতৃত্ব সৃষ্টি করে
ii. রাষ্ট্র পরিচালনা করে
iii. অযৌক্তিক বিরোধীতা করে

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৩ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল (Political Parties of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলের অবস্থান জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	নিবন্ধন, নির্বাচন, জোট, বেসামরিকীকরণ, সম্মেলন, সভাপতি, সম্পাদক, বিভক্তি, প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে শতাধিক রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ দলেরই তেমন কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অনেকগুলো ছিল সাইনবোর্ড সর্বস্ব কোনটি বা ব্যক্তি সর্বস্ব কোনটি প্যাড সর্বস্ব। নানা কারণে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর জামানাত বাজেয়াপ্ত হত। অনেক দল নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য প্রার্থী মনোয়নও দিতে পারে নি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন সকল রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে। বর্তমানে ৪১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। তার মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দলের পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হল।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্ম। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে দলটির নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ করা হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শামসুল হক ছিলেন প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান দলটির সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠন, স্বৈরচার বিরোধী আন্দোলন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দলটি অনবদ্য অবদান রেখেছে। ১৯৮১ সাল শেখ হাসিনা দলটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও শোষণমুক্তি এ চারটি মূলনীতির উপর দলটি পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তম হল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী শরিক দল সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন. পি.) প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার রমনা গ্রীনে তিনি এ ঘোষণা দেন। বি.এন. পি'র দলীয় সংবিধান অনুযায়ী তাদের রাজনীতির মূলনীতি হল- সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র (অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে)। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলটি এ পর্যন্ত ১৯৭৯, ১৯৯১ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার পরিচালনা করে। দলটির বর্তমান সভাপতি বেগম খালেদা জিয়া।

জাতীয় পার্টি

তৎকালীন সেনাশাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত সামরিক ক্ষমতার বেসামরিকীকরণের অংশ হিসেবে তিনি দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি দুই বার (১৯৮৬ ও ১৯৮৮) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ দু'টি নির্বাচনই বর্জন করে। ১৯৯০ সালে অন্যান্য রাজনৈতিকগুলোর সম্মিলিত আন্দোলনে জাতীয় পার্টি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়। জাতীয় পার্টির নেতা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ স্বৈরাচার হিসেবে আখ্যায়িত হন। ২০০০ সালে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে জাতীয় পার্টি তিনটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। বর্তমানে এরশাদ নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট লাহোরে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। দলটি শরীয়াভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চরম বিরোধীতা করে এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে

হাত মিলিয়ে এদেশের নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করে। দলটি যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। স্বাধীনতার পর দলটিকে নিষিদ্ধ করা হলেও জিয়াউর রহমান রাজনীতি করার অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে দলটিকে সুপ্রীম কোর্ট পুনরায় নিষিদ্ধ করে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ থেকে পৃথক হয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর যাত্রা শুরু হয়। দলটির লক্ষ্য হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং কৃষক-শ্রমিকদের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত করার মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দলটি তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের চরম বিরোধীতা করে। পরবর্তীতে দলটি বিভক্ত হয়ে খালেকুজ্জামান ভূইয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) নামে নতুন একটি দল গঠন করে। জাসদ বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের অংশীদার।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

এটি একটি সমাজতান্ত্রিক দল। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক দলের দুটি ধারা। একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা চীনপন্থী অন্যটি সোভিয়েতপন্থী। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি মূলত লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক দল। ১৯৮০ সালে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেলেও ১৯৯২ সালে পুনরায় একত্র হয়। বর্তমানে রাশেদ খান মেনন দলটির সভাপতি। ২০১৪ সালে মহাজোট এর হয়ে নির্বাচন করে বর্তমানে সরকারের অন্তর্ভূক্ত।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক কার্ল মার্কস এর অনুসারী একটি দল। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিখিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উত্তরাধিকারী সংগঠন। ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট ইউনিট গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এ দলটি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের পূর্বে দলটির কার্যক্রম নানাভাবে দমিয়ে রাখা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দলটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। সামরিক শাসন ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে দলটির ভূমিকা স্মরনীয়। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম দলটির সভাপতি।

এ ছাড়া বাংলাদেশের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল হল– বিকল্পধারা বাংলাদেশ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নিবন্ধিত দশটি রাজনৈতিক দলের নাম লিখুন

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে একাধিক রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের হিসাব মতে বর্তমানে ৪১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি (এরশাদ) উল্লেখযোগ্য। নতুন দলগুলোর মধ্যে বিকল্প ধারা বাংলাদেশ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নাম জানা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবদ্ধিত রাজনৈতিক দল কয়টি?
ক) ৩১ খ) ৪১ গ) ৫১ ঘ) ৬১

২। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কোন সংস্থার অধীন?
ক) বিচার বিভাগ খ) দুর্নীতি দমন কমিশন গ) মানবাধিকার কমিশন ঘ) নির্বাচন কমিশন

পাঠ-৭.৪ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল
(Democracy and Political Party)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সভা-সমাবেশ, অংশগ্রহণ, পরমত সহিষ্ণুতা, দীক্ষা, গণতন্ত্র চর্চা, নিয়মতান্ত্রিক

গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল একে অপরের পরিপূরক। গণতন্ত্র ছাড়া যেমন রাজনৈতিক দল টিকতে পারে না তেমনি রাজনৈতিক দল না থাকলে গণতন্ত্রও সম্ভব নয়। গণতন্ত্র মানে হল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সকলের অংশগ্রহণ। যা কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যদিয়েই সম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সাংগঠনিক কাঠামোর সাহায্যে এক ধরনের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করে। যা বতর্মান প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। গণতন্ত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো বিকশিত হতে পারে। নিম্নে গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করা হল।

নেতৃত্ব সৃষ্টি

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ত্যাগী ও আর্দশ নেতৃত্ব। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কর্মী থেকে দেশপ্রেমিক নেতা তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল হল নেতা তৈরির প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র।

রাজনীতি সচেতন জনগণ

গণতন্ত্রের জন্য সর্বাগ্রে বেশি প্রয়োজন হল রাজনীতি সচেতন জনগণ। রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচার, মিছিল, সভা সেমিনারে বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে। এভাবে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের আগ্রহ তৈরি হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গঠনমূলক বিরোধীতার অধিকারও গণতন্ত্রে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পরমত সহিষ্ণুতা

গণতন্ত্র মানেই ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা। রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একজন নাগরিক ধৈর্য্যশীল ও পরমত সহিষ্ণু হতে পারে। বিরুদ্ধ মত মূল্যায়ন করার ক্ষমতা রাজনৈতিক দল থেকেই বেশি অর্জন করা যায়।

অধিকার প্রতিষ্ঠা

গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দল উভয়ই জনগণকে অধিকার সচেতন করে।

নিয়মতান্ত্রিকতার শিক্ষা:

নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতার পালা বদলের শিক্ষা গণতন্ত্রেই পাওয়া যায়। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা থাকা উচিত।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাস অতি দীর্ঘ নয়। ১৯৭১ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্ন নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলেও বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক চর্চা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা ঘটে। যার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অধিক সক্রিয় হয়। ইতোপূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বর্তমানে গণতন্ত্র সুসংহতকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বিরোধী সব রাজনৈতিক দল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাব থাকায় রাজনৈতিক দলগুলো কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল মুদ্রার এপিট-ওপিট। গণতন্ত্রের মাত্রা দেখে যেমন রাজনৈতিক দলের অবস্থা অনুধাবন করা যায় তেমনি রাজনৈতিক দলের নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচি দেখে গণতন্ত্র মূল্যায়ন করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গনতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য কেন?

সারসংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনীতি সচেতন জনগণ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করে। তেমনি গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলের বিকাশ, জনগণকে অধিকার সচেতন করতে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল একে অপরের পরিপূরক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক পরস্পর......।
ক) নিবিড় খ) সম্পূরক গ) পরিপূরক ঘ) বিপরীত

২। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য কারণ–
i. নেতৃত্ব সৃষ্টি করে
ii. পরস্পর সহিষ্ণুতা তৈরি করে
iii. জনগণকে সচেতন করে

নিচের কোন্টি সঠিক?
ক) i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৭.৫ নির্বাচন (Election)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নির্বাচন কী বলতে পারবেন।
- নির্বাচনের প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- ভোটদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিনিধি, বাছাই, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, প্রকাশ্য, গোপন, স্থানীয়, জাতীয়, অবাধ, সার্বজনীন, নিরপেক্ষ, মনোনয়ন

নির্বাচন অতি পরিচিত একটি প্রত্যয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা অপরিহার্য। নির্বাচন হল যেকোন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি। নির্বাচনের প্রাণ হল নির্বাচক বা ভোটার। সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত নাগরিকগণ নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১০ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রার্থীগণ ইশতেহার ঘোষণা করে। তার প্রেক্ষিতে জনগণ তাদের মতামত প্রকাশ করে। ভোটারগণ প্রার্থীর যোগ্যতা ও সক্ষমতা দেখে ভোট প্রদান করে থাকে। নির্বাচন অনুষ্ঠান যেকোন সরকারের জন্য একটি বিশাল কর্মকান্ড। সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যেমন বাংলাদেশে ৫ বছর, আমেরিকায় ৪ বছর পর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনের প্রকারভেদ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দুই ধরনের নির্বাচন বিদ্যমান। যেমন- প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন: যখন জনগণ সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে। যেমন- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

পরোক্ষ নির্বাচন: জনগণ ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন। জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের (৫০ জন মহিলা) সদস্য নির্বাচিত করেন। এভাবে নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে পরোক্ষ নির্বাচন বলে। যেমন- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে সংসদ সদস্যরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন। আবার ইলেক্টরাল কলেজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন।

ভোটদান পদ্ধতি

ভোটদান পদ্ধতি নির্বাচনের প্রকারভেদ এবং কোন পর্যায়ের নির্বাচন হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। যেমন- স্বল্প ভোটার বিশিষ্ট নির্বাচন অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয় এবং অধিক ভোটার বিশিষ্ট জাতীয় নির্বাচন পরোক্ষ হয়। ভোটদান পদ্ধতি বলতে বুঝায় যে পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে ভোট পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি ও গোপন ভোটদান পদ্ধতি (২) ঐচ্ছিক ভোটদান ও বাধ্যতামূলক ভোটদান (৩) একাধিক ভোটদান পদ্ধতি।

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি ও গোপন ভোটদান পদ্ধতি

প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে 'হ্যাঁ' ধ্বনি বা 'হাত উঁচু করে' সমর্থন দান করে। সাধারণত জাতীয় সংসদে উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে হাত উচু করে হ্যাঁ বা না বলার মাধমে প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে প্রার্থীর বা প্রার্থীর প্রতীক অঙ্কিত একটি ব্যালট পেপার থাকে। ভোটারগণ

ভোট কক্ষে গিয়ে গোপনে পছন্দের প্রার্থীর অনুকূলে সীল মেরে তাঁর সমর্থন জানায়। পরবর্তীতে ব্যালট পেপার একত্র করে গণনার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে এটিই ভোটের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি।

ঐচ্ছিক ভোটদান ও বাধ্যতামূলক ভোটদান

ভোটদান ভোটারের ইচ্ছে নির্ভর। ফলে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করলেও সমস্যা হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে ভোটাধিকার ঐচ্ছিক। অন্যদিকে ভোট না দেওয়া আইনত দন্ডনীয় হলে তা বাধ্যতামূলক ভোটদান পদ্ধতি। সুইজারল্যান্ডে কয়েকটি ক্যান্টনে (বাংলাদেশের জেলার সাথে তুলনীয়) ভোটদান বাধ্যতামূলক।

নির্বাচনের এই দু'টি পদ্ধতিতেই 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ একই ধরনের পদের জন্য কোন ভোটার কেবল একজন প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারেন।

একাধিক ভোটদান পদ্ধতি

এ ব্যবস্থায় প্রার্থীর যোগ্যতা বিচারে ভোটারগণ একাধিক ভোট দিতে পারে। তবে সর্বোচ্চ ভোটের একটি মাত্রা থাকে। বর্তমানে এ ধরনের পদ্ধতি তেমন একটা প্রচলন নেই।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিনিধি বাছাই বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার গঠনে নির্বাচনের বিকল্প নেই। তবে এই নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে কেমন হবে তা একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নির্বাচনের প্রকারভেদ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নির্বাচন অতি পরিচিত একটি প্রক্রিয়া। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে একাধিক পছন্দ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থী বেছে নিতে হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। আবার ভোটদান প্রকাশ্যে বা গোপনেও হতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি অনুসরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে ২০১৪ সালের নির্বাচন কততম সংসদ নির্বাচন?
ক) অষ্টম খ) নবম গ) দশম ঘ) একাদশ

২। 'ক' রাষ্ট্রের সংসদে কোন বিল (আইনের খসড়া) এ সাধারণত স্পীকারের নির্দেশনায় হাত উচু করে হ্যাঁ বা 'না' বলে সংসদ সদস্যগণ পক্ষে বিপক্ষে ভোট দিয়ে থাকেন। উক্ত রাষ্ট্রের সংসদে কোন্ ধরনের ভোটদান পদ্ধতি বিদ্যমান?
ক) ঐচ্ছিক খ) গোপন গ) বাধ্যতামূলক ঘ) প্রকাশ্য

পাঠ-৭.৬ নির্বাচনী সংস্থা
(Electoral Management Body)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নির্বাচনী সংস্থা কী বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাংবিধানিক, নিরপেক্ষ, অবাধ, সার্বজনীন, ভোটাধিকার, ব্যালট, নির্বাচনী এলাকা, গেজেট, বেসরকারি।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নির্বাচনী সংস্থা থাকে। এই নির্বাচনী সংস্থা স্বাধীন, স্বতন্ত্র অথবা শাসন বিভাগের অধীনও হতে পারে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্থা একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সংস্থা অন্যদিকে ফ্রান্সের নির্বাচনী সংস্থা শাসন বিভাগের অধীন। নির্বাচন নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে নির্বাচনী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন ইন্ডিয়া, আমেরিকার ইলেকশন এসিস্ট্যান্ট কমিশন, যুক্তরাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজ নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্থার নাম নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

গঠন

সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব কর্তব্য এবং ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত অনুচ্ছেদ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ১১৮ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনার লইয়া বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনের গঠন কেমন হবে তার নির্দিষ্ট কোন আইন নেই। এ বিষয়টি রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারাধীন। রাষ্ট্রপতি সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে সার্চ কমিটি গঠন করেন। এ সার্চ কমিটি নির্বাচন কমিশনের জন্য যোগ্য সদস্য নির্বাচিত করে। রাষ্ট্রপতি তাদের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন। তাঁরা সাধারণত ৫ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নির্বাচন কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারেন। ঢাকার আগারগাঁও এ নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব একটি সচিবালয় রয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সারা দেশে কমিশনের কার্যালয় ও জনবল রয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের মত মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরের সদস্যগণ নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করে থাকে। পুরো প্রক্রিয়াটি সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাবলি ও অন্যান্য আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্তমানে (২০০৬) দেশে ২৬টি নির্বাচনি আইন, বিধি ও অধ্যাদেশ কার্যকর রয়েছে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সংবিধানের ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩ ও ১২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন

(১) রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে

(২) রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে

(৩) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করবে

(৪) এলাকা ভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন

(৫) সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে পারবে

এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশনসহ সব ধরনের স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তফসিল ঘোষণা, মনোয়নপত্র গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই, নির্বাচনী আচরণ বিধি পর্যবেক্ষণ ও ভোটের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সব বিষয়েই নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বাংলাদেশে ভোটের ফলাফল সাধারণত ঐ দিনই ভোটার ও প্রার্থীর উপস্থিতিতে প্রকাশ করতে হয়। এই ফলাফলটি বেসরকারি ফলাফল। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন গেজেট আকারে অর্থাৎ সরকারিভাবে ফলাফল প্রকাশ করে। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন শাসন বিভাগের নিকট প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহযোগিতা পেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন অপরিহার্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা অনুযায়ী একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রয়েছে। কিন্তু নানাবিধ কারণে এটি এখনও তেমন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	নির্বাচনী সংস্থা বলতে কী বুঝেন?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্থার নাম নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ। রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য কমিশনারদের নিয়োগ করেন। নির্বাচন কমিশন জাতীয়, স্থানীয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ গণভোট অনুষ্ঠান করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় ও জনবল রয়েছে। তবে সংবিধানের ধারা মতে নির্বাচনের সময় কমিশনের চাহিদা মোতাবেক শাসন বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কত অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে?

(ক) ১১৭ (খ) ১১৮ (গ) ১১৯ (ঘ) ১২০

২। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের কাজ হল–

i. ভোটার তালিকা প্রণয়ন
ii. নির্বাচন অনুষ্ঠান করা
iii. রাজনৈতিক দল গঠন করা

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন কতটি?

(ক) ৪৫ (খ) ৫০ (গ) ৩০০ (ঘ) ৩৫০

ছকটি মনযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের সমাধান করুন

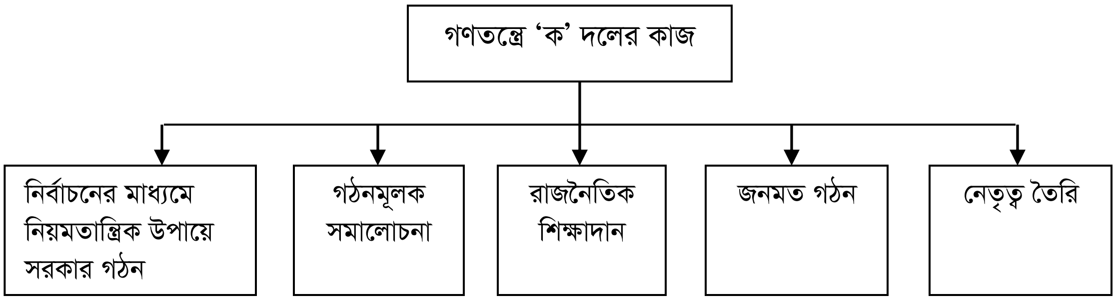

২। গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ-

i. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করা।
ii. দলীয় কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।
iii. সরকারের কাজে বিরোধী দলের গঠনমূলক বিরোধীতা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। ছকের দলটির ভূমিকাগুলো পালন করতে সহজ হবে-

(ক) রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় (খ) সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়
(গ) একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় (ঘ) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

২০০৮ সালে বাংলাদেশে নবম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ময়মনসিংহের একটি আসন থেকে ‘ক’ ও ‘খ’ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তারা ভোটারদের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে তাদের সমস্যার কথা শোনেন। এছাড়াও তারা নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে মিটিং, সভা, মাইকিং ও মিছিল কর্মসূচি পালন করেন। নির্বাচনে ভোটারগণ ‘ক’ ব্যক্তিকে সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান মনে করে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেন।

(ক) কোন সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ?
(খ) রাজনৈতিক মূল লক্ষ্য কোনটি?
(গ) ‘ক’ ব্যক্তিকে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা হয়? বর্ণনা দিন।
(ঘ) নির্বাচনে ‘ক’ ও ‘খ’ প্রার্থীর কাজের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলের কোন কোন প্রধান কাজের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১ : ১। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬ : ১। খ ২। খ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা
(Local Government of Bangladesh)

ইউনিট ৮

রাষ্ট্রের শাসনকার্য সঠিকভাবে পরিচালনায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রিয় সরকারের অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে গড়ে উঠেছে। এই সরকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মূল কারণ হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা। বাংলাদেশেও এ ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রের শাসন কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাই রাষ্ট্র পরিচালনা ও উন্নয়নে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। এ ইউনিটে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামো, গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলি ও আয়ের উৎস সম্পর্কে জানানো হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-৮.১ স্থানীয় সরকার
(Local Government)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্থানীয় সরকার কী বলতে পারবেন।
- স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পৌর, উন্নয়ন, অবকাঠামো, সেবা, তৃণমূল

স্থানীয় সরকার হল রাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্ত করা ক্ষুদ্রতর শাসন কাঠামো। এটি হল কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ধিত ও সহায়ক অংশ। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রিয় সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার দুই রকমের হয় যথা-স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার। স্থনীয় প্রশাসন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন প্রশাসক যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের উদাহরণ হল-জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, শহরাঞ্চলে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সম্মিলিতভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি

জনগণের প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্খার ধারক-বাহক হিসাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুই ধরনের। (ক) শহর বা পৌর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং (খ) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা।

(ক) শহর বা পৌর স্থানীয় সরকার; শহর বা শহরে পরিণত হচ্ছে এমন এলাকার উন্নয়ন ও বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য এগুলো গঠন করা হয়। যেমন- বাংলাদেশে পৌরসভা, ব্রিটেনে বরো (Borough) ইত্যাদি।

(খ) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার: গ্রাম এলাকার সেবার ধরণ একটু ভিন্ন। তাই গ্রামীণ সরকারও শহুরে স্থানীয় সরকার থেকে ভিন্ন হয়। যেমন- বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। বর্তমান রাষ্ট্রগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা উভয়ই বেশি। অন্যদিকে রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক ভাবধারার দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে সরকার জনগণের দোর গোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গ্রামীণ এই উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে সম্পন্ন করা কঠিন। আর তাই বাংলাদেশের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে গঠন করা হয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। যার দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ শাসন ও সেবা প্রদান দু কারণেই সরকারকে তৃণমূলে হচ্ছে। নিম্নরূপ কারণে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম–

(ক) গ্রামীণ এলাকার প্রতি সরকারের দৃষ্টিদান ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামীন জনগণের অবস্থা উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিদান। যেমন- স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন, কৃষির উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

(খ) দ্রুত ও সহজ বিচার ব্যবস্থা ঃ বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দারপ্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্যে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী কোর্ট স্থাপন করা, ছোট খাট অপরাধের বিচারের জন্যে সালিশীর ব্যবস্থা করা যাতে গ্রামীণ জনগণ সহজেই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে গ্রাম আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(গ) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ সামাজিক সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পল্লী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, সরকারি অফিসের শাখা সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, স্কুল, কলেজ স্থাপন ও তদারকি করে থাকে।

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা এবং সকল কার্যক্রমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে সাহায্য করে। জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার হল স্থানীয় জনগণের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র পরিসরের শাসন ব্যবস্থা। এই সরকার নির্বাচিত, অনির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারে। সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শহর ও গ্রামীণ পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। স্থানীয় সরকার তার কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে ফলে বৃহত্তর ভাবে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমানে স্থানীয় সরকার অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অংশ নয় .....।

(i) কেন্দ্রীয় সরকার (ii) বিচার বিভাগ (iii) মন্ত্রিপরিষদ (iv) জেলা প্রশাসন

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) i + iv (খ) iii + iv (গ) ii + iii (ঘ) i + ii + iii

পাঠ-৮.২ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ (Nature of the Local Government of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ জানতে পারবেন।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি বলতে পারবন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান, স্তর, জন অংশগ্রহণ, স্থানীয় প্রতিনিধি, তৃণমূল, ক্ষমতা বন্টন

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস বাংলাদেশে অভ্যুদয়ের ইতিহাসের মতই পুরনো। মোঘল ও ব্রিটিশ আমল পেরিয়ে নানা আনুষ্ঠানিকতা ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবিভক্ত পাকিস্তানেও এ রকম স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব ছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৭২ সালের সংবিধানে। বাংলাদেশে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ স্তরগুলো হল-জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, এবং সবচেয়ে নিচের ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদ। শহরে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ রয়েছে। গ্রাম বা এর নিকটবর্তী হল ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বশেষ ও কার্যকরী স্তর বলে বিবেচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন রয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

↓

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ↓		পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ↓
শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার	**গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার**	**পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ**
সিটি কর্পোরেশন	জেলা পরিষদ	বান্দরবন পাহাড়ী জেলা পরিষদ
পৌরসভা	উপজেলা পরিষদ	রাঙামাটি পাহাড়ী জেলা পরিষদ
	ইউনিয়ন পরিষদ	খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলা পরিষদ

বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার গঠনের বিধান রয়েছে। সাধারণত প্রতিটি স্তরের এলাকাকে ওয়ার্ড হিসাবে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। তবে জেলা পরিষদ নির্বাচনে কেবল ওয়ার্ডের সদস্যদের ভোটাধিকার রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তরেই নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের বিশেষ বিধান রয়েছে।

সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে তৃনমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং একই সাথে জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে (অনুচ্ছেদ ৯, ১১, ৫৯ এবং ৬০)। এসব অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ করে ৫৯(১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইন মোতাবেক নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে।"

৬০ নং অনুচ্ছেদে "স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ এবং নিজস্ব তহবিল রক্ষনাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।" এ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

সংবিধানের স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়-

বাংলাদেশের সংবিধান শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামোর জন্য নির্দিষ্ট এলাকার স্থানীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় ব্যবস্থার কাঠামো নির্ণয় করে দিয়েছে। যেখানে কৃষক, শ্রমিক ও নারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতাও এইভাবে নির্ণয় করা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষমতা বিধি মোতাবেক স্থানীয় সরকার কাঠামোর কাছে ন্যস্ত থাকবে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয়, আর্থিক, উন্নয়নমূলক ভূমিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। এই স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে শুধু সুশাসনে অবদান রাখবে তা নয় বরং উত্তম সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহের ব্যবস্থাপনায় অধিক সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধান করবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যাবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রণীত সংবিধানে স্থানীয় সরকারের উপর জোর দেয়া হয়। বাংলাদেশে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে-ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, শ্রমিক ও নারীর উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কয় স্তরবিশিষ্ট?

(ক) এক (খ) দুই
(গ) তিন (ঘ) পাঁচ

(২) বাংলাদেশের সংবিধান স্থানীয় সরকারকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করেছে ....।

(i) অনুচ্ছেদ ৫৯(১) দ্বারা (ii) অনুচ্ছেদ ৯ দ্বারা
(iii) অনুচ্ছেদ ৬০ দ্বারা (iv) অনুচ্ছেদ ৯ ও ৬০ দ্বারা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i (খ) iii (গ) iv (ঘ) i + iii

পাঠ-৮.৩ ইউনিয়ন পরিষদ (Union Council)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইউনিয়ন পরিষদের গঠন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	গ্রামীণ, ওয়ার্ড, সংরক্ষিত, রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন, কর আরোপ, ইজারা, টোল

৮৯ হাজার গ্রাম অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশ। সাধারণত প্রায় ১৫-২০ হাজার লোক অধ্যুষিত ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন। একটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে এক জন করে ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সাধারণ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ন'জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিন জন নির্বাচিত নারী সদস্য (সংরক্ষিত আসনে) রয়েছে।

প্রতি তিন ওয়ার্ড থেকে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। কার্যালয় পরিচালনার জন্য এক জন সচিব নিয়োগ করা হয়। যদিও ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর, সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের অপসারণ করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৪৫০ টি।

কার্যাবলি

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জন জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল-

১। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে।
২। জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে আলো জ্বালানো।
৩। সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠ এর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৪। কৃষি উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে।
৫। মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিস্কার পরি”ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।
৭। শিক্ষা বিস্তারের ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন ইত্যাদি করে।
৮। ইউনিয়ন পরিষদ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গণসচেতনতা তৈরি করে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অল্প খরচে সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করে।
৯। চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।
১০। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা করে।
১১। কবরস্থান, শ্বশ্মান, জনসাধারণের সভার স্থান ও জনসাধারণের অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে।
১২। খাবার পানির জন্যে সংরক্ষিত কুপ, পুকুর বা পানি সরবরাহে অন্যান্য স্থান সংরক্ষণ করা।

১৩। ইউনিয়ন পরিষদ জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করে।
১৪। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন পরিষদ দু:স্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।
১৫। ইউনিয়ন পরিষদ নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় করে এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে।
১৬। গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থা এবং দেওয়ানি ও ছোট খাটো ফৌজদারি মামলার বিচার ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে।
১৭। ইউনিয়ন পরিষদের মত একই কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা স্থাপন করে।
১৮। ইউনিয়নের বাসিন্দা বা পরিদর্শনকারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েস বা সুযোগ-সুবিধার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

আয়ের উৎস

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস নিম্নরূপ:

(১) বাড়িঘর, দালান-কোঠার উপর কর
(২) জন্ম, বিবাহ ও ভোজের উপর ফি
(৩) গ্রাম পুলিশ রেট
(৪) জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণকর কাজের জন্য ফি
(৫) হাট বাজার, জলমহাল, ফেরিঘাট ইজারা ও টোল সংগ্রহ
(৬) সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস, মেলা ইত্যাদির উপর কর
(৭) যানবাহনের উপর কর, লাইসেন্স, পারমিট ফি
(৮) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ/অনুদান ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সক্ষমতা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর নিচের দিকে সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট হল ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য ও মহিলা সদস্যগণ জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, উন্নয়ন কাজে সহায়তা, সচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করতে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের আসনের অনুপাত কত?
(ক) ৩ ঃ ৪ (খ) ২ ঃ ৩ (গ) ৩ ঃ ১ (ঘ) ৪ ঃ ২

২। ইউনিয়ন পরিষদ যে সব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে তা হল –
(i) রাস্তাঘাট নির্মাণ (ii) বৃক্ষরোপন
(iii) উন্নতমানের বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ (iv) নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে ব্যবস্থা নেয়া
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i + ii (খ) iv (গ) iii (ঘ) i + ii + iii

পাঠ-৮.৪ উপজেলা পরিষদ (Upazila Council)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উপজেলা পরিষদের গঠন জানতে পারবেন।
- উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- উপজেলা পরিষদের আয়ের উৎস জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	থানা, উপজেলা, নির্বাচিত, নির্বাহী কর্মকর্তা, সমন্বয়, কর আরোপ, উন্নয়ন

১৯৮২ সালে বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। থানাগুলোকে উপজেলা নামে গণ্য করে সর্বত্র নির্বাচিত পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করা হলেও ১৯৯৮ সালে আবার উপজেলা গঠনের জন্যে আইন প্রণয়ন করা হয়।

গঠন

উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (এদের মধ্যে একজন হবেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা) এবং কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে। সংশ্লিষ্ট উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি এই পরিষদের সদস্য হবেন। এ ছাড়া উপজেলা পরিষদে সংরক্ষিত পদে তিনজন নারী সদস্য মনোনীত হয়ে থাকেন। ২০০৯ উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ পরিষদের পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এই পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও.) পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৯০ টি উপজেলা রয়েছে।

কার্যাবলি

উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ অনুযায়ী এই পরিষদ নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করে থাকে–

১। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে।

২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও উক্ত দপ্তরের কাজ কর্মসমূহের তত্ত্বাবধান করা।

৩। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আন্ত-ইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

৪। কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে পশু পালন, মৎস্য চাষ, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৫। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তা দান করে।

৬। স্যানিটেশন ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। শিক্ষা প্রসারের জন্য জনমত তৈরি এবং মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারকি করে।

৮। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করে।

১০। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জনমত গঠন করে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১১। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

১২। আত্ম:কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে নিজ উদ্যোগে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

১৩। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৪। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

আয়ের উৎস

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ২৪ নং আইন) এর চতুর্থ তফসিলে উল্লেখিত সকল বা যে কোন কর রেইট, টোল এবং ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করতে পারবে। এভাবে আয়ের উৎস গুলো হল ঃ

১) উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহল ও ফেরিঘাট হতে ইজারার আয়।

২) যে সকল উপজেলায় পৌরসভা গঠিত হয়নি, সেখানে সীমানা নির্ধারণপূর্বক উক্ত সীমানা বা থানা সদরের মধ্যে অবস্থিত ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানার উপর ধার্যকৃত কর।

৩) যে সকল উপজেলায় পৌরসভা নেই সেখানে থানা সদরে অবস্থিত সিনেমা হলের উপর কর, নাটক, থিয়েটার বা যাত্রার উপর নির্ধারিত কর।

৪) বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত কর।

৫) রাস্তা আলোকিতকরণের উপর কর।

৬) পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর ধার্যকৃত ফি ইত্যাদি।

৭) উপজেলার এলাকাভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বাবদ আদায়কৃত রেজিস্ট্রেশন ফিসের ১% এবং আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২%।

৮) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোন উৎস হতে অর্জিত আয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	উপজেলা পরিষদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল উপজেলা পরিষদ। ১৯৮২ সালে প্রথম উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। একজন চেয়ারম্যান, দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান, অধিভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার মেয়র (যদি থাকে) ও তিনজন মহিলা সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। তাছাড়া স্থানীয় সংসদ সদস্য এর পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন। উপজেলা পরিষদের প্রধান কাজ হল ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কত সালে বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়?

(ক) ১৯৮২ (খ) ১৯৮১ (গ) ১৯৮৩ (ঘ) ১৯৯১

২। উপজেলা পরিষদের আয়ের উৎস –

(i) কড়িঘর ও দালান-কোঠার উপর কর (ii) গ্রাম পুলিশ রেট

(iii) যানবাহনের উপর কর (iv) সেবার উপর ধার্যকৃত ফি

নিচের কোন্‌টি নির্ভুল?

(ক) iv + i (খ) ii + iii (গ) iii (ঘ) iv

পাঠ-৮.৫ জেলা পরিষদ (District Council)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয় তা জানতে পারবেন।
- জেলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- জেলা পরিষদ এর আয়ের উৎস কি কি তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচকমন্ডলী, চেয়ারম্যান, নির্বাহী, পরিকল্পনা প্রণয়ন, তদারকি

জেলা পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। জেলা পরিষদের সভাপতি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা পান এবং জেলা প্রশাসককে তার অধীনে প্রধান নির্বাহী করা হয়। সংসদ সদস্য এই পরিষদে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

গঠন

জেলা পরিষদ আইন ২০০০ অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠিত হয়। ১ জন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫ জন নারী সদস্যদেরকে নিয়ে এই জেলা পরিষদ। এরা নির্বাচিত হবেন পরোক্ষ ভোটে। জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী গঠিত হবে এক নির্বাচকমন্ডলী। প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভূক্ত সিটি কর্পোরেশনের মেয়র (যদি থাকে) ও কমিশনারগণ উপজেলা পরিষদের মেয়র, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিয়ে হবে এই নির্বাচকমন্ডলী। একটি জেলায় মোটামুটি ১২৫ জন সদস্যের নির্বাচকমণ্ডলী থাকবে এবং তাঁরা একুশ জনকে নির্বাচিত করে জেলা পরিষদ গঠন করবেন।

কার্যাবলি

জেলা পরিষদ আইনটি পাশ হয় ২০০০ সালে। এ আইনে জেলা পরিষদের কার্যাবলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা জেলা পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্যান্য দায়িত্বগুলো হল- শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণে পারিবারিক ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতাল গুলোর মান পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। তাছাড়া সন্ত্রাস দমন ও আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে সহায়তা দান এবং উপজেলার কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করা। জেলা পরিষদ জেলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে।

(ক) জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা।
(খ) উপজেলা ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা।
(গ) সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা ও এর রক্ষণাবেক্ষণ।
(ঘ) উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এই প্রকার জনপথ কালভার্ট ও ব্রীজ-এর নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ।
(ঙ) রাস্তার পার্শ্বে জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।
(চ) জনসাধারণের ব্যবহার্যে উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ।
(ছ) সরাইখানা, ডাকবাংলা ও বিশ্রামগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
(জ) জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনকৃত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা।
(ঝ) উপজেলা ও পৌরসভাকে সহায়তা, সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান।
(ঞ) সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

আয়ের উৎস

জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুযায়ী জেলা পরিষদকে ৮টি উৎস থেকে আয় করে থাকে। এই উৎসগুলো ছাড়াও জেলা পরিষদের জন্য জমি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ ভূমি করের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও হাট/বাজার, ফেরি ঘাট এবং জলমহাল থেকে বর্ধিত পরিমাণ লীজ এর অর্থ জেলা পরিষদ পাবে। নিচে জেলা পরিষেদের আয়ের কয়েকটি উৎস উল্লেখ করা হল−

(ক) বিজ্ঞাপন কর।
(খ) পরিষদের রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল।
(গ) পরিষদের জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে রেইট।
(ঘ) পরিষদ স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুলের জন্যে ফিস।
(ঙ) পরিষদের সেবা সরবরাহের জন্যে চার্জ।
(চ) পরিষদের জনকল্যাণমূলক কাজে উপকারের জন্যে ফিস এবং
(ছ) সরকারের হুকুমে আরোপিত কর।

সরকারের সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে জেলাপরিষদ খুব কার্যকর একটি কাঠামো। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জেলা পরিষদ সম্পূর্ণ সেভাবে এখনো কার্যকর হয়নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেলা পরিষদের গঠন কী রূপ?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সবোচ্চ স্তর হল জেলা পরিষদ। ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন পাশ হয়। জেলা পরিষদ (সংশোধিত) একজন চেয়ারম্যান, পনের জন সদস্য সংরক্ষিত পদে ৫ জন নারী সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। জেলা পরিষদ নিজস্ব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর কোন্টি?
(ক) উপজেলা পরিষদ (খ) ইউনিয়ন পরিষদ
(গ) জেলা পরিষদ (ঘ) গ্রাম সরকার

২। বর্তমান জেলা পরিষদ ....।
(i) ২০০০ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী গঠিত
(ii) একজন চেয়ারম্যান থাকেন
(iii) একজন মন্ত্রি এই পরিষদের পরামর্শক হয়ে থাকেন
(iv) ৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে

নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i (খ) iii (গ) ii + iv (ঘ) i + iii+iv

পাঠ-৮.৬ পৌরসভা (Municipality)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পৌরসভার গঠন বলতে পারবেন।
- পৌরসভার কার্যাবলি জানতে পারবেন।
- পৌরসভার আয়ের উৎস চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শহর এলাকা, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, রক্ষণাবেক্ষণ, জননিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, লাইসেন্স

শহর এলাকায় স্থানীয় সরকারের প্রথম ধাপ হল পৌরসভা। অধিকাংশ পৌরসভাই উপজেলা পরিষদের কেন্দ্রে অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩১৮টি পৌরসভা রয়েছে।

গঠন

২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন দ্বারা পৌরসভা গঠিত হয়। ১ জন মেয়র, গেজেট অনুযায়ী নির্ধারিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের পৌরসভার নারী কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। পৌরসভার কার্যকাল ৫ বছর।

কার্যাবলি

পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পাশাপাশি নানাবিধ উন্নয়নমুলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন-

১। সুপরিকল্পিত সুন্দর শহর গড়া এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পৌরসভা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

২। পৌরসভা যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোটরগাড়ি ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করে।

৩। পৌরসভা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য সন্ত্রাস দমন ও শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪। জনগণের জন্য নিরাপদ খাওয়ার পানির ব্যবস্থা এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৫। পৌর এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য পৌরসভা নৈশ প্রহরী নিয়োগ করে। অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক খেলা ও পেশা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। পৌর এলাকায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, খামার স্থাপন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গবাদি পশু বিক্রি ও রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক পশু আটক ও হত্যা, পশুর মৃতদেহ অপসারণ ইত্যাদি কাজ করে।

৭। পরিকল্পিত শহর গড়ার জন্য পৌরসভা বাড়িঘর নির্মাণের অনুমতি দেয়। অননুমোদিত ও বেআইনী নির্মাণসমূহ ভেঙ্গে দেয়।

৮। মৃতদেহ সৎকারের জন্য গোরস্থান, শ্মশান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। অনাথ ও দু:স্থদের জন্য এতিমখানা ও অনাথ আশ্রম নির্মাণ করে।

৯। পৌর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয়, পাঠাগার স্থাপন করে।

১০। খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে, পঁচা ও ভেজাল খাবার বিক্রি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মাদক জাতীয় খাদ্য ও পানীয় অবাধে বিক্রি বন্ধের জন্য এসব দ্রব্য প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে। বিধি নিষেধ লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেয়।

১১। পৌরসভা শহরের জনস্বাস্থ্যমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রাস্তাঘাট, পুকুর, নর্দমা পরিষ্কার ও ডাস্টবিন নির্মাণ করে। সংক্রামক ও মহামারী ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক দানের ব্যবস্থা করে। হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশু সদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করে।

১২। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পৌরসভা দুর্গতদের সাহায্য, সেবা এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করে।

১৩। পৌর এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ, বন সংরক্ষণ, জনগণের বিনোদনের জন্য পার্ক ও উদ্যান, মিলনায়তন স্থাপন এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গন সংরক্ষণ করে।

আয়ের উৎস

পৌরসভার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আয়ের উৎস গুলো হল- স্থাপনা ও বিভিন্ন পরিসেবার উপর ধার্যকৃত কর। যেমন ঘরবাড়ি, দোকানপাট, পানি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি। তাছাড়া আরো কিছু আয়ের খাত যেমন যানবাহন নিবন্ধন ফি, লাইসেন্স প্রদান বাবদ ফি। পাশাপাশি সরকারি বরাদ্দও পৌরসভার আয়ের একটি প্রধান উৎস।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৌরসভা কী কী কাজ করে থাকে?

সারসংক্ষেপ

শহরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হল পৌরসভা। পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভা গঠিত হয় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী। শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও নানাবিধ উন্নয়নমুলক কাজের দায়িত্ব পালন করে পৌরসভা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ইউনিট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্‌টির মাধ্যমে পৌরসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন?

(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রত্যক্ষ ভোট
(গ) পরোক্ষ ভোট (ঘ) প্রধানমন্ত্রী

২। পৌরসভা গঠিত হয়......।

(i) জেলা পরিষদ আইন ২০০০
(ii) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯
(iii) উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮
(iv) পৌরসভা আইন ২০০১

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) iv

পাঠ-৮.৭ সিটি কর্পোরেশন (City Corporation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সিটি কর্পোরেশনের গঠন সম্পর্কে অবগত হবেন।
- সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম জানতে পারবেন।
- সিটি কর্পোরেশনের আয়ের উৎসগুলো বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মহানগর, মেয়র, শান্তি-শৃঙ্খলা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নৈশ বিদ্যালয়, জনস্বাস্থ্য

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে- সিটি কর্পোরেশন। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১১ টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এগুলো হল ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। নগরায়নের প্রভাবে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গঠন

প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনকে কতগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত একজন মেয়র সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কাউন্সিলার এবং সর্বমোট কাউন্সিলরদের এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর সমন্বয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়। মেয়র প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন কাউন্সিলর প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।

কার্যাবলি

মহানগর এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। নিচে তা আলোচনা করা হল-

১। মহানগরীর রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। মোটর গাড়ি, বাস, ট্রাক ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করে এবং রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

২। জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাওয়ার পানি সরবরাহ, কূপ ও গভীর নলকূপ খনন করে এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৩। সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

৫। মহানগরের পরিবেশের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য সিটি কর্পোরেশন রাস্তার পাশে ও উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ করে। জনসাধারণের অবকাশ যাপনের জন্য উদ্যান নির্মাণ করে।

৬। মহানগরীর নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠন স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, বৃত্তি প্রদান, পাঠাগার নির্মাণ ও পরিচালনা ইত্যাদি কাজ করে।

৭। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তন, আর্ট-গ্যালারি, তথ্য কেন্দ্র, যাদুঘর, মুক্তমঞ্চ ইত্যাদি নির্মাণ করে।

৮। মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশন ছোটখাটো বিচার কাজ সম্পাদন করে। বিবাদ মীমাংসা ও মহল্লায় শান্তি রক্ষার জন্য শান্তিরক্ষী নিয়োগ করে। মহানগরীতে চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক রোধ ও সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৯। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশন ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ, বিভিন্ন স্থানে শৌচাগার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি নির্মাণ করে। এছাড়াও হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশু সদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা করে।

১০। সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। অননুমোদিত ঘরবাড়িসহ সকল অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেয় এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে।

১১। মহানগরীর গরিব দু:খী মানুষকে সাহায্য করা, অনাথ আশ্রম ও জনকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি রোধ ও পুনর্বাসন, জুয়াখেলা, মাদকাশক্তি ও অসামাজিক কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে।

১২। সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় পঁচা-বাসি ও ভেজাল খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় ও সরবরাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত, আমদানি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করে।

আয়ের উৎস

প্রধান শহরগুলোর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সিটি করপোরেশনের আয়ের বিভিন্ন উৎসগুলো হল ঃ

(ক) সরকার হতে প্রাপ্ত অনুদান;
(খ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;
(গ) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত যে-কোনো কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি;
(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান ;
(ঙ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয়;
(চ) কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা;
(জ) আইনের অধীন অর্থদন্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিটি কর্পোরেশন এর গঠন বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সিটি কর্পোরেশন হল বিভাগীয় শহর ও প্রধান শহর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার কাঠামো। বাংলাদেশে বর্তমানে এগারোটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলরগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব হল মহানগর এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং নানাবিধ ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা কয়টি?

(ক) ৫ টি (খ) ৭ টি (গ) ৯ টি (ঘ) ১১ টি

২। সিটি কর্পোরেশনের আয়ের উৎস হল –

(i) কর ও উপকর (ii) অনুদান (iii) নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাস্ট (iv) অর্থদন্ড

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i (খ) ii + iii (গ) ii + iii + iv (ঘ) সবগুলো

পাঠ-৮.৮ বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (Special Local Government)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন, কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- পার্বত্য জেলা পরিষদের আয়ের উৎস জানতে পারবেন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর গঠন, কার্যাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আয়ের উৎস নিরূপন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিশেষ চাহিদা, ভিন্ন সংস্কৃতি, শান্তি চুক্তি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পার্বত্য জেলা, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে জীবনাচরণ ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা বাঙ্গালিদের চেয়ে আলাদা। তারা তাঁদের আলাদা সত্তার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দীর্ঘ দিন যাবত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশেষ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ (Hill Tract District Council)

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। সেখানে বাঙ্গালিদের বসবাসও রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চল বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বহু পূর্ব থেকে বিশেষ এলাকা হিসেবে পরিগণিত। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে এসব সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য। বর্তমানে সংসদে ৩টি আসন তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ৫ বছর করা হয়েছে।

গঠন-কাঠামো ও প্রকৃতি

একজন চেয়ারম্যান, ৩০ জন সদস্য ও ৩ জন নারী সদস্য নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত। তাঁরা সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হন। জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙ্গালিদের প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত হবেন এবং ৩ জন নারী সদস্যের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙ্গালিদের অনুপাত হবে ২ঃ১। তাঁদের মেয়াদ ৫ বছর এবং সচিবের দায়িত্ব পালন করেন একজন সরকারি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

কার্যাবলি

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার অন্যান্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী। আর এই অঞ্চলে তিনটি জেলার জন্য রয়েছে তিনটি আলাদা জেলা পরিষদ। নিম্নে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলি উল্লেখ করা হল-

১) স্থানীয় পুলিশ ও জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নতি সাধন।
২) শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তার এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।
৩) স্বাস্থ্য রক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
৪) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও এর বিকাশ সাধন। খেলাধুলার আয়োজন ও উন্নয়ন।
৫) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথার আলোকে তাদের মধ্যে বিরোধের বিচার ও মীমাংসা।
৬) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, স্থানীয় পর্যটনের উন্নয়ন, স্থানীয় শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার।

৭) কৃষি ও বন উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, পানি সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৮) পশুপালন ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন।
৯) সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান।
১০) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
১১) জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা দান।

আয়ের উৎস

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কিছু আয়ের উৎস রয়েছে। পরিষদের আয়ের উৎসের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত−

১) ভূমি ও দালানকোঠা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর।
২) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ
৪) রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল।
৫) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর, চিত্ত বিনোদনমূলক কর্মের উপর কর।
৬) যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি, সামাজিক বিচারের ফি।
৮) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ।
৯) মাছ ধরা ও লটারির উপর কর।
১২) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্র বা পাট্টা সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council of CHT)

পার্বত্য তিন জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২৭ মে থেকে এ আঞ্চলিক পরিষদ কার্যক্রম আরম্ভ করে। আঞ্চলিক পরিষদের উদ্দেশ্য হল এসব জেলার কার্যক্রম সমন্বয় তদারকি ও সাধন করা।

গঠন

মোট ২৫ সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয় ১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য, ৬ জন বাঙালি সদস্য, ২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মহিলা সদস্য, ১ জন বাঙালি মহিলা সদস্য এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩ জন চেয়ারম্যান নিয়ে। চেয়ারম্যান হবেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এবং তিনি মর্যাদার দিক দিয়ে প্রতিমন্ত্রীর সমান। ১২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্যের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা, ১ জন মুরং ও তনচৈংগা এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চক ও খিয়াং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৬ জন বাঙালি সদস্যের মধ্যে প্রতিটি পার্বত্য জেলা হতে ২ জন করে থাকবে। ২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যের মধ্যে ১ জন চাকমা এবং অপর জন অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বাঙালি মহিলা সদস্য তিন পার্বত্য জেলা বাঙালি মহিলাগণের মধ্য থেকে আসে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জেলা পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান দ্বারা পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত। অন্যদিকে জেলার চেয়ারম্যানবৃন্দ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। এ পরিষদের একজন নির্বাহী কর্মকর্তা রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ ৫ বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হয়।

কার্যাবলি

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ−

১) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও স্থানীয় পরিষদ সমুহের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা ।
২) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার তত্ত্বাবধান ও সমুন্নত রাখা।
৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড-এর কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান।
৫) পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়।
৬) জাতীয় শিল্প নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য অঞ্চলে ভারী শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান।
৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন।

আয়ের উৎস

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিভিন্ন উৎস হতে আয় করে থাকে। নিম্নোক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠিত হয়–

ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ।
খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।
গ) সরকারি ঋণ ও অনুদান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা।
চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ।
ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

প্রতি অর্থ বছর শুরু হবার পূর্বে পরিষদ ঐ বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী বা বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীর জন্যই পাবর্ত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পরিষদ এ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানীয় সরকার কাঠামোর তদারকি করে। তাছাড়াও প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। ১ জন চেয়ারম্যান, ৩০ জন সাধারণ সদস্য ও ৩ জন নারী সদস্য নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে এ পরিষদ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে প্রণীত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। এর সদস্য সংখ্যা ২৫ জন এবং মেয়াদ ৫ বছর। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তদারক করা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষা করা সহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ ও স্থানীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থেই এটি পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?
(ক) ২০০০ সালে (খ) ১৯৯৯ সালে (গ) ১৯৯৮ সালে (ঘ) ১৯৯৭ সালে

২। কোন্‌টি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা –
(i) পার্বত্য জেলা পরিষদ (ii) পার্বত্য ইউনিয়ন পরিষদ (iii) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

৩। কত সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যক্রম আরম্ভ করে?
(ক) ১৯৯৭ সালে (খ) ১৯৯৮ সালে (গ) ১৯৯৯ সালে (ঘ) ২০০০ সালে

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অধীন রয়েছে–
(i) পার্বত্য জেলা পরিষদ (ii) উপজেলা পরিষদ (iii) পৌরসভা
নিচের কোন্‌টি সঠিক
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) iv

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনগণের ভোট প্রদানের হার জাতীয় নির্বাচনের চেয়েও বেশি। এই নির্বাচনে ভোট দিয়ে মানুষ তাদের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জাতীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের থেকে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পার্থক্য হচ্ছে তাদেরকে মানুষ বেশি কাছে পায়। কারণ তারা স্থানীয় জনগণের কাছাকাছি থাকে। ফলে স্থানীয় নাগরিকরা তাদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর সত্যি।

ক) স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝায়?
খ) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কাঠামোটি লিখুন।
গ) ইউনিয়ন পরিষদ অধিক প্রতিনিধিত্বশীল- কেনো?
ঘ) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব লিখুন?

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বহু পূর্ব থেকে বিশেষ এলাকা হিসেবে পরিগণিত।

ক) কোন কোন জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত?
খ) পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার কি রকম?
গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি লিখুন।
ঘ) স্থানীয় সরকারের অংশ হিসাবে আঞ্চলিক পরিষদের গুরুত্ব লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১ : ১। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক

নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়
(Civic Problems and Our Duties)

ইউনিট ৯

প্রতিটি রাষ্ট্রকেই কম-বেশী নাগরিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। তবে উন্নত রাষ্ট্রের সঙ্গে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর প্রধান নাগরিক সমস্যার কিছু মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে অধিকাংশ নাগরিক সমস্যার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সুশাসনের অভাব। ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশ অসংখ্য নাগরিক সমস্যা মোকাবেলা করছে। সম্প্রতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ নাগরিক সমস্যা মোকাবেলায় বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। তবুও অতিরিক্ত জনসংখ্যা, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, যানজট, পয়ঃনিষ্কাসন প্রভৃতি সমস্যা বাংলাদেশের জনগণকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই ইউনিটে জনসংখ্যা সমস্যা, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণ ও তা প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-৯.১ জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রতিকার
(Population Problem and Its Remedy)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ঘনত্ব, পরিবার পরিকল্পনা, জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি। ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশে ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। বর্তমানে এ সংখ্যা আরো বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৩০০ জন বাস করে। ঘনবসতির দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের মধ্যেই অবস্থান করে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নলিখিত কারণ রয়েছে–

১. দারিদ্র্য

দারিদ্র্যের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। দরিদ্র পিতা-মাতা স্বভাবতই অধিক সন্তান দ্বারা পরিবারের আয় বৃদ্ধি করতে চায়। তারা চিন্তা করে অধিক সন্তান মানেই অধিক কর্মক্ষমতাও উপার্জন। উপরন্তু বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার জন্যও তারা অধিক সন্তান জন্ম দেয়। দারিদ্র্যের কারণে অনেক দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে না। বাংলাদেশে ধনিক ও মধ্য শ্রেণীর তুলনায় দরিদ্র বস্তি ও গ্রামীণ জনপদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

২. বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ

বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ ও একাধিক বিবাহ খুবই বেশি। এক দিকে সামাজিক পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতার অভাব, ইভটিজিং, যৌন হয়রানির ভয় এবং অন্যদিকে সন্তানকে অপরাধমুক্ত রাখার তাড়না থেকে পিতা-মাতা তাদের ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়। গ্রামাঞ্চলে এই প্রবণতা খুব বেশি । এতে করে দম্পতিরা অধিক সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য বেশি সময় পায়।

৩. নিরক্ষরতা

বাংলা*দেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪ অনুযায়ী* বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের ৩৫ শতাংশ মানুষ এখনো নিরক্ষর। শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতার জন্য এইসব মানুষ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে প্রায় অক্ষম। নিজের আয়, সামর্থ্য, সঙ্গতির সাথে সম্পর্ক রেখে সন্তান জন্মদানের বিষয়টি তারা নির্ধারণ করতে পারে না। এর ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে।

৪. পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা

বাংলাদেশে বহু পরিবার পুত্র সন্তান লাভের আশায়, উত্তরাধিকার নির্ধারণের স্বপ্নে অধিক সন্তান জন্ম দেয়। এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ, নতুন করে বিয়ে কিংবা বহু বিবাহের আশ্রয় নেয়। বহু বিবাহের ফলে এভাবেই জনসংখ্যা বেড়ে চলে।

৫. মৃত্যুহারহ্রাস

চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। আগের তুলনায় স্বাস্থ্য, রোগ ও পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা বেড়েছে। ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও, ডিপথোরিয়া, ডায়ারিয়াসহ বহু কঠিন রোগে মৃত্যুহার একেবারেই কমে গেছে। ১৯৭২ সালে হাজারে শিশু মৃত্যু হার ছিল ৩৪০ জন। ২০১৫ সালে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে তা ২৪-এ নেমে এসেছে। শিশু মৃত্যুহার কমলেও জন্মহার কমেনি। এটাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

৬. পরিবার পরিকল্পনার অভাব

স্বাধীনতার পরই বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা শুরু হলেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে এর সাফল্য খুব বেশী নয়। জন্ম শাসন সম্পর্কে দরিদ্র ও বস্তিবাসীর পরিষ্কার বোধ আসেনি। এতে করে গ্রামাঞ্চলে শহরের বস্তি এলাকায় এবং অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত পরিবেশে জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত। ‘একটি সন্তান কাম্য, দুটি সন্তান যথেষ্ট’ এই শ্লোগান গ্রামবাসী ও দরিদ্ররা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেনি। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে শিক্ষা সচেতনতা ও উদ্যোগের প্রয়োজন তা বাংলাদেশে অনুপস্থিত।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বিপুল পরিমাণ এ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে গুলো হল:

১. জনসংখ্যার পুন:বণ্টন

আমাদের দেশের সর্বত্র জনসংখ্যার অবস্থান এক রকম নয়। তাই যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করতে হবে। ফলে জনগণের কর্মসংস্থান হবে এবং জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

২. জনশক্তি রপ্তানি

বিপুল জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম শ্রমিকের প্রশিক্ষণ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও পশ্চিমের উন্নত দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়বে আর বেকারত্ব দূর হবে। এভাবে জনসংখ্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

৩. শিক্ষার প্রসার

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষিত নারী-পুরুষ নিজেরাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে দেয়।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উন্নত বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বাড়বে। ফলত দারিদ্র্য-যা কিনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ তা এমনিতেই কমে যাবে।

৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। তাঁরা বলেন, 'একটি সন্তান কাম্য দুটি যথেষ্ট' এ শ্লোগান বাংলাদেশে সামাজিকভাবে জনপ্রিয় করতে হবে।

৬. জনসংখ্যানীতি গ্রহণ

১৯৭৬ সালের জনসংখ্যানীতিকে আরও সংস্কার করে ২০০৪ সালে সরকার নতুন জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে। তবে তা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তেমন কোন ভূমিকা রাখছে না। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর গণচীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল। বাংলাদেশ সরকারকেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সেবা বঞ্চিত এলাকাসমূহে সেবার মান উন্নত করতে হবে। গরিব ও দুস্থদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্ধুদ্ধ করতে হবে।

নানাবিধ কারণেই বাংলাদেশে জনসংখ্যা অতি বৃদ্ধি ঘটছে। তাই জনসংখ্যার এ বিস্ফোরণ হ্রাসে জনগণ এবং সরকার উভয় পক্ষের আরো সচেতন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা , পরিবার পরিকল্পনার অভাব, বাল্যবিবাহ, চিকিৎসা, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই রাষ্ট্রে সরকারি কার্যকর উদ্যোগ, শিক্ষার প্রসার সর্বোপরি পরিবার পরিকল্পনার প্রসার জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে ভূমিকা রাখতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশ সর্বশেষ জনসংখ্যানীতি গ্রহণ করে কোন্ সালে?

ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৮ গ. ২০০৪ ঘ. ২০১৪

২। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার কত?

ক. ৬৫ শতাংশ খ. ৪৫ শতাংশ গ.৩৫ শতাংশ ঘ. কোনটি নয়

পাঠ-৯.২ খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শর্ত, খাদ্য সম্মেলন, শারীরিক, পর্যাপ্ত, হুমকি, জলবায়ু পরিবর্তন, উদ্বাস্তু

খাদ্য নিরাপত্তা হল স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য সব সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। বাংলাদেশে জাতীয় খাদ্য নীতিতে (২০০৬) খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি শর্ত হল: খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও খাদ্য ভোগ। সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রশ্নে সবক'টি শর্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭০ এর দশকে জাতিসংঘ প্রথম খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত হয় বৈশ্বিক খাদ্য সম্মেলন (world food summit)।
পরবর্তীতে জাতিসংঘ ১৯৮০'র দশকে খাদ্য নিরাপত্তা বিশ্লেষণে তিনটি সূচকের কথা বলে। এগুলো হল- খাদ্যের পর্যাপ্ততা (availability of food) খাদ্য প্রাপ্তি (access to food) এবং খাদ্য বাজারের স্থিতিশীলতা (stability of food market)। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত খাদ্য নিরাপত্তা নীতিতে স্বাক্ষর করে।
১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে খাদ্য নিরাপত্তার সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ও বিশ্বস্বীকৃত সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়। কিছুটা পরিবর্তনও আনা হয় পূর্ববর্তী ধারণায়। নতুন ধারণায় বলা হয়, 'খাদ্য নিরাপত্তা তখনই থাকবে, যখন সব মানুষ সবসময় শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ, পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করতে পারবে। যে খাবার শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি মানুষকে কর্মক্ষম ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী করবে।' ওপরের সংজ্ঞাটি খাদ্য নিরাপত্তার চারটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা তুলে ধরেছে। প্রথমত, খাদ্যর সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সামাজিক ও শারীরিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকতে হবে। তৃতীয়ত, খাদ্যের উপযুক্ত ব্যবহার হতে হবে। চতুর্থত, উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের স্থিতিশীলতা থাকতে হবে। বাংলাদেশের মতো দেশে খাদ্য নিরাপত্তা যাচাই করার জন্য এ চারটি মাত্রা ব্যবহার করা জরুরি। বস্তুত খাদ্যে নিরাপত্তাকে তিনটি প্রধান বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করে আলোচনা করা হয়। আর এগুলো হল-

খাদ্যের পর্যাপ্ততা (food availability), খাদ্য প্রবেশাধিকার (excess to food) এবং পুষ্টি ও ভোগ (utilization and nutrition)। খাদ্যের পর্যাপ্ততা বলতে বুঝায় খাদ্যের প্রচুর উৎপাদন ও বাজারে খাদ্যের ব্যাপক উপস্থিতি। এটি দু'ভাবে অর্জিত হয়: প্রথমত, দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে দ্বিতীয়ত, আমদানী কিংবা বৈদেশিক খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে। খাদ্য প্রবেশাধিকার মানে খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা বা খাদ্য প্রাপ্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি। অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যের প্রচুর সরবারাহ সত্ত্বেও অর্থের অভাবে জনগণের একটি বড় অংশ খাদ্য না পেতে পারে। বাংলাদেশে ৩০ ভাগ মানুষ কিংবা আফ্রিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর নির্মম উদাহরণ। এজন্য খাদ্য নিরাপত্তার একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্যক্তির খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা। অন্যদিকে, পুষ্টি ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ ও সুষম বিন্যাসের উপরই নির্ভর করে।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার চালচিত্র

গত চার দশকে দারিদ্র্য অর্ধেক কমলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে উচ্চ জন্মহারের কারণে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিচারে ভারত ও চীনের পর বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ। সঙ্গতকারণেই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা চরম অনিশ্চিত। পুষ্টিহীনতার বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম। প্রসূতি মা ও শিশু মৃত্যুর হার এখনও বেশি। বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। এ কারণে বাংলাদেশের পক্ষে নতুন করে কৃষি জমি বাড়ানো সম্ভব নয়। কেবল উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার কওে উৎপাদন বৃদ্ধি করেতে হবে।

বাংলদেশের প্রায় ৭০ ভাগ ভূমি সেচের আওতাভূক্ত। সেচ সুবিধার কল্যাণেই বরো ধানের (প্রধান শস্য) উৎপাদন বাড়ছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা আর ভূ-গর্ভস্থ পানি দেশের সেচের অন্যমত উৎস। চীন-ভারত এ অববাহিকায় প্রায় দুই শত বাঁধ তৈরী করে পানি তুলে নেবার পরিকল্পনা করছে। আবার বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। এ দুটি বিষয়ের কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পানি চাহিদা ও সেচ ব্যবস্থা চরম হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেজ্ঞরা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের হাজার হাজার হেক্টর কৃষি জমি লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এসব জমি এখন কৃষি ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জাতিসংঘের হিসাব মতে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১ কোটি। সঙ্গত কারণেই চরম হুমকির মুখে পড়বে উদ্বাস্তু এ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

খাদ্যনিরাপত্তার তিনটি শর্ত হলঃ খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা ও খাদ্য ভোগ। প্রত্যেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ অর্থে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বলতে বুঝায়

ক. খাদ্য ভোগের ক্ষমতা খ. খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা গ. খাদ্যের পর্যপ্ততা ঘ. কোনটি নয়

২। বাংলদেশের কত ভাগ ভূমি সেচের আওতাভূক্ত?

ক.৭০ ভাগ খ. ৮০ ভাগ গ. ৯০ ভাগ ঘ. শতভাগ

পাঠ-৯.৩ সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার (Terrorism: Causes and Remedies)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে সন্ত্রাস, এর কারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সন্ত্রাস দমনের বা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন বিরোধী, সামাজিকীকরণ, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, উচ্ছৃঙ্খল, নীতিহীন, প্রতিকূল

সন্ত্রাস হল অন্যায় বল প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈধ পন্থায় ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আদায়। শারীরিক বা অস্ত্রের শক্তি, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি দিয়ে জবরদস্তি করে অন্যায়ভাবে কিছু সমাধা করা, আদায় করা, অন্যের সম্পদ দখল করা, ছিনতাই করা, লুট করা হল সন্ত্রাস। অর্থাৎ সন্ত্রাস মানেই হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ। এটি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নির্যাতনকারী। সন্ত্রাস- পেশী শক্তি, অন্যায় আচরণ ও জোর যার মূল্লুক তার নীতির মত। সন্ত্রাস সমাজ, জাতি, দেশ, রাষ্ট্র ও সভ্য মানব সমাজের শত্রু।

সন্ত্রাসের উৎস ও কারণ

সন্ত্রাসের মতো গুরুতর অপরাধের উৎস বহুমুখী। নিম্নে সন্ত্রাসের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১. অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থ

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অর্থ ও সম্পদের প্রবাহ অনিশ্চিত ও অস্থির। অনুন্নত দেশের সীমিত সম্পদ অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাহিদাপূরণ করতে পারে না। ফলে এসব জনপদে জোরপূর্বক অপরের সম্পদ দখলে নেবার অবস্থা তৈরি হয়। সমাজে যে কোন মূল্যে আইন-কানুন লঙ্ঘন করে হলেও অর্থ-সম্পদ দখলের সংস্কৃতি গড়ে উঠে।

২. পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব

ভুল সামাজিকীকরণের ফলে শিশু বা কিশোরের মনে সন্ত্রাস বিকশিত হতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশে যখন শিশু বড় হয়ে উঠে, যখন নৈতিকতা, নিয়ম-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করে না, তখন সন্ত্রাসের পথে পা বাড়াতে তার দ্বিধা হয় না। সহজেই সন্ত্রাসকে সে জীবিকার্জনের, সম্পদ দখলের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। পারিবারিক প্রভাবও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা সন্ত্রাসীর ছেলে-মেয়ের সন্ত্রাসী হবার সম্ভাবনা থাকে। অপরাধীর সন্তানরা সন্ত্রাসী হবেই সেটি ঠিক নয়; তবে সন্ত্রাসী পরিবারের একটি শিশুকে সহজেই সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসীর জন্ম এভাবে হয়ে থাকে।

৩. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হতে মুক্তি পেতে বহু লোক সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। এছাড়া বেকারত্ব এবং বঞ্চনাও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বেকার থাকলে, বঞ্চিত হলে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দিকে এগিয়ে মানুষ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়ে।

৪. সামাজিক দুর্বলতা ও নৈতিক শিক্ষার অভাব

পরিবারের ভাঙ্গন, অসুস্থ সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষার অভাব সন্ত্রাস বৃদ্ধির জন্য দায়ী। যখন সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ, মমতা থাকে না, যখন পিতা-মাতা সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ম-নীতিহীন কাজে ব্যস্ত থাকে, সেই পরিবারের সন্তানরা আইনকে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠে না। অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বস্তির জীবন মানুষের দেহ

ও মনের উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। এগুলো মানুষের মধ্যে, হিংসা, নীতিহীনতা, অসভ্যতা, মস্তানী ইত্যাদি জন্ম দেয়। বাংলাদেশে প্রতিকূল সামাজিক অবস্থা, সুন্দর জীবনবোধ ও নৈতিকতার অভাব সন্ত্রাসের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায়-

১. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ
২. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধকরণ
৩. নৈতিক শিক্ষার প্রসার
৪. ঝড়ে পড়া শিশু ও কিশোরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন
৬. সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিয়মিত সাড়াশী অভিযান পরিচালনা
৭. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালান বন্ধকরণ
৮. ছেলে-মেয়েদেরকে পারিবারিকভাবে আরও সময় দেয়া

শিক্ষার্থীর কাজ	পারিবারিক সন্ত্রাস কীভাবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে?

সারসংক্ষেপ

সন্ত্রাস বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক ও নাগরিক সমস্যা। কেউ সন্ত্রাসী হয়ে জন্ম নেয় না; পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, সামাজিকীকরণ, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে। কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব নয়। এ জন্য দরকার নৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তির সুষ্ঠু বিকাশের নিশ্চয়তা। সুন্দর কর্মক্ষেত্রের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এবং সন্ত্রাসীদের দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে বিচারের আওতায় আনলে সন্ত্রাস অনেকখানি দূর হবে বলে আশা রাখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্‌টি সত্য নয়?
ক. সন্ত্রাস বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যা
খ. সন্ত্রাস দূর করতে দরকার নৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ
গ. সন্ত্রাসীর সন্তান অবশ্যই অপরাধী হবে
ঘ. দারিদ্র্যের সঙ্গে সন্ত্রাসের সম্পর্ক রয়েছে

২। সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় নয় কোন্‌টি ?
ক. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালান বন্ধকরণ
খ. পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন
গ. ঝড়ে পড়া শিশু ও কিশোরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
ঘ. বস্তি উচ্ছেদ

পাঠ-৯.৪ পরিবেশগত বিপর্যয় (Environmental Degradation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশগত বিপর্যয় কী জানতে পারবেন।
- পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণগুলো সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- পরিবেশগত বিপর্যয়ের ক্ষতিকর দিকগুলো কী বুঝতে পারবেন।
- পরিবেশগত বিপর্যয় প্রতিরোধে করণীয় জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অপরিকল্পিত, রাসায়নিক, দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, সমষ্টিগত, বর্জ্য শোধনাগার

আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যা কিছু আছে তাই পরিবেশ। অর্থাৎ আমাদের চার পাশের ঘরবাড়ি, দালান কোটা, নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ প্রধানত প্রাকৃতি পরিবেশ ও কৃত্রিম পরিবেশ। জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের তাগিদে মানুষ প্রতিনিয়ত পরিবেশের পরিবর্তন কওে যাচ্ছে। যার বেশির ভাগই প্রাকৃতি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হলেই পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণ

অপরিকল্পিত শিল্পায়ন: যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা তৈরির ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। এসব শিল্প কারখানার বর্জ্য, বাসায়নিক মিশ্রিত পানি ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্য মাটিতে ও পানিতে মিশে পরিবেশ দূষণ করছে। বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্প কারখানার বর্জ্য পরিশোধনের জন্য বর্জ্য শোধনাগার (Effluent Treatment Plant) কম থাকে। ফলে এসব শিল্প কারখানার বর্জ্য আশে-পাশের নদী-নালা খাল-বিলে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের মারাত্নক বিপর্যয় ঘটায়। যেমন- ঢাকার চার পাশের তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গার নদীর পানি খুব দূষিত। পরিবেশের বিপর্যয় এক অর্থে মানব জীবনেরই বিপর্যয়।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার: অধিক জনসংখ্যার জন্য অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতে হয়। ফলে কৃষিতে বাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এসব সার ও কীটনাশক মাটি ও ফসলি জমির পানিকে দূষিত করে। সে পানি অনেক সময় নালা দিয়ে নদীর পানিকেও দূষিত করে। এ কারণে নদী-নালা ও জলাশয়ে প্রায়ই মাছ মরে ভেসে থাকতে দেখা যায়। শিল্পাঞ্চলের পাশ্ববর্তী জলাশয় ও নদীতে বর্তমানে মাছ নেই বললেই চলে।

বনভূমি ধ্বংস

রান্নার ও ইট ভাটার জন্য জ্বালানী হিসাবে, ভবন নির্মাণে দরজা- জানালার জন্য ও ঘরের আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যাপকহারে কাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে কোন দেশের ভূ-খন্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ২৫ শতাংশ বনভূমি আর থাকছে না। বাংলাদেশে মাত্র ৯ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বাতাসে দূষিত গ্যাসের (কাবর্ন-ডাই অক্সাইড) পরিমাণ বাড়ছে।

মরণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার

বিভিন্ন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ সংঘাতও পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়। কেননা আধিপত্য বিস্তার করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের মরণাস্ত্র তৈরি করে এবং তা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করে। যেমন ক্লাস্টার বোমা, পারমাণবিক বোমা। পারমাণবিক বোমার ব্যবহারের ভয়াবহতার কথা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসিকি শহরের বিস্ফোরণ থেকে জানা যায়।

অবকাঠামো তৈরি

অধিক হারে রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি, বিল্ডিং, রেললাইন তৈরির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার

আধুনিকতার অনুষঙ্গ হিসেবে প্লাস্টিকের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন- পলিথিন ব্যাগ, গৃহস্থালির আসবাবপত্র হিসেবে প্লাস্টিক সামগ্রী খুব জনপ্রিয়। কিন্তু এটি সহজে মাটির সাথে মিশ্রিত না হওয়ায় পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে।

এছাড়াও খাল-বিল ও জলাশয় ভরাট, মানুষের অধিক গতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

ক্ষতিকর দিক

বর্তমান মাত্রায় পরিবেশ দূষিত হতে থাকলে পরিবেশ বিপর্যয় মানুষের জীবনের চরম ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। বিশেষ করে-

ক. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে।

খ. ক্যান্সার, স্নায়ুরোগ, চর্মরোগ, হরমোনজনিত রোগসহ নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. বায়ুমন্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণ কমে পাচ্ছে এবং দূষিত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যাসহ নানা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘ. জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপচে পড়া লবণাক্ত পানি দেশের নিম্নাঞ্চলের বসত বাড়ি, ফসলি জমি ও মানুষের জীবন সংকটে পড়ছে।

ঙ. খাদ্যের প্রাকৃতিক উৎস কমে পাচ্ছে। ফলে আফ্রিকার মত দেশগুলোতে খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করছে।

চ. মরণাস্ত্র, শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত গ্যাস এর তেজস্ক্রিয়ায় শারিরীক ও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে।

পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবেলায় সমষ্টিগত উদ্যোগ:

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত। স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের ফলে বাংলাদেশের জন্য এইসব সমস্যা বিরাট বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। তাই বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ জরুরি। এমন সব পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা হলঃ-

১) সঠিক পরিকল্পনাহীন শিল্প ও কলকারখানা আইন করে বন্ধ করতে হবে।

২) শিল্প শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

৩) পরিবেশ দূষণকারী শিল্পগুলো চিহ্নিত করে যে গুলো পরিবেশের সর্বাধিক ক্ষতি করছে সেগুলো বন্ধ ঘোষণা করা।

৪) আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেয়া।

৫) বৃক্ষরোপণ আন্দোলন জোরদার করা এবং বৃহৎ বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৬) সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করা এবং সকলকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

৭) যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।

৮) পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্যের ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা।

৯) পাহাড় কাটা বন্ধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া।

১০) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং জৈব সার ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা।

১১) জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয়

পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিক হিসেবে আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বিনা প্রয়োজনে গাছ না কাটা, পলিথিনের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা, গৃহস্থালির ময়লা আর্বজনার সঠিক ব্যবস্থাপনার কাজগুলো সহজেই করা যায়। নিজে বৃক্ষরোপণ করা এবং অন্যকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা। কৃষি জমিতে রাসায়নিকের পরিবর্তে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ

করা। বিস্তৃত পরিসরে গৃহনির্মাণ না করে উচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করা যেতে পারে। এছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে আমরা সচেতন হয়ে কাজ করলে পরিবেশ বিপর্যয় অনেকটাই কমানো সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার চারপাশে কি ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে? বর্ণনা করুন।

সার-সংক্ষেপ

আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সবকিছু নিয়ে আমাদের পরিবেশ। মাটি, বায়ু, পানি, গাছপালা ইত্যাদি পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিল্পায়ন, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, বর্ধিত খাদ্য ও বাসস্থান চাহিদা প্রভৃতির কারণে পরিবেশের উপাদানগুলো নষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশগত দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবেলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোন্‌টি পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণ?
ক) বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে যাওয়া খ) জলাশয় অধিগ্রহণ গ) দূষণ ঘ) সবগুলো।

২। পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য-
i) অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা বন্ধ করতে হবে।
ii) ব্যাপক আকারে বনায়ন কর্মসূচী হাতে নিতে হবে।
iii) জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে
iv) জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i+ iii খ) iii+ii +i গ) ii + iv ঘ) সবকটি।

পাঠ-৯.৫ নিরক্ষরতা (Illiteracy)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরক্ষরতা কী বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নিরক্ষরতা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবেন।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অক্ষর জ্ঞান, দরিদ্র, বৃত্তি, বয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষা ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থা,

নিরক্ষরতা একটি জাতীয় সমস্যা। এটি একটি জাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ। নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের উপকার করার চেয়ে বরং বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিরক্ষরতা হল অক্ষর জ্ঞান না থাকা অর্থাৎ নিরক্ষরতা বলতে একজন ব্যক্তির সেই অবস্থাকে বোঝায় যার কোন অক্ষর জ্ঞান নেই, এমনকি যিনি তার নামটিও লিখতে পারেন না। বাংলাদেশের গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর।

নিরক্ষরতা পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৯৯৭ সাল থেকে স্বাক্ষরতা আন্দোলন শুরু হয়। সম্পূর্ণ স্বাক্ষরতা আন্দলনের প্রতিপাদ্য হল দেশ থেকে নিরক্ষরতা সমূলে দুর করা। বাংলাদেশে ৭ বছর থেকে উর্ধ্বে স্বাক্ষরতার হার ৫৭.৫৩% এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে এর হার হচ্ছে যথাক্রমে ৬০.১৫% এবং ৫৪.৮৪%। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরতার হার খুবই বেশি। মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অনেক দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারছে না। বর্তমানে বহু দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী অর্থের অভাবে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারছে না। অভাব-অনটনের মধ্যেও এস. এস. সিতে ভাল ফলাফল করেছে এমন মেধাবীদেরকে আবার বিভিন্ন ব্যক্তি, বেসরকারি ব্যাংক ও বৃত্তি প্রদানকারী ফান্ড অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের লেখাপড়ায় সহায়তা করছে। আশার কথা হল, বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার দিন দিন কমছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। ফলে নিরক্ষর সমাজ কখনোই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, উন্নতির শিখরে পৌছতে পারে না। কিন্তু একটি জাতিকে শিক্ষিত করা ও নিরক্ষতা দূর করা খুব কষ্টসাধ্য কাজ। শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো বিষয় গুলো রাষ্ট্র নিশ্চিত করে থাকলের রাষ্ট্রের একার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তাই এ বিষয়ে সরকার ও নাগরিকের সমষ্টিগত উদ্যোগ জরুরি। ইউনেস্কোর ২০১৫ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার ৬১.৫%। অর্থাৎ বিশাল জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর। তাই এ বিষয়ে দ্রুত পরিকল্পিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সরকার ও নাগরিকগণ যে সব পদক্ষেপ নিতে পারে তা হল:-

ক) সঠিক পরিসংখ্যান

নিরক্ষর জনগণের সংখ্যা বয়স, অঞ্চল, নারী-পুরুষভেদে বিভিন্ন রকম হয়। এসব অবস্থা বিবেচনায় রেখে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। তাই নিরক্ষর জনগণের সার্বিক ও সঠিক তথ্য জানা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

খ) জনসচেতনতা বৃদ্ধি

জনগণকে শিক্ষার সুফল ও নিরক্ষরতার কুফল সম্পর্কে জানতে হবে। তাদেরকে শিক্ষামুখী করার জন্যে প্রচারণা চালাতে হবে।

গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

সরকারকে গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। এ জন্য যথাযথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত বেকারদের কাজে লাগানো যেতে পারে।

ঘ) কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা

কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে। পেশাগত শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

ঘ) বয়স্ক শিক্ষা চালুকরণ

বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা যায়।

ঙ) অনুদান ও শিক্ষা ঋণ চালুকরণ

নিরক্ষরতা দুর করার জন্য বৃত্তিমুলক শিক্ষা চালু করা যায়। তাছাড়া অনুদান, শিক্ষাঋণ প্রভৃতির দ্বারা লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করা যায়। তাই সমাজের বিত্তবানদের এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

চ) শিক্ষা ব্যাংক চালুকরণ

শিক্ষা ব্যাংক চালুর করে নিরক্ষরদের ঋণ দানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা যাবে। ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ ব্যাংক কাজ করতে পারে।

ছ) নাগরিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্য সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা উপরকণ বিতরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। বেশ কিছু এনজিও যেমন– ব্র্যাক, প্রশিকা, ইউসেপ, সিডা, কেয়ার, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে "স্বনির্ভর বাংলাদেশ" নামে এনজিওটি ৫৭০ টি গ্রামকে নিরক্ষরমুক্ত করেছে। এভাবে সরকার ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হলে জাতীয় অগ্রগতি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে নিরক্ষর মানুষ পেশাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত হবে।

ব্যক্তিগতভাবে হোক বা সমষ্টিগতভাবে হোক নিরক্ষরতা দূরীকরণে নাগরিকদেরকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণে ভূমিকা পালন করতে পারি। জাতির মেরুদণ্ডকে আরও বিকশিত করতে হবে এবং শক্তিশালী ও উন্নত জাতি গঠন করতে নাগরিকদের আরও তৎপর হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিরক্ষরতা দূরীকরণে বেসরকারি পর্যায়ে করণীয় কি কি?

সারসংক্ষেপ

নিরক্ষরতা জাতির জন্য অভিশাপ। নিরক্ষরতা বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। দরিদ্রতার কারণে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। ফলে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশি। এছাড়া সচেতনতার অভাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, বৃত্তির অভাবের কারণে জনগোষ্ঠী নিরক্ষর থাকে। নিরক্ষরতা দূরীভূত করা সরকারের দায়িত্ব। বর্তমানে সরকার ও নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশে নিরক্ষরতা কমে শিক্ষার হার বাড়ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে নিরক্ষরতা হার বেশি, কারণ
ক) নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থা খ) জমির অভাব গ) শিল্পায়নের অভাব ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব

২। -------- মাধ্যমে নিরক্ষরতা ও বেকারত্ব উভয়ই দূর করা সম্ভব।
ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খ) পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা
গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ঘ) ক + খ

পাঠ-৯.৬ নারী নির্যাতন ঃ কারণ ও প্রতিকার
(Violence against Women: Causes and Remedies)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নারী নির্যাতন কী বলতে পারবেন।
- নারী নির্যাতন এর কারণগুলো চিহ্নিত হবে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বেইজিং ঘোষণা, পুরুষতান্ত্রিক, ধর্মান্ধতা, পরাধীনতা, সচেতনতা

নারী সমাজের বিরুদ্ধে সামাজিক, রাজনৈতিক ও শারীরিক যে কোন পদক্ষেপই নারী নির্যাতনের আওতাভুক্ত। বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যে কোন কাজ বা আচরণকে বোঝায় যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয়। যা নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন করে। তাছাড়া কোন ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালীভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণ নারী নির্যাতনের আওতাভুক্ত।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ

সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার সুরক্ষায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তারপরও সমাজে নারী নির্যাতন ঘটতে দেখা যায়। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের নিম্নলিখিত কারণ লক্ষ্যণীয়-

ক) পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা

আমাদের সমাজে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা সব সময় অবলা বলে বিবেচিত হয় এবং নির্যাতিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক এ ব্যবস্থা কখনো নারীর অধিকারকে স্বীকার করে না বরং নারীদেরকে অধিনস্ত করে রাখে। বাংলাদেশের একই অবস্থা এবং নারীরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত।

খ) অর্থনৈতিক পরাধীনতা

সমাজে এবং পরিবারে উভয় ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান শক্তিশালী করার মোক্ষম হাতিয়ার হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে নারীরা আত্মনির্ভরশীল হয়। অথচ আমাদের দেশে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পিতা, স্বামী কিংবা পরিবারে অন্য পুরুষ সদস্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল।

গ) ধর্মীয় গোঁড়ামি

ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে নারীরা নির্যাতিত হয়। অনেক সময় সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে গ্রাম্য সালিশে ফতোয়া জারি করে নারীদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়।

ঘ) দারিদ্রতা

দারিদ্রতা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। দরিদ্র পরিবারের নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনবোধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থেকে অন্ধকারে থাকে এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালায়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে-

নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা

প্রথমত ভাবতে হবে নারী একজন মানুষ। তারও কিছু মানবাধিকার রয়েছে। নারীর উপর যেসব নির্যাতন হয় তার অধিকাংশই কোন মানুষের উপর করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমত নারীকে যদি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে নারী অনেক পাশবিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ

বিদ্যমান আইনের যথাযথ ও কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব। তাই সরকারের গুরু দায়িত্ব হল বিদ্যমান আইনের দুর্বলতা গুলো খোঁজে বের করে তা আরও শক্তিশালী করা। প্রয়োজনে নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করতে হবে।

পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি

নারীর প্রতি মানবিক হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ে বিশেষ আলোচনা উপস্থাপন করতে হবে। স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলোতে নারী নির্যাতন বিরোধী লেখা উপস্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে তোলা

নারীর অধিকার আদায়ের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংগঠিত আন্দোলন। তাছড়া নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। নারীদেরকে অধিকার সম্পর্কে অবহিত করে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

আইনী সহায়তা প্রদান

নির্যাতিত নারীদের আইনী সহায়তা সহজলভ্য করতে হবে। তাছাড়া ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

নাগরিক হিসাবে আমাদের করণীয়

নারীরাও যে মানুষ এবং তারা পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ব্যাক্তি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সমষ্টিগতভাবে নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। নারীদের সৃজনশীল কর্মকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের চিন্তা, বিবেক ও কর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নাগরিকদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কেবল আইন প্রয়োগ করে কী নারী নির্যাতন প্রতিকার করা সম্ভব? যুক্তি দিন।

সারসংক্ষেপ

নারী নির্যাতন আমাদের সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধি। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রধান কারণ হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি। তাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দুর করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ কি?

ক) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ খ) ধর্মীয় অন্ধতা গ) অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ঘ) ক+খ +গ

২। নারী নির্যাতন বন্ধে

i) আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

ii) নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

iii) পুরুষদের মনস্বত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

iv) নারীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

কোন্টি সঠিক

ক) i+ ii +iii খ) iv গ) ii + iv ঘ) সবগুলো।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাবেয়া রসূলপুর গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে। দরিদ্রতার কারণে তার বাবা তাকে ১৪ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু তার স্বামী কর্মঠ ছিল না। সে সব সময় রাবেয়াকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলত এবং চাপ দিত। টাকা না আনতে পারলে প্রচন্ড শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। এ অবস্থায় রাবেয়ার বাবা আইনের দারস্থ হয়। রাবেয়ার প্রতি নির্যাতন বন্ধ হয়।

ক) বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত ভাগ নারী?
খ) বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণগুলো কি কি?
গ) আলোচ্য উদ্দিপক নারী নির্যাতনের কোন হাতিয়াটিকে নির্দেশ করছে।
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে নাগরিকদের করণীয়গুলো আলোচনা করুন।

২। তালেবান একটি ইসলামী চরমপন্থী সংগঠন। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে এর বেশ প্রভাব রয়েছে। ২০১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে তালেবানের হামলায় পেশোয়ারের একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীসহ ১৬২ জন নিহত হয়। পরবর্তীতে সেনা অভিযানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী শতাধিক জঙ্গিকে হত্যা করে এবং অনেককে ফাঁসি দেয়।

ক) সন্ত্রাস কী?
খ) সন্ত্রাসী কার্যকমের পাঁচটি উদাহরণ দিন।
গ) আলোচ্য উদ্দিপকে তালেবানরা কি ধরণের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে?
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে সন্ত্রাস নির্মূলে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬ : ১। ঘ ২। ঘ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা
(Civic Spirit to the Emergence of Bangladesh)

ইউনিট
১০

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ভাষা আন্দোলন হলো– ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ থেকে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপান্তর ও বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ। দীর্ঘ দু'শো বছর ইংরেজ শাসন ও শোষণের পর ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাংলা অঞ্চল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কলকাতাসহ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ভারতের অধীনে এবং ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রটি বেশি দিন অখণ্ড থাকতে পারেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের অধিক ভৌগোলিক ব্যবধান নিয়ে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষী নেতা। সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি ছিল না। তারা শুধু এ দেশকে শোষণ করতে চেয়েছিল পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০% মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য এ অঞ্চলের জনমনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ফলে শুরু থেকেই স্বাধিকারের প্রশ্নে এই অঞ্চলের জনগণকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রথমেই প্রতিবাদ মুখর হলো বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ। তারা এই অন্যায় বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠে। **১৯৫২** সালের **২১** ফেব্রুয়ারি পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে। রক্তের বিনিময়ে পূর্ববাংলা অর্জন করে ভাষার অধিকার। তথাপি পূর্বাঞ্চলের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতির কোনো পরিবর্তন হয় নি। ফলে পূর্ববাংলায় আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। এরই পথ ধরে দানা বাঁধে ছয় দফা ও এগার দফার আন্দোলন। পরিণতিতে সংঘটিত হয় **১৯৬৯**-এর গণ-অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র পূর্বপাকিস্তানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-১০.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাঙালি সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয়, শোষণ, নির্যাতন, বৈষম্য, জাতীয়তাবাদ, বৈদেশিক মুদ্রা

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আর দাঙ্গার রক্তক্ষয়ী পটভূমিতে ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হয় ভারতবর্ষ। বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয় ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন একটি রাষ্ট্র- পাকিস্তান। ঔপনিবেশিক বিভক্তির রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমানের লাখো রক্তাক্ত লাশ আর বাস্তুচ্যুতির অতিদীর্ঘ মিছিল পাকিস্তানের এই 'আচমকা অভ্যুদয়' অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রে অচিরেই বাঙ্গালি নিজেকে নিপীড়িত-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। বাঙ্গালির স্বপ্ন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামোতে পূর্ব বাংলা কেবল অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হয়নি। বাঙ্গালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও হরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নীতি অবলম্বন করে। আর এসব বৈষম্যমূলক নীতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি হিসাবে কাজ করে। নিম্নে তা আলেচনা করা হল-

(ক) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা বরাবরই ভয়াবহ রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদেই নিয়োগ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান হতে। ১৯৪৭-৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার এবং তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। পাকিস্তানের রাজধানীও প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। পরে আইয়ুব খান রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেন। পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসন ক্ষমতায়। পূর্ব বাংলার জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হকসহ কেন্দ্র জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যাসাম্য নীতি মানতে বাধ্য করা হয়।

(খ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে পূর্ব বাংলার জনগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রটিতে শুরু থেকেই বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সামাজিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালিকে 'খর্বাকার', 'অর্ধ-মুসলমান', 'হিন্দু-ঘেঁষা মুসলমান' প্রভৃতি বলে অপমান ও হেয় করত। তারা নিজেদের তথাকথিত যোদ্ধা জাতি হিসাবে প্রচার করে বাঙ্গালিকে 'ভীতু' বলে অবজ্ঞা করত। পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রভুসুলভ মনোভাব আর অহংকারে বাঙ্গালিদের সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র সৃষ্টির স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তারা অচিরেই বুঝতে পারে ধর্ম জাতি গঠনের একটি উপাদান হলেও কেবল ধর্মের ভিত্তিতে জাতি বা রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। জাতি গঠনের জন্য ভাষা, ঐতিহ্য, ইতিহাস সংস্কৃতির মিল থাকতে হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করা ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালি সংস্কৃতির উপর নীপিড়ন চালিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম আঘাত আসে বাংলা ভাষার উপর। বাংলা ভাষাকে তারা উর্দুর মতো আরবী হরফে লেখার ষড়যন্ত্র করেছিলো। পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষ ছিল বাঙ্গালি অন্যদিকে উর্দু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিলো মাত্র ৭ ভাগ। তবু বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানী শাসক ঘোষ্ঠী। বাংলার জনগণ শেষ পর্যন্ত বুকের রক্ত দিয়ে ১৯৫২ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

(গ) অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানের দু'অংশে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল অত্যন্ত প্রকট। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অর্থ পাচার হত অবাধে। পশ্চিম পাকিস্তানে যেসব শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে তার বেশির ভাগের অর্থ আসত পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে। বৈদেশিক মুদ্রার তিন ভাগের দু'ভাগ অর্জিত হত পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে। আর এই অর্থ ব্যয় করত পশ্চিম পাকিস্তান। বৈদেশিক ঋণের শতকরা ৯০ থেকে ৮৫ ভাগ ব্যয় করত পশ্চিম পাকিস্তান আর বাকি ১০ থেকে ১৫ ভাগ খরচ করত পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে বাস

করত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোক, অথচ এই অঞ্চলে ব্যয় করা হত উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ।

(ঘ) সামরিক- প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙ্গালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিলো অত্যন্ত নগন্য। **১৯৬৫** সাল পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙ্গালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিলো যথাক্রমে ৫%, ১০% ও ১৬%। প্রশাসনিক বিভাগের বিভিন্ন স্তরে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। সকল বিভাগের সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রিয় সরকারের কর্মচারিদের মধ্যে ৮৪% ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি এবং ১৬% ছিল বাঙালি। বিদেশে পাকিস্তানের মিশনগুলোতেও এ বৈষম্য কার্যকর ছিলো। বিদেশী মিশনগুলোতে ৮৫ ভাগ কর্মচারী ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিম শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে উপনিবেশ হিসাবে বিবেচনা করতে থাকে। তারা এ অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক অধিকার হরণ করে সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাতা করে। তবে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এ আধিপত্যকে মেনে নেয়নি। মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালি প্রথম সংঘটিতভাবে পশ্চিমা চক্রান্ত শোষনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অবশেষে চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে **১৯৭১** সালে প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পাকিস্তানের উদ্ভবের ভিত্তি কী?

ক. সংস্কৃতি খ. সশস্ত্র যুদ্ধ গ. ধর্ম ঘ. ভূ-খন্ডগত ঐক্য

২। পাকিস্তানের কত ভাগ মানুষ ছিল বাঙালি?

ক. ৫৬ খ. ৫৫ গ. ৪৭ ঘ. ৪৫

পাঠ-১০.২ পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পাকিস্তানে মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নাম ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দমননীতি, সশস্ত্র, কোন্দল, স্বার্থ, আদর্শ, নেতাকর্মী, সংগঠন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল মুসলিম লীগ। ১৯৪৬ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় অভাবনীয় বিজয় লাভ করে। পূর্ব বাংলার জনগণ তখন মুসলিম লীগকে প্রাণের সংগঠন মনে করত। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ বাঙ্গালির অধিকার আদায়ে উদাসীন হয়ে পড়ে। বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রশ্নে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী বাঙ্গালি নেতারা মুসলিম লীগে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। পশ্চিম পাকিস্তানেও মুসলিম লীগের বিরোধিতা শুরু হয়। তবে তা বিশেষ গতি পায়নি। পূর্ব বাংলায় বাস্তবিক অর্থে মুসলিম লীগ বিরোধী একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম গড়ে ওঠে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন মুসলিম লীগ বিরোধী এই ফ্রন্টের মূল তিন নেতা। এ সময় মুসলিম লীগ ও পশ্চিমা শাসক চক্রের বিরোধিতায় বিভিন্ন ছাত্র-যুব-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। নিম্নে পাকিস্তানে কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম ও তাদের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস

পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বঙ্গের কংগ্রেসে নেতাকর্মীগণ পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামেই সংগঠিত হয়। ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রথম থেকেই প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দলের নেতাকর্মীগণের প্রায় সকলেই হিন্দু হওয়ায় পাকিস্তান সরকার দলটিকে 'ভারতের গুপ্তচর' বলে আখ্যায়িত করে। দলটির নেতা-কর্মীদের ওপর দমন নীতি চালানো হয়। এ অবস্থা ন্যাশনাল কংগ্রেস পাকিস্তানে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারেনি। দলের অনেক নেতাকর্মীই ধীরে ধীরে ভারতে চলে যান। প্রগতিশীল অনেকেই পরবর্তীতে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

২. পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি

১৯৪৮ সালের ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কলকাতা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশের কমরেড সাজ্জাদ জহীরকে সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করে পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা পাকিস্তান সরকারকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট পার্টি মূলত সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের পথ বেছে নেয়। কমরেড মনি সিংহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের হাজং এলাকায়, খুলনার ডুমুরিয়া এলাকায় এবং যশোরের নড়াইল এলাকায় কৃষক অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রচেষ্টা চলে। পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে পুলিশী দমন-পীড়নের মাধ্যমে এসব আন্দোলন ব্যর্থ করে দেয়। পার্টির সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার কারণে ১৯৫৪ সালের ২৩ জুলাই পাকিস্তান সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টির ত্যাগী নেতৃবৃন্দ আত্মগোপনের পথ বেছে নেন। অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

৩. আওয়ামী মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগে নিজেদের উপদলীয় কোন্দলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আদুল হামিদ খান ভাসানী কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এ প্রেক্ষাপটে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ তরুণ ও প্রগতিশীল অংশ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। নতুন দলের সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। সাধারণ সম্পাদক হন টাঙ্গাইলের শামসুল হক। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দলটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক এবং ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়। ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নিজের ভাবমূর্তি অসাম্প্রদায়িক করতে নাম থেকে'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়। এ সময় দলটির মূলনেতা নির্বাচিত হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড পূর্ব বাংলার স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ায় এ অঞ্চলে দলটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। দলটি গণ-মানুষের প্রাণের সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ে দলটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)

ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে নতুন এ দলটির জন্ম হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় প্রদেশের কর্তৃত্বে দেয়া হবে। দলের কর্মসূচিতে ভূমি সংস্কার, বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদের অঙ্গীকার করা হয। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। ন্যাপ গঠনের পর বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা-কর্মী এ দলে যোগ দেয়ায় দলটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রগতিশীল সংগঠনগুলো এ দলে অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যূদয় বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালি স্বার্থ-বিরোধী অবস্থানের কারণে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তায় ধস নামে। এ প্রেক্ষাপটে পূর্ব-পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের উন্মেষ ঘটে। সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে আবার গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পাকিস্তান সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে কেন?
ক. ভারতের সঙ্গে আঁতাতের কারণে   খ. কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনের কারণে
গ. সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার জন্য   ঘ. কোনটি নয়

২। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন কে?
ক. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী   খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. শেখ মুজিবুর রহমান   ঘ. শামসুল হক

পাঠ-১০.৩ লাহোর প্রস্তাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- লাহোর প্রস্তাবের প্রধান দিকসমূহ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- পাকিস্তান সৃষ্টিতে লাহোর প্রস্তাবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক চেতনা, দ্বি-জাতি তত্ত্ব, বিভক্তি, সাম্প্রদায়িক, শাসনতান্ত্রিক সমস্যা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, পাকিস্তান প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। দ্বিজাতি তত্ত্ব নির্ভর লাহোর প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ভারতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটে। তবে আইন সভায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্বাচন অধিকার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এই দুই সম্প্রদায়ের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। এ আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তবে এ আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশ সমূহের মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত প্রদেশসমূহে মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রবর্তনের চেষ্টা, স্কুলসমূহের পাঠ্যসূচীতে হিন্দু ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যকে বাধ্যতামূলক করণ, সরকারী ভবন সমূহে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি মুসলিম অনুভূতিকে আহত করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (যিনি এক সময় হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন) এসময় তাঁর বিখ্যাত দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। দ্বি-জাতিতত্ত্ব মতে, ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে দুই সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। দ্বি-জাতি তত্ত্বেরই চরম বহিঃপ্রকাশ লাহোর প্রস্তাব। যার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করা হয়।

লাহোর প্রস্তাবের মূলধারাসমূহ

অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে ২৪ মার্চ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাবের মূল ধারাগুলো হল-

(১) নিখিল ভারত মুসলিম লীগ দৃঢ়তার সাথে পুনঃঘোষণা করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা রয়েছে তা এ দেশের উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত অসঙ্গত ও অকার্যকর। তা ভারতীয় মুসলমানদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

(২) সমস্ত সাংবিধানিক পরিকল্পনা নতুনভাবে বিবেচনা না করা হলে মুসলিম ভারত অসন্তুষ্ট হবে। মুসলমানদের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতিরেকে সংবিধান রচিত হলে তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে তার জন্য মুসলিম লীগ দু'টি প্রস্তাব করেঃ (ক) ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে, (খ) প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা পরিবর্তন করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেখানে ভারতেবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান

এলাকাগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ 'Independent States' গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

(৪) এ সমস্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানে কার্যকর রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক রাষ্ট্র সত্তার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে এ. কে. ফজলুল হক মনে করেন, বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা বাঙালি মুসলমানদের হাতে আসবে এবং এ ক্ষমতা তারা নিজেরা ভোগ করবে, কোন কেন্দ্রিয় কর্তৃত্বের হাতে তুলে দিবে না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মনে করেন, এর ফলে প্রত্যেক প্রদেশ তার উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিজাতি তত্ত্ব যুক্ত এবং একে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করায় এ. কে. ফজলুল হক পরবর্তীতে এটি সমর্থন করেন নি। কারণ লাহোর প্রস্তাবে দ্বি-জাতি তত্ত্ব বা পাকিস্তান শব্দের উল্লেখ ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত অবাঙালি নেতাদের তৎপরতায় এবং গণমাধ্যমের প্রচারে দ্রুত লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর ফলে মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাঙালি নেতৃবৃন্দের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়।

অন্যদিকে, কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে মহাত্মা গান্ধী ভারত বিভাগকে 'পাপ কাজ' বলে মন্তব্য করেন। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি গঠনকে অবান্তর বলে মন্তব্য করেন। কলকাতার পত্রিকাগুলো লাহোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে এবং একে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে আখ্যায়িত করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	লাহোর প্রস্তাব মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব অপরিসীম। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। মুসলমানরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তাদের জন্য পৃথক আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারও মুসলমানদের দাবী মেনে নেয়। ভারত বিভক্তির মাধ্যমে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। লাহোর প্রস্তাব জিন্নাহ ঘোষিত দ্বি-জাতি তত্ত্বেরই একটি রাজনৈতিক সংস্করণ। মূলত লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলমাদের জন্য অন্তত দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয়েছিল। অবশ্য এর ভিত্তিমূল ছিল সাম্প্রদায়িক চেতনা। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক কে?

ক. হোসেন শহীদ সহরাওয়ার্দী খ. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
গ. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ঘ. কোনটি নয়

২. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি কী ?

ক. অসাম্প্রদায়িক চেতনা খ. সাম্প্রদায়িক চেতনা গ. জাতীয়তাবাদ ঘ. বাঙালির স্বাধিকার

পাঠ-১০.৪ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও তাদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উর্দু, বাংলা, তমদ্দুন মজলিস, রোমান হরফ

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান ছিল। কিন্তু এত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং একই বছর জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের পক্ষে মত দেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখক, বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলার পক্ষে বক্তব্য দেন। পূর্ব বাংলায় ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পত্র-পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন।

বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি এসময়ে পূর্ব বাংলায় গঠিত বিভিন্ন সংগঠনও এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে *তমদ্দুন মজলিশ* গঠিত হয়। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল বাঙালির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন যা এই আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি

ভাষার ওপর আঘাত একটি জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতেরই শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত করা হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে জনগণকে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সাংস্কৃতিক প্রশ্ন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো পরের দিকে গুরুত্ব পেয়েছিল বেশি। বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ভাষার মধ্যে ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পর মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ পূর্ববাংলার ক্ষমতায় বসে 'রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'সাহিত্য সংসদ' গঠন করে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের নীতি গ্রহণ করে। প্রথমেই তারা বাংলা ভাষার মধ্যে একটি ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারে উৎসাহ দিতে থাকেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার ইচ্ছাও তারা তখন ঘোষণা করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষায় আরবি হরফ চালুর চেষ্টা করে। এরপর আরবিতে বাংলা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। চালু হয় এ ধরনের অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানে বয়স্ক ছাত্রদের বিনামূল্যে আরবি হরফের বই দেওয়া হতে থাকে। পূর্ববাংলার জনগণ কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানিদের অসাধু উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথমে এগিয়ে আসে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগের 'ভাষা কমিটি'। এই কমিটির বক্তব্য ছিল, পূর্ববাংলার মানুষকে অশিক্ষিত বানানোর জন্যই শাসকদের এই ষড়যন্ত্র। প্রবল নিন্দা জানায় 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ'। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলনের মুখে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি এবং কবি গোলাম মোস্তফাকে সম্পাদক করে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে। দেড় বছর ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার প্রচুর সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয়। নতুন ভাষার নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা'। কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নকে কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়। এ সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহ্বান জানায়। এই রিপোর্টটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পছন্দ হয় নি বলেই তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে শুরু থেকেই যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মধ্য থেকে জন্ম নিতে থাকে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর আহ্বায়ক মনোনিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি সংসদ' নামে আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনটি ক্রমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। সংসদের নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসত। এ সমস্ত সংগঠনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে ভাষা প্রশ্নের গুরুত্ব মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে পূর্ববাংলায় সব ধরনের উন্নতি থেমে যাবে। তমুদ্দুন মজলিশ পুস্তিকা প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় পূর্ববাংলার শিক্ষার বাহন, আইন আদালত ও অফিসের ভাষা বাংলা করতে হবে। এভাবে ভাষা আন্দোলনের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। যার শক্তির উপর দাঁড়িয়ে রূপলাভ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা শুরু করে। এ দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে তারা উর্দু করতে চায়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। এদেশের মানুষের কাছে এই অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায় মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এরই পরিণতিতে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের পক্ষে মত দেয় কে?
i. চৌধুরী খালিকুজ্জামান
ii. ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ
iii. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন কোনটি?
ক) তমদ্দুন মজলিশ খ) রেনেসাঁ সোসাইটি
গ) সাহিত্য সংসদ ঘ) রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ

৩। কার নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়?
ক) অধ্যাপক নুরুল হক ভূইয়া খ) অধ্যাপক আবুল কাশেম
গ) মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ঘ) কবি গোলাম মোস্তফা

৪। আরবি হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৪৮
গ) ১৯৫১ ঘ) ১৯৫২

পাঠ-১০.৫ ভাষা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ২১শে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রভাষা, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, সালাম, বরকত, রফিক

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৩৭ সাল থেকে ভাষা বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক মনোনীত হন নূরুল হক ভূঁইয়া। পরবর্তীকালে এ উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আশ্বাস দেন যে, মানি অর্ডার, ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজি-উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় লেখা হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্যে হতে 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সদস্যদের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়। এই সংবাদ ঢাকায় পৌছুলে এদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন। ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। শুরু হয়ে যায় একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি। নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন তীব্রতর হলে নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনে রাজি হন। কিন্তু ৬ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। পরিষদের বিরোধী দলের প্রতিবাদের ফলে প্রস্তাবটি পরিষদে উত্থাপিত হলেও বাস্তবায়ন হয় নি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কঠোর নীতি

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন 'উর্দুই এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানায়।

আন্দোলনকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনমনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এ সময়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। তখনও ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন কর্মসূচি

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়কে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। এই সময়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আকরাম খানকে সভাপতি করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি গঠনের প্রতিবাদ জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদে সভাসমাবেশ চলতে থাকে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের এক উক্তিকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপলাভ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন

খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনিও জিন্নাহর মতো ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। এবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ৩১ জানুয়ারি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকার আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার কৌশল গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন আন্দোলন দমন করার জন্য ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর মাধ্যমে ঢাকায় যেকোনো প্রকার সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা সরকারি এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নিতে পারে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলে সভা করে তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আবদুল মতিন, ওলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতারা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে জোড়ালো মত দেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বর) ছাত্রদের সমাবেশে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগ দেয়। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিকেলে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভার দিকে প্রতিবাদ মিছিল অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। মাতৃভাষার দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন– আবুল বরকত, আবদুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার এবং আহত হন কয়েকজন ছাত্রীসহ অনেকে। সে সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা শহীদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি,

গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহীদ হন। অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেই স্থানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩ ফেব্রুয়ারিতে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে। পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফুলার রোডে একজন কিশোর নিহত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ডা. সাঈদ হায়দারের নকশা অনুসারে রাতে মেডিকেল কলেজের গেইটের সামনে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি তা উদ্বোধন করা হয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহীদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ১৯৭২ সালে পূর্বের নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহীদ মিনারটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষিত হয়। নিম্নে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগঠিত গণআন্দোলন। এটি শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠে নি। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। বাঙালিরা অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

দ্বিতীয়ত, ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, ভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনগণের মানসিকতা ও স্বার্থ উপেক্ষা করে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দলটি শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে। এরপর আর কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয় নি।

চতুর্থত, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৬২ সালে সংবিধানে তা বহাল থাকে।

পঞ্চমত, যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য, ভাষা বৈষম্য তুলে ধরে। যা ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় যার প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন।

ষষ্ঠত, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ এর স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ দলীয়ভাবে তাদের স্টাডি সেন্টারে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন একটি প্রভাত ফেরি আয়োজন করবে এবং প্রভাতফেরি শেষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবে।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ সময় পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজজীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসকদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ কোনো সহানুভূতি পায় নি। তাই তাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তারা হয়েছে সংঘবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে বুকের রক্ত দিয়ে। এই ঘটনা পূর্ববাংলার জনগণের মনের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকার আদায়ের সব আন্দোলনে একুশের চেতনা সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন কোথায়?

i. রমনার রেসকোর্স ময়দানে
ii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে
iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

ক) নূরুল আমিন খ) খাজা নাজিমুদ্দিন গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) চৌধুরী খালিকুজ্জামান

৩। বর্তমান শহীদ মিনারের নকশা ও পরিকল্পনা কার?

ক) হামিদুর রহমান খ) ডা. সাঈদ হায়দার গ) আবুল হাশিম ঘ) গোলাম মাহবুব

৪। কত খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি দেয়া হয়?

ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৬ গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৯৯

সৃজনশীল প্রশ্ন

অ, আ, ক, খ আমার দুঃখীনি বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার রক্তাক্ত বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার গর্বিত বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার অহংকারী বর্ণমালা

ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে ছিলেন? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট কী? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অংশটুকু আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. আপনি কী মনে করেন যে আমার বর্ণমালা অহংকারী ও গঠিত? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১০.৬ পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানি শাসকরা কীভাবে পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করার চিন্তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার জনগণ কতটা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈষম্য, পাট, চা, সেনাবাহিনী, শোষণ

ভূমিকা

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় নি। বরং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিতে পূর্ব বাংলাকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় যার সফল পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ

পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানি শাসকবর্গ প্রথম থেকেই বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নিয়ে। দুটি অঞ্চল সমান সম্পদের অধিকারি ছিল না। পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে সমৃদ্ধ। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনে বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেখানে কৃষির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এ অঞ্চল আর্থিক দিক থেকে ছিল দুর্বল। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এখানে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় রপ্তানি পণ্য হিসেবে পাট, চা ও চামড়ার যোগান ছিল বেশি। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে এদেশের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। ফলে ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধ হতে থাকে।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয়পদেই নিয়োগ দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব বাংলার মতামত উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এবং পরে তা ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়।

পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% বাঙালি হলেও একমাত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আমল ছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ২৫%-৪৭% অতিক্রম করে নি। ঐ সময়ে মোট ২২১ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৯৫ জন। আর ৯ জন সরকার প্রধানের মধ্যে মাত্র ৩ জন

(খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী ও মোহাম্মদ আলী বগুড়া) ছিলেন পূর্ব বাংলার। সময়ের হিসেবে ২৪ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ বছর (২৫% সময়) পূর্ববাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জেনারেল আইয়ুব খানের আমলে (১৯৫৮-৬৯) মন্ত্রিসভার মোট ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ২২ জন (৩৫.৪৮%)। তবে এসব বাঙালিদের মধ্যে কেউ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান নি।

প্রশাসনিক বৈষম্য

১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের মন্ত্রীপরিষদ, পররাষ্ট্র, কৃষি, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, তথ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ৬৯ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন পাঞ্জাবি। বাঙালি ছিলেন মাত্র ৩ জন। বেসামরিক সিএসপি কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৯৪৮-৬৩ পর্যন্ত ৩৪৬ জনের মধ্যে মাত্র ১২৬ জন (৩৬.৪%) ছিলেন বাঙালি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন ২১৮ জন (৬৩.৬%)।

সামাজিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। সরকারের অর্থনৈতিক এবং পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান প্রথম থেকেই বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে দু'ধরণের সমাজজীবন পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের জীবনযাপন উন্নতমানের হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল বৈষম্যের শিকার। বাঙালিরা যাতে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে না পারে এজন্য তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগগ্রস্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যেও দামের পার্থক্য থাকতো, যাতে তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সেবার জন্য অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ফলে সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক উন্নত।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য ছিল। ক্ষমতার শীর্ষে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। তাদের এই বৈষম্যমূলক নীতি সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত বাঙালি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ক্রমশ এই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি আধিপত্য নিশ্চিত করতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে প্রাদেশিক কোটা নির্ধারণ করা হয়। এতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং বাদবাকি ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ করার বিধান চালু করা হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানি শাসনামলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ছিল ভয়াবহ। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নি। পূর্ববাংলা ছিল সম্পদশালী। এই সম্পদ এদেশবাসী ভোগ করতে পারত না। পাকিস্তানি শাসকরা তা ছিনিয়ে নিত। পুরো পাকিস্তানের আয়ের ৬০ ভাগ আয় হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হতে। অথচ আমাদের অঞ্চলে এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় করা হতো। আর বাকি সব নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ যেত পূর্বপাকিস্তান থেকে। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানকে আমদানি দ্রব্যের মাত্র ২৫ ভাগ দেয়া হতো।

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগের বসবাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় করা হতো এ অঞ্চলের জন্য। পাকিস্তানের অর্থ ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়েছে পূর্ববাংলার সম্পদে। কিন্তু এ দেশের উন্নয়নের দিকে কোনো নজর দেয়া হয় নি। তাই উর্বর পূর্ববাংলা বার বার বন্যা ও ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। আর মরুময় পশ্চিম পাকিস্তান হয়েছে আমাদের সম্পদে শস্য-শ্যামল।

শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তারও মালিকানা থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। কৃষি উন্নয়নের জন্য যে ঋণ পাওয়া যেত তার সিংহভাগ কৃষিভিত্তিক অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম

পাকিস্তান কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে এবং এ আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপলাভ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রেও বাঙালিরা সুস্পষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের বেলায় ১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিই অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের ফলে ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় যেখানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল সেখানে প্রায় বিশ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার পূর্ববাংলার চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে ২০৮৪.৬ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ হলেও পূর্ব পাকিস্তানে করা হয়েছে মাত্র ৭৯৭.৬ মিলিয়ন রুপি অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

চাকুরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। পূর্ববাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা চাকরির প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। সিভিল, মিলিটারি ও অন্যান্য চাকরির মূল নিয়োগ দানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে নিজেদের মতো করে নীতি নির্ধারণ করা সহজ হতো। দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনীর সকল পর্যায়ের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের প্রধান দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন পূর্ববাংলার সংবাদপত্রে দেয়াই হতো না। এ ছাড়াও মনোনয়ন বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হতেন পশ্চিম পাকিস্তানি। এসব কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পক্ষে উচ্চ পদে নিয়োগ পাওয়া ছিল খুব কঠিন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ। এদের ভাষা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অন্যদিকে পাকিস্তানের বাকি ৪৫ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরনের। এদের মধ্যে মাত্র ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতির সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে বাঙালিদের পাকিস্তানি করণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এই বৈষম্য বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। তাই পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ এবং পরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে পূর্ববাংলার জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আর একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একই রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের এমন ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চলে। যতদিন পর্যন্ত এই বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয় নি ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে নি। কিন্তু ক্রমে পাকিস্তানিদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে কয়েক পর্যায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়–

প্রথমত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রতিবাদ গড়ে ওঠে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে নিয়ে। ৫৫% লোকের বাংলা ভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ব্যাপক আন্দোলন দেখা যায়। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় প্রতিবাদ ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা হয়। শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে চির বিদায় নেয়।

তৃতীয়ত, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির বিরুদ্ধে বাঙালিরা আবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সংবিধানের বিরুদ্ধে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন ক্রমে শিক্ষা রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে ছয় দফা ভিত্তিক, আগরতলা মামলা বিরোধী সর্বোপরি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের মাধ্যমে বৈষম্য বিরোধী প্রতিক্রিয়া সফল হয়।

চতুর্থত, পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ছিল ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

পঞ্চমত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বাঙালির রায় ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। যদিও বাঙালি জাতিকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাঙালি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ বৈষম্য-এর একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে একটি রচনা লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অভিন্ন দেশ পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পূর্ববাংলা সমান দৃষ্টি ও সহানুভূতি পায় নি। তার বদলে সম্পদশালী পূর্ববাংলাকে শোষণ করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ববাংলা। অবশেষে বাঙালিদের কাছে পরিষ্কার হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষকের চেহারা। তারা ক্রমে আন্দোলনমুখর হয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের জন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবি ও পাঠান বাদে বাংলাসহ অপরাপর জাতির চাকুরির জন্য শতকরা কতভাগ কোটা নির্ধারণ করা হয়?

ক) ৫ খ) ২৫ গ) ৩৫ ঘ) ৬৫

২। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য করে?

i. অর্থনৈতিক
ii. প্রতিরক্ষা
iii. সাংস্কৃতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ১৯৭৪-৪৮ অর্থ বছরের পূর্ব বাংলায় শিক্ষিতের হার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে–

ক) কম খ) অনেক কম গ) বেশি ঘ) অনেক বেশি

৪। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা কোন বৈষম্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক) শিক্ষা খ) সাংস্কৃতিক গ) চাকুরি ঘ) সামাজিক

পাঠ-১০.৭ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কীভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	যুক্তফ্রন্ট, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, ২১ দফা

ভূমিকা

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন ছিল 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন জরুরি হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এই সময়ে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের চরম ব্যর্থতার ফলে *আওয়ামী মুসলিম লীগ*, *কৃষক-প্রজা পার্টি*, *পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি*, *নেজাম-ই-ইসলামী*, *পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস* প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের ভয়ে নানা টালবাহানায় নির্বাচনের তারিখ বারবার পিছিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য স্ব-স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে এই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকারের প্রতি মুসলিম লীগ কোনো সম্মান দেখায় নি। তাই তাদের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের কোন আস্থা ছিল না। মুসলিম লীগ সরকার বার বার নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সম্মুখীন হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষের চাপের মুখে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও বড় রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হবে। ইতোমধ্যেই ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো ছিল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার করা হয় ২১ দফা। ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবিতে গণমানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরে। এই দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

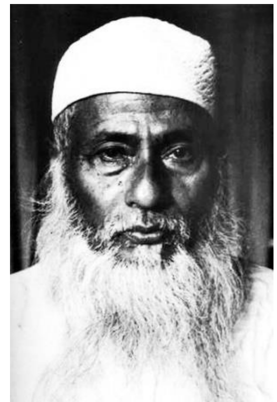

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
৩. পাটের ব্যবসায় জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ করা
১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা
১৭. বাংলা ভাষা করার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিল ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী ২টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয়

নেতা পরাজিত হন। মূলত মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ও নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতাই মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এ অঞ্চলের মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের মধ্যে দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এদেশিয় দোসরদের দ্বারা প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। তাই তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। অন্যদিকে বিভিন্ন দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ায় এই দলের ভেতর স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নমতের নেতাদের উপস্থিতি ছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতার বিষয়টি মুসলিম লীগের চোখে তেমন একটা ধরা পড়ে নি। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে তারা খুব ভীত হয়ে পড়ে। এবার সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে এই বিজয়ের ফলাফলকে বানচাল করা যায়।

মন্ত্রিসভা গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রির দায়িত্ব ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।মে মাসে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। তাই শুরু থেকেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ সময়ে এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা সফরে দুই বাংলা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই বাংলা যে অভিন্ন তা বর্ণনা করেন।

তার এই বক্তৃতার সূত্র ধরে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সুযোগ পেয়ে যান। তারা দেখতে পেলেন এই বক্তৃতার রেশ ধরে ফজলুল হককে অপসারণ করা যেতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। প্রচার করা হয় ফজলুল হক ভারতের কাছে পূর্ববাংলা বিক্রি করে দিতে চান। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হতে থাকে।

মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে। এই সময়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন। এ শাসন জারি ছিল ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি

করে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পরাজয় কারণসমূহ চিহ্নিত করে একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তানি শাসক চক্রের শাসন ও শোষণে মানুষ মুসলিম লীগের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। এভাবে পূর্ববাংলার কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। কিন্তু মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। তখন পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কত দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে?
ক) ৬ খ) ৮ গ) ১১ ঘ) ২১

২। কত খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৪৯ গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৫৪

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর লিখ।
বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে তথা জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়।

৩। পাকিস্তানের ইতিহাসে উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথম জোটবদ্ধ দলটি কত খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে অংশ নেয়?
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬ গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৭০

৪। উক্ত নির্বাচনে জয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন কে?
ক) এ কে ফজলুল হক খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) আবু হোসেন সরকার ঘ) সৈয়দ আজিজুল হক

পাঠ-১০.৮ সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান জারি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান, সামরিক শাসন, আইয়ুব খান, মৌলিক গণতন্ত্র

ভূমিকা

একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর বিভিন্ন পর্যায় হতে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে সংবিধান প্রণয়নের জোড়ালো দাবি ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এটি ছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সংবিধান। এ সংবিধানের মাধ্যমে 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন করা হয় এবং নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। সংবিধানে সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃতি হয়। বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। তবে এই সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব বাংলার সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিস্থিতি অনুধাবন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা নতুন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনিহার কারণে এই কাজে বিলম্ব হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম। মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তাদের সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ হয় এবং কমিটির সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হয়। মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমিমাংসিত থেকে যায়। ১৯৫৫ সালে গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান চালু ছিল মাত্র দু বছর। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয়। সংবিধান স্থগিত করার সাথে সাথে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ

গোলাম মুহাম্মদের পদত্যাগের পর ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর অগণতান্ত্রিক আচরণ ও হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রে তিনটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের মধ্যে গোলযোগে পরিষদ

কক্ষেই ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আহত হন এবং পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট মির্জা বেসামরিক শাসন অবসানের উদ্যোগ নেন।

সামরিক শাসন জারি

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসন ব্যবস্থায় একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। সংবিধান বাতিল, আইন পরিষদ ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার গণতন্ত্র বিরোধী উপরিউক্ত কার্যক্রমে প্রধান সহযোগী ছিলেন আইয়ুব খান। উচ্চবিলাসী আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ২১ দিনের মাথায় ইস্কান্দর মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালে 'পোডো' (Public Office Disqualification Order, PODO) এবং 'এবডো' (Elective Bodies Disqualification Order, EBDO) নামক দুটি আদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে একটি নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তাঁর এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানের দুই অঞ্চল থেকে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচন করা হয়। আইয়ুব খান ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরগুলো ছিল : ১. ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), ২. থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়) এবং তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ। এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকতেন। এরাই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৯৬০ সালে এসব মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন ও ১৯৬২ সালের সংবিধান

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ পূর্ব-পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এই খবর পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকার গ্রেফতার নির্যাতন চালালে ছাত্র গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীসভা ও গভর্ণরের ক্ষমতা সংকোচিত করা হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করা হয়। বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আইয়ুব খান ও পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালান। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপলাভ করে। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। ৮ জুন সামরিক আইন স্থগিত করে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কমিশন রিপোর্ট বাতিল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৬২ সালে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এ অবস্থায় আইয়ুব খান 'রাজনৈতিক দলবিধি' প্রবর্তন করে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটান। আইয়ুব খান নিজে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী দল সক্রিয় হয়। এসময়ে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। এই ফ্রন্ট খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party, COP) নামে একটি জোট গঠন করে। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আইয়ুব খান ফাতেমা জিন্নাহকে সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলও সরকারী দলের পক্ষে যায়। অবৈধ প্রভাব ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করেই আইয়ুব খান নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করেন। ফলে ১৯৬৫ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ভারত লাহোর আক্রমণে অগ্রসর হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত 'তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত অবস্থা প্রকাশিত হয়। তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ একটি গনতান্ত্রিক দেশে সামরিক শাসন কী কী সংকট সৃষ্টি করতে পারে তার উপর একটি বিতর্কসভা আয়োজন করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার বিরোধী কার্যকলাপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের সূচনা করে। নানা রকম

কূটকৌশল ও দমন নীপিড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে তা আইয়ুবের শাসন ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫০
গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৬২

২। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো–

ক) EBDO আদেশ জারি খ) PODO আদেশ জারি
গ) ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যু ঘ) সামরিক শাসন জারি

৩। কোন সমস্যার কারণে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

ক) তাসখন্দ খ) বাংলা
গ) পাঞ্জাব ঘ) কাশ্মীর

৪। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে–

ক) আদর্শ গণতন্ত্র খ) অভিনব গণতন্ত্র
গ) সার্বজনীন গণতন্ত্র ঘ) প্রচলিত গণতন্ত্র

পাঠ-১০.৯ ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছয় দফা দাবি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছয় দফা উত্থাপন করার পর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- এগার দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ছয় দফা, লাহোর, আগরতলা, এগার দফা

ভূমিকা

পাকিস্তানি শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সোচ্চার হন।

ঐতিহাসিক ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। বিরোধী দলের এই সম্মেলন চলাকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখান করেন। প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল সম্মেলন বর্জন করেন। তারপর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে ঢাকায় চলে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ছয় দফাতে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবী। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ-

ছয় দফার কর্মসূচিসমূহ

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২. শুধু দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. দেশের দুই অংশে সহজেই বিনিময়যোগ্য অথচ পৃথক দুটো মুদ্রা থাকবে। অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই দেশের দুটি রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থাসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. আঞ্চলিক সরকারে হাতে থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য করার ও আদায়ের ক্ষমতা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা আলাদা হিসেব থাকবে। প্রয়োজনে দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্র বৈদেশিক মুদ্রা পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী অর্থাৎ মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

প্রতিক্রিয়া

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ বিরোধী দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়। ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দিতে থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করা হয়। ছয় দফার পক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানে দিন দিন ছয় দফা জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। আইয়ুব খানের সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়। তারা ধরপাকড় শুরু করে এবং ছয় দফাকে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের উপর শুরু হয় হয়রানি ও নির্যাতন। বিক্ষুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পালন করে প্রতিবাদ দিবস। ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদী মানুষ মিছিল বের করে। এই দিন পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক মানুষ আহত হয়। পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ৮ জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত

আগরতলা মামলা চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। প্রতিবাদী মানুষ আসামীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপলাভ করে। একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তি লাভ করেন। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

এগার দফা আন্দোলন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। এ সময়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এগার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগার দফা কর্মসূচির ভেতর ছয় দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশকিছু দাবি। এগার দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ক্রমে ছয় দফা ও এগার দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ছয়দফা উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীগণ একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। এই দাবি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করলে পাকিস্তানি শাসকবর্গ ভীত হয়ে পড়ে। তারা আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আগরতলা

ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বিরোধী দলের অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এই দমন নীতি তাদেরকে আরও প্রতিবাদী করে তোলে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে। তবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এতে থেমে যায় নি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্ররা উত্থাপন করে এগার দফা দাবি। ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন ক্রমে গণআন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ছয় দফা কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে?
i. আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি
ii. মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন
iii. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। আগরতলা ভারতের কোন রাজ্যের রাজধানী?
ক) আসাম খ) ত্রিপুরা গ) বিহার ঘ) পশ্চিবঙ্গ

৩। ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয় কোন সম্মেলনে?
ক) ঢাকা খ) লাহোর গ) আগরতলা ঘ) রাজশাহী

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব 'ম' একটি অঞ্চলের বিরোধী দলীয় নেতা। তিনি শাসক শ্রেণির বৈষম্যমূলক নীতি তথা শোষণের হাত থেকে জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি শাসক শ্রেণিকে কয়েকটি দাবি পেশ করেন। কিন্তু তারা দাবি না মেনে উক্ত নেতাকে একটি মামলায় কারাবন্দী করে প্রহসনমূলক বিচারের মুখোমুখি করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ক. EBDO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত দফাসমূহের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ উল্লিখিত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কী পাকিস্তানি শাসনের সমাধি তৈরি করেছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১০.১০ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট কী ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণঅভ্যুত্থান, ডাকসু, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, আসাদ, মতিউর

ভূমিকা

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবার একসাথে আন্দোলনে নামে। আইয়ুব খানের পতনের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সূত্রপাত করে। তাদের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০ এর দশকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল আগরতলা মামলা দায়ের ও নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার, ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। আর এ অভ্যুত্থানের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোন আস্থা ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতম হচ্ছিল।

১৯৬৮ সালের একটি ঘটনা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তোলে। এ সময় আইয়ুব খান তাঁর শাসনকালের উন্নয়ন দশক (১৯৫৮-১৯৬৮) পালনের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের নিকট আইয়ুব খানের শাসন ছিল শোষণ বঞ্চনা আর নির্যাতনের দশক। এই উন্নয়নের দশক পালন মানুষকে ভীষণভাবে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ায় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি মিলে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট অংশ মিছিল করে গভর্নর হাউস ঘেরাও করলে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে ৮ ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০

ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ‘নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস’ পালন করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আওয়ামী লীগের ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১দফা দাবি পেশ করে।

এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ’ (ডাক) নামক একটি মোর্চা গঠন করে ৮ দফা দাবি পেশ করে। এরপর ‘ডাক’ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। ‘ডাক’ এর আহ্বানে ১৪ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।

ধর্মঘটে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে বাধার সৃষ্টি করলে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র জনতা। পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিল আরও দুর্বার রূপ নেয়। মিছিলকারীরা সেক্রেটারিয়েট ভবন আক্রমণ করে এবং একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঢাকা নগরী বিপ্লবী মিছিলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবার মিছিল সরকারী পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও সরকার সমর্থক দৈনিক *মর্নিং নিউজ* অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদিন আন্দোলন ছিল ছাত্র ও আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ তারিখে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। মিছিলে যোগ দেয় রিকশা ও মোটর যানের চালক আর শ্রমিক সম্প্রদায়। আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন পুলিশকে সাহায্য করার জন্য শহরে ই.পি.আর নামানো হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। এতে আন্দোলন না থেমে আরও বেগবান হয়। মিছিলে যোগ দিতে থাকে অধিকহারে যুবক ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহুসংখ্যক মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হন।

মতিউর

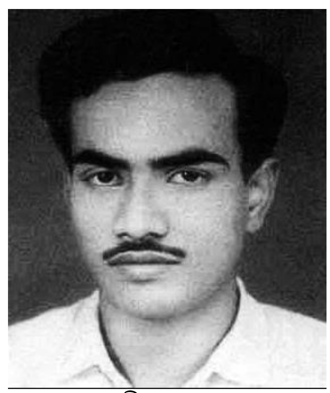
শহীদ আসাদ

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।

এরপর আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। আইয়ুব খান অবস্থা বেগতিক দেখে বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে

ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়।

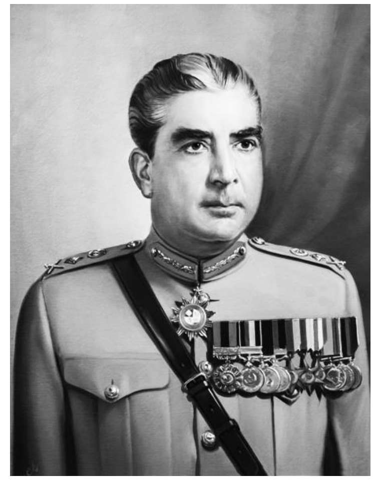

২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ছয় দফা ও এগার দফার দাবি আদায় মূখ্য হয়ে উঠেছিল। গোলটেবিলের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে সরিয়ে দিয়ে ড. এম এন হুদাকে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাতেও গণআন্দোলন শান্ত হয় নি। তখন তিনি ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে।

গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় তার সাফল্যজনক পরিণতি আইয়ুব খানের পতন। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময় এ ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা যে ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আইয়ুব খানের দমন নীতি, শোষণ নিপিড়ন, নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানিদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত গণরোষ বিপ্লবী করে তোলে প্রতিবাদী মানুষকে। মানুষের মিছিলের জোয়ারে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠে। আন্দোলনে শরিক হয় সমগ্র পূর্বপাকিস্তান। পুলিশ আর সৈন্যরা গুলি চালিয়েও থামাতে পারে নি আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে সরকারি প্রশাসন। গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আইয়ুব খান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বা 'ডাক' এর '৮' মহাত্ম হলো–

i. পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল
ii. প্রতিষ্ঠা ৮ই জানুয়ারি
iii. দাবির সংখ্যা ৮টি
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি কেন বিখ্যাত?
ক) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যাহার　　খ) শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান
গ) সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা　　ঘ) আইয়ুব খানের পদত্যাগ

৩। ২৪ জানুয়ারিকে 'গণঅভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালন করা হয় কারণ ঐদিন–
i. সেক্রেটারিয়েট ভবনে আগুন লাগানো হয়
ii. দৈনিক মনিং নিউজ অফিসে আগুন লাগানো হয়
iii. সর্বস্তরের মানুষের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii　　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাম্প্রতিক সময়ে মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়। সরকারের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার এবং রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে এ আন্দোলন দানা বাধে। সরকার এ আন্দোলন দমন করতে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করলে শেষ পর্যন্ত সরকার পতনের এক দফার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন রচিত হয়। এ পর্যন্ত কয়েকটি দেশে জনতার বিজয় নিশ্চিত হয়।

ক. 'অপারেশন সার্চ লাইট' কী? ১
খ. ৭ মার্চের ভাষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান আমলের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন কী পরবর্তীতে স্বাধীকার অর্জনে প্রভাববিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১০.১১ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি, নির্বাচন পদ্ধতি, আসন বণ্টন প্রভৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইন কাঠামো আদেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ, এক ইউনিট, আইন কাঠামো আদেশ, নির্বাচনী ইশতেহার, জুলফিকার আলী ভূট্টো, আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, সাইক্লোন।

ভূমিকা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেশটির কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন চালু ছিল। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রথম দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে।

১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের সময় ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। স্বভাবতঃই নির্বাচন অনুষ্ঠান ও জাতীয় পরিষদ গঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি সামরিক আইনের অধীনে বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে জারি করেন। ২৮ নভেম্বরের (১৯৬৯) বেতার ভাষণে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইয়াহিয়া খান দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

প্রথমত ঃ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা দেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেওয়া হয়।

২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) ইয়াহিয়া খান আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যেমন,

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার,
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন,
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা,
৪. বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা এবং
৫. পাকিস্তানে একটি ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ঘোষণা করা হয় 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal Frame Work Order, LFO)।

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

নির্বাচন

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭ সংরক্ষিত নারী আসনসহ বরাদ্দকৃত আসন ছিল ১৬৯ টি। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টির নূরুল আমিন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে)। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

পর্যালোচনা

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রায় সবগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে দেশের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কোনো মিল ছিল না।

৩. পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুল রায় ছিল ৬ দফার প্রতি গণরায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাঙালির ম্যান্ডেটস্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে প্রত্যাখান করে।

নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতি

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দুই মেরুতে অবস্থান করে। আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ন রাখে। পক্ষান্তরে পিপিপি সহ অন্যান্য দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। ভূট্টো হুমকি দেন যে, তাঁর মতামত গ্রহণ করা না হলে তাঁর দল জাতীয় সংসদে অধিবেশন বয়কট করবে। প্রত্যুত্তরে আওয়ামী লীগও তাদের দাবিতে অটুট থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর দাবিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ১ মার্চ (১৯৭১) এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পুরো পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় মার্চের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে নিজের ভাষায় একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। এক ব্যক্তি এক ভোট ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করায় এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন ও ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি সাধারণ ও ৭টি মহিলা আসন লাভ করার মাধ্যমে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের অবসানের পর কে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
ক) টিক্কা খান খ) জুলফিকার আলী ভূট্টো গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) ইয়াহিয়া খান

২। নিচের ছকটি দেখে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

নির্বাচন	মোট আসন সংখ্যা	আওয়ামীলীগ	পিপলস পার্টি
জাতীয় পরিষদ	৩১৩	১৬৭	৮৮
প্রাদেশিক পরিষদ	৩০০	২৮৮	-

উদ্দীপকে (ছকে) কত সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হয়েছে?
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৬৫ গ) ১৯৭০ ঘ) ১৯৭৩

৩। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে খ) পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়
গ) পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ঘ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়

৪। বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষ বাঙালিদের দুঃসময়ে এগিয়ে আসলেও পাকিস্তানের শাসকবর্গ নিষ্ক্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি কোন ঘটনা মনে করিয়ে দেয়?
ক) ১৯৬৯ সালের জলোচ্ছ্বাস খ) ১৯৭০ সালের ঘুর্ণিঝড় গ) ১৯৭১ সালের দুর্ভিক্ষ ঘ) ১৯৭২ সালের বন্যা

পাঠ-১০.১২ অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পূর্ব পাকিস্তান, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন, টিক্কা খান, পল্টন ময়দান, স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ৭ মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা।

৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে পুরো পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১ তারিখেই পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করে। অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র গণজমায়েত শেষে ডাকসু'র ভিপি আ স ম আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। ইশতেহারে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করা হয়। এখানে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করার প্রতি জোর দেওয়া হয়। তখন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সকল কর্মপন্থা ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে;

২. আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি বাহিনী গঠন করতে হবে;

৩. সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে, ইত্যাদি।

২ মার্চ হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। তখনকার আন্দোলন কর্মসূচিতে ছিল : ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা থেকে বেলা ২:০০ টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। পাশাপাশি ৭ মার্চ বেলা ২ টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কথাও বলা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ (১৯৭১) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। একই দিন জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান।

শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ

হরতাল ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহিংসতার দিকে মোড় নিতে শুরু করে। পুরো পূর্ব বাংলার মানুষ আন্দোলনে ফুঁসে উঠতে শুরু করে। এমনি পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন-

ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;

খ) অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;

গ) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং

ঘ) (জাতীয় অধিবেশনের পূর্বেই) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এই শর্তগুলো মানলেই যে শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন এমন নিশ্চয়তা তিনি ভাষণে দেননি। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন। বিশেষ করে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে তিনি উচ্চারণ করেন। এই ভাষণে তিনি যে সংগ্রামের ঘোষণা দেন, তার সূচনা ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিব যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন তা না পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল অসহযোগ। ইতোমধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি শীর্ষক ইশতেহার প্রচারের ফলে স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন, এমনটাই ছিল জনপ্রত্যাশা। কিন্তু স্বাধিকার, স্বাধীনতা অর্জন কিংবা আলাদা কোনো দেশ সৃষ্টির দাবির বিষয়ে তিনি তার ভাষণে স্পষ্ট করে কিছু না বলায় পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী মানুষ কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। এই ভাষণের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নতুন প্রস্তাবনা ও সমঝোতার প্রচেষ্টা

পূর্ব পাকিস্তানে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, গোটা বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমনি মুহূর্তে ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি করেন। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান সমঝোতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন জেনারেলসহ ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আগত। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলাকালেই ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান বুঝতে পারেন এই সংকট আর রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার সাধ্য তাদের নেই। তাই সামরিক হামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনকে দমনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আসা হয় আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে। পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর পরিচালিত হিংস্র সেই হামলার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ইয়াহিয়া খান আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐদিন মধ্য রাতেই ৩ ব্যাটেলিয়ান পাকিস্তানি সৈন্য 'অপারেশন সার্চলাইটে' অংশ গ্রহণ করে। তারা ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানদার বাহিনীর নির্মম আক্রমণে প্রাণ হারায় প্রায় বিপুল সংখ্যক নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালি। এভাবেই তারা সংঘটিত করে ইতিহাসের বর্বরতম এক গণহত্যা। এ বিভৎস হত্যা ও ধবংসযজ্ঞের ঘটনায় গোটা জাতি বিস্ময়বিমুঢ় হয়ে পড়ে।

ঐদিন রাত ১:৩০ টায় পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে শেখ মুজিবকে আত্মগোপন করার জন্য তার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী ও সুহৃদগণ পরামর্শ দিলেও তিনি তা না করে নিজ গৃহে অবস্থান করেন। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে সহজেই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়েই তাকে বন্দি রাখা হয়। ৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বিভিন্ন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তার বন্দি হওয়ার খবরটি প্রকাশিত হলে জাতি তা জানতে পারে। গ্রেফতারের পূর্বে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা নেতা হিসেবে আন্দোলনের কোনো দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন কিনা, এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা নেতা হিসেবে আন্দোলনের কোনো দিকনির্দেশনা না দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার ফলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ কী ধরণের সংকট তৈরি হয় তার উপর একটি রচনা তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে লাগাতারভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। যা ইতিহাসে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে আছে। ১৫ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খান আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার অভিনয় করেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করলে ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। এ অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্থ জাতিকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান না করেই শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ চরম সংকটে নিপতিত হয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ৩ মার্চের জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয় কবে? (জ্ঞানমূলক)

ক) ২৭ ফেব্রুয়ারি খ) ২৮ ফেব্রুয়ারি গ) ১ মার্চ ঘ) ২ মার্চ

২। শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয় (অনুধাবন)

i) ২ মার্চ ১৯৭১ ii) ৩ মার্চ ১৯৭১ iii) ৪ মার্চ ১৯৭১

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

অচিন্ত্যপুর, পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সমন্বয়ে এক দেশ। পশ্চিমাংশের লোকরা পূর্বাংশে অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করলে দেশটির পূর্বাংশের এক নেতা জনগণের প্রতি অসহযোগ আন্দোলনের সম্পৃক্ত হওয়ার ডাক দেন। ফলে কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী শিক্ষার্থী সাধারণ জনতা নির্বিশেষে সকলে অবিসংবাদিত নেতার আহবানে সাড়া দিয়েছিল।

৩। উদ্দীপকে বর্ণিত অংশে কোন নেতার ছবি ফুটে উঠেছে?

ক) এ.কে ফজলুল হক খ) মাওলানা ভাসানী গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

৪। এই অবিসংবাদিত নেতার আন্দোলন ছিল মূলত–

i) স্বৈরাচার শাসকের বিরুদ্ধে

ii) পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে

iii) সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। শেখ মুজিবুর রহমানের কত তারিখের বক্তব্য ছিল স্বাধীনতার একটা মাইলফলক?

ক) ৭ মার্চ খ) ১১ মার্চ গ) ১৫ মার্চ ঘ) ১৯ মার্চ

পাঠ-১০.১৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের ঘটনা জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করতে পারবেন;
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বাধীনতার ঘোষণা, জিয়াউর রহমান, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশীদের উপর নির্মম গণহত্যা চালায়। ২৬ প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। আওয়ামী লীগের প্রধান সারির নেতৃবৃন্দ জীবনের নিরাপত্তা ও কৌশলগত কারণে আত্মগোপনে চলে যান। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা না পাওয়ায় তাদের কেউ কেউ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয়ের জন্য রওয়ানা দেন। এ ভাবেই বাঙালি জাতির জীবনে এক চরম ক্রান্তিকাল উপস্থিত হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাদের দাবি অনুযায়ী ঘোষণাটি ই পি আর-এর ওয়ারলেস যোগে চট্রগ্রামে তাঁর ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগী জহুর আহমেদ চৌধুরী কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত একটি সরকারি বাহিনীর ওয়্যারলেস ব্যবস্থা, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তারাও দায়িত্বরত ছিলেন, ব্যবহার করে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণ করা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়।

এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদ এর লেখা "তাজউদ্দিন আহমেদ: নেতা ও পিতা' শীর্ষক গ্রন্থে (পৃ. ৪৪-৪৫ দ্রষ্টব্য) ২৫ মার্চ কালরাত ও শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার এ ঘোষণা বিষয়ে সংশয় তৈরি হয়। তার বর্ণনা মতে, পুরো জাতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেই গ্রেফতার হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালি জাতির এক মহাদুর্যোগকালে চট্টগ্রামস্থ সেনাবাহিনীর অষ্টম রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান কাণ্ডারী হিসেবে হাজির হন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় হত্যাকান্ডের সংবাদ শুনেই চট্টগ্রামে প্রথম প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'We revolt' বলে তিনি পকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। জিয়া তাঁর অধীনস্ত সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যদের পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দেন। মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী অফিসারগণ তাঁদের রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেনেন্ট কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া ও অন্যান্য অবাঙালি অফিসারদের গ্রেফতার ও হত্যা করেন। উল্লেখ্য যে, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জিয়াকে বিদ্রোহ করতে কেউ নির্দেশ দেয়নি বা আহ্বান জানায়নি। দেশের জন্য নিজের যে কর্তববোধ তা থেকেই দেশ মাতৃকার চরম দুর্দিনে জিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে একটি অস্থায়ী বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে জিয়াউর রহমান এই অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে নিজ নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। জিয়াউর রহমানের প্রদত্ত ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:

"প্রিয় সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, প্রভিশানাল প্রেসিডেন্ট এবং লিবারেশন আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ', এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি,

বাংলাদেশ স্বাধীন। আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করছি। আমাদের যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আমাদেরই হবে।” (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, জিয়ার পূর্বোক্ত ঘোষণাটি অন্য কারো লেখা ছিল না। তিনি নিজেই এ ঘোষণাটি লিখেছিলেন। প্রথম ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি কৌশলগত কারণে এর আংশিক সংশোধন করেন এবং দ্বিতীয় ঘোষণাটিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন। প্রথম ঘোষণায় তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করলেও পরবর্তী ঘোষণায় তিনি নিজেকে ‘প্রভিশনাল কমান্ডার-ইন-চিফ অব দ্যা বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি’ হিসেবে উল্লেখ করেন। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ইংরেজি ও বাংলা দু’ভাষাতেই পঠিত হয়েছিল। ঘোষণায় তিনি বাংলাদেশে পরিচালিত পাশবিক গণহত্যার বিরুদ্ধে যার যার দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের সকল সরকারের কাছেও আবেদন জানান। তিনি বাংলাদেশের সার্বভৌম ও আইনানুগ সরকার বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জাতির স্বীকৃতির দাবিদার বলে উল্লেখ করেন। জিয়া তাঁর ঘোষণায় আরো বলেছিলেন, ‘আমরা কুকুর-বিড়ালের মতো মরব না, বরং বাংলা মায়ের যোগ্য নাগরিক হিসেবে মরব।” মেজর জিয়া তাঁর বেতার ঘোষণায় শেষ শত্রুটি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন। মেজর জিয়ার নির্দেশে পরবর্তীতে তাঁর পূর্বোক্ত ঘোষণাটি কিছুক্ষণ পরপর বেতার থেকে নিউজ বুলেটিন আকারে প্রচার করা হয়। ৩০ মার্চ একই বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের আরেকটি বিবৃতি প্রচারিত হয়, যাতে তিনি পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে দেওয়া জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালি জাতির চরম দুর্যোগ মুহূর্তে কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিটার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসা জিয়ার কণ্ঠস্বর ‘আমি মেজর জিয়া বলছি’ দীর্ঘ সংগ্রামের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ বাঙালি জাতিকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাঁর স্বাধীনতার এ ঘোষণা দিশেহারা মানুষকে স্বস্তি দিয়েছিল, উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশি-বিদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের লেখনীর আলোকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বস্তুত, জিয়ার এই স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের মানুষদের জন্য এক মুক্তিবার্তা। এই বার্তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের বীর জনতা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

জিয়াউর রহমান ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত এক অকুতোভয় বীরযোদ্ধা। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যুদ্ধ পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত রণাঙ্গণকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১নং সেক্টরের (চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা) অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেজর জিয়া। ১৯৭১ সালের ৭ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নিয়মিত বাহিনীর প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে একটি ব্রিগেড তৈরি করে মেজর জিয়াকে এর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। অধিনায়ক মেজর জিয়ার নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় ‘জেড ফোর্স’।

বাঙালি জাতির এক চরম ক্রান্তিকালে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ও রণাঙ্গনে নেতৃত্বদানকারী বীর যোদ্ধা হিসেবে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নিজের অক্ষয় স্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান, বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য তিনি একদিকে যেমন বাঙালি জাতির অকুণ্ঠ ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ও বীরত্বব্যঞ্জক অবদানের জন্য জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক ‘বীর উত্তম’ খেতাবে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তবে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানকে দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের পথ সুগম করে দেন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে সবার আগে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এরপর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

শহিদ জিয়াউর রহমান

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট নামের প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তারপর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলেছিল প্রায় নয় মাস। এ যুদ্ধ আপামর জনসাধারণের কাছে মুক্তিযুদ্ধ নামেই পরিচিত। এ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সে কারণে এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ নামেও পরিচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে। এ জন্য দিবসটি আাদের কাছে বিজয় দিবস নামে পরিচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি মুখস্থ করুন।

সারসংক্ষেপ

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে মেজর জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এই দেশের বীর জনতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। তিনি দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ গ) ১৪ ডিসেম্বর ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

২। কে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?
ক) আতাউল গনি ওসমানি খ) মাওলানা ভাসানী গ) শহিদ জিয়াউর রহমান ঘ) অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

৩। আকলিমা রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঘুরতে এসে জেনেছে ১৯৭১ সালে এখানেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন পুলিশ বাহিনীর অসংখ্য সদস্য। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত–
i) ২৫ মার্চ গভীর রাত
ii) অপারেশন ক্লিনহার্ট
iii) অপারেশন সার্চলাইট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.১৪ প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রবাসী সরকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রবাসী সরকার গঠনের পটভূমি ও সরকারের সদস্যদের নাম বর্ণনা করতে পারবেন;
- ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণালাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রবাসী সরকার, মুক্তিযুদ্ধ, ইন্দিরা গান্ধী, তাজউদ্দিন আহমদ, ১১টি সেক্টর।

প্রবাসী সরকার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকারের অবদান ছিল অতুলনীয় ও অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বিজয় অর্জনের সময় পর্যন্ত এই সরকারের কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক। প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করা, দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা ছিল এই সরকারের সাফল্য। পাশপাশি স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাও ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

পটভূমি

মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত চলে যান। তারা ১ এপ্রিল ‘ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় দিল্লি পৌঁছান। তারা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারপর তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী সরকার গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাখা হয় রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম নির্বাচিত করা হয়।

তাজউদ্দীন এই সরকারের অপর তিন মন্ত্রী নির্বাচিত করেন যথাক্রমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। তাজউদ্দীন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সংকটময় সময়ে এই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই প্রবাসী সরকারকে ভারত স্বীকৃতি প্রদান করে এপ্রিলের ৪ থেকে ৬ তারিখের মধ্যে। এপ্রিলের ৮ অথবা ৯ তারিখ তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে শুরুতে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমেদের দৃঢ়তার ফলে সরকার সুগঠিতভাবে পরিচালিত হয়।

তাজউদ্দিন আহমেদ ১২ এপ্রিল মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান	-	প্রেসিডেন্ট
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	-	ভাইস-প্রেসিডেন্ট
তাজউদ্দীন আহমেদ	-	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
খন্দকার মোশতাক আহমদ	-	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান	-	অভ্যন্তরীণ সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	-	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প

শেখ মুজিবর

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমেদ

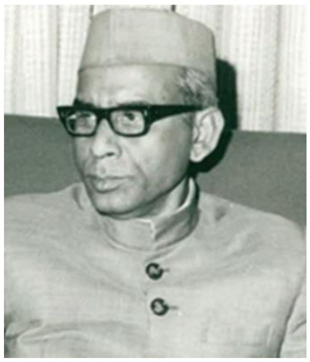
খন্দকার মোশতাক আহমদ

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

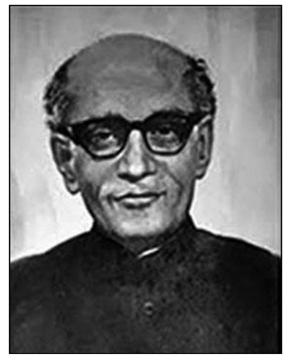
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

১৭ এপ্রিল (১৯৭১) নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। বাংলাদেশ সরকার কখনই বৈদ্যনাথতলায় অবস্থান করেননি। সরকারের প্রকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কোলকাতায়।

প্রবাসী সরকার ও মুক্তিবাহিনী

শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য সুশৃঙ্খল সামরিক কাঠামোর অধীনে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রয়োজন ছিল। এই দিকে তাজউদ্দীন আহমেদ নজর দিয়েছিলেন। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ এপ্রিল বেতারে তিনি একটি ভাষণ দেন। এখানে তিনি সারা দেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেছিলেন। তারপর গঠন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ১১ টি সেক্টর। মুক্তিযুদ্ধের ১১ টি সেক্টর হলো:

১ নং সেক্টর

চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকা ছিল ১ নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। ফেনী নদী থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি ও ফেনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সেক্টর। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে মেজর জিয়াউর রহমান দায়িত্বরত ছিলেন।

২ নং সেক্টর

ঢাকা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও কুমিল্লাার অংশবিশেষ ছিল সেক্টর ২ এর অংশ। মেজর কেএম খালেদ মোশাররফ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর এটিএম হায়দার এই সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

৩ নং সেক্টর

কুমিল্লাা, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ ছিল ৩ নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। হবিগঞ্জ, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ এবং কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল ৩ নং সেক্টর। মেজর কেএম শফিউল্লাাহ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন । মেজর এএনএম নুরুজ্জামান সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন ।

৪ নং সেক্টর

মৌলভীবাজার ও সিলেটের পূর্বাংশ সেক্টর ৪ এর অংশ ছিল। মূলত সিলেট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল ৪ নং সেক্টর। মেজর সিআর (চিত্তরঞ্জন) দত্ত এবং ক্যাপ্টেন এ রব ছিলেন সেক্টর নং ৪ এর কমান্ডার।

৫ নং সেক্টর

বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং সিলেট জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ৫ নং সেক্টর। সেক্টর নং ৫ এর সদর দপ্তর ছিল সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকের বাঁশতলায়। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী ।

৬ নং সেক্টর

রংপুর বিভাগ ছিল সেক্টর ৬-এর অন্তর্ভুক্ত। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহাকুমা ওব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ৬। কমান্ডার এমকে বাশার সেক্টর নং ৬-এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৭ নং সেক্টর

রাজশাহী বিভাগ ছিল সেক্টর ৭-এর অন্তর্ভুক্ত। রাজশাহী, পাবনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বগুড়া, দিনাজপুরের দক্ষিণ অঞ্চল ও রংপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ৭। মেজর নাজমুল হক, সুবেদার মেজর এ রব ও মেজর কাজী নুরুজ্জামান- এই তিনজন সেক্টর নং ৭ এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৮ নং সেক্টর

কুষ্টিয়া, যশোর, দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলা ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ৮। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী দায়িত্বরত ছিলেন ও আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ মঞ্জুর।

৯ নং সেক্টর

সুন্দরবন ও বরিশাল বিভাগ সেক্টর ৯ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ৯। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল।

১০ নং সেক্টর

সকল নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ছিল সেক্টর নং ১০-এর অংশ। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, নৌ কমান্ডো ও আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন সেক্টর নং ১০-এর অধীনে ছিল। ১০ নং সেক্টরের কোনো সাব-সেক্টর ছিল না এবং ছিল না নিয়মিত কোনো সেক্টর কমান্ডার। এই সেক্টরে নৌ কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে মিশনে নিয়োজিত থাকতেন, তখন সে সেক্টরের কমান্ডারের নির্দেশে কাজ করতেন।

১১ নং সেক্টর

বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগ ছিল সেক্টর নং ১১-এর অন্তর্ভুক্ত। কিশোরগঞ্জ বাদে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ১১। মেজর এম আবু তাহের এপ্রিল থেকে ৩ই নভেম্বর পর্যন্ত ১১ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারপর এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ফ্লাইট লেফট্যান্যান্ট এম হামিদুল্লাহ।

প্রবাসী সরকারের দপ্তর বণ্টন হলে তাজউদ্দীন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে রাখেন। ১৪ এপ্রিল কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক। মে ও জুন মাসে তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। ফোর্সগুলির নাম ছিল: 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' এবং 'কে ফোর্স'। অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান, লেঃ কর্ণেল কে. এম সফিউল্লাহ ও লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ।

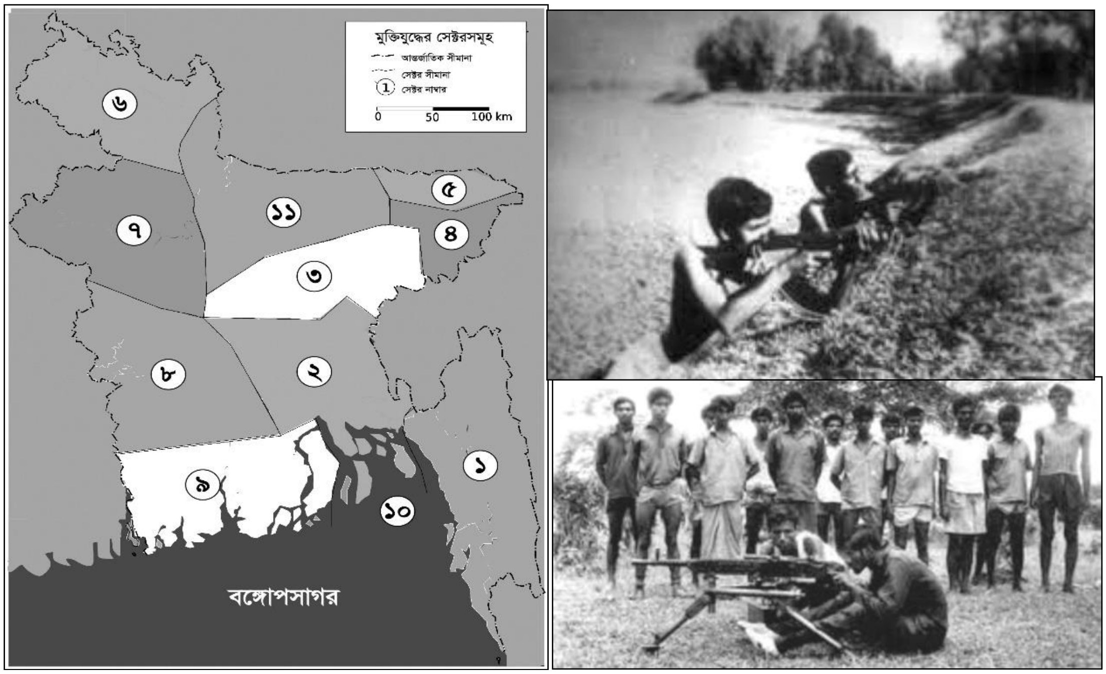

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্র

অসংগঠিত বা পরে সংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিফৌজ, বা মুক্তিসেনা নামে অভিহিত করা হতো। পরে যারাই যুদ্ধ করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত বাহিনীকে মুক্তিবাহিনী হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনিয়মিত ও নিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিতদের গণবাহিনী বলা হতো। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিল সৈন্যরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপি.আর.-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকিরা গণবাহিনীতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে গণবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো।

২৮ সেপ্টেম্বর এ.কে. খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিমান বাহিনী। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করা নৌসেনাদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া নৌকমান্ডোও গঠিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তিবাহিনী। এই প্রতিরোধ যুদ্ধের গৌরবময় পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের বিজয়ের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

২৫ মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। দেশের ভয়াবহ সংকটের মুখে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে। এরপর মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। প্রবাসী সরকার ১০ এপ্রিল সারাদেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেন। ১১ থেকে ১৭ জুলাই উক্ত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বৈদ্যনাথতলা কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞানমূলক)
ক) মেহেরপুর খ) ফরিদপুর
গ) যশোর ঘ) খুলনা

২। প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল কেন?
ক) দেশের অর্থ সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার জন্য খ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতার জন্য
গ) উজ্জীবিত বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ঘ) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বহির্বিশ্বের সহায়তা লাভের চেষ্টার জন্য

৩। সৈয়দ নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য–
i) তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা
ii) তিনি প্রবাসী সরকারের উপরাষ্ট্রপতি
iii) তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
ক) ৮ টি খ) ৯ টি গ) ১০ টি ঘ) ১১ টি

৫। মুক্তিযুদ্ধকালে ব্রিগেড ফোর্স হিসেবে কোনটি সঠিক নয় ?
ক) জেড ফোর্স খ) কে ফোর্স গ) এস ফোর্স ঘ) এল ফোর্স

পাঠ-১০.১৫ জেনোসাইড ও ১৯৭১-এর শরণার্থী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, শরণার্থীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পাবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বধ্যভূমির সংখ্যা বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জেনোসাইড, বধ্যভূমি, গণকবর, অপারেশন সার্চলাইট, শরণার্থী

ক. গণহত্যা

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ জেনোসাইড (Genocide)। গ্রিক জেনোস এবং লাতিন সাইড শব্দ দুটি মিলে জেনোসাইড শব্দের সৃষ্টি। জেনোস অর্থে বোঝায় জাতি। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গণহত্যার অর্থ কোন সরকার কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় জনগণকে নিঃশেষ করা। ১৯৪৫ সালে জেনোসাইড শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে গণহত্যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত যার কোন ক্ষমা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে। মাত্র নয় মাসে এত বেশি মানুষ আর কোথাও হত্যা করা হয়নি।

পাকিস্তানী বাহিনী পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রিতে। বাঙালিকে শক্তির সাহায্যে দমন করার পরিকল্পনার নাম তারা দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট' বাঙালিদের দমন করার জন্য ৩ ব্যাটালিয়ন সৈন্য 'অপারেশন সার্চ লাইটে' অংশগ্রহণ করে। রাত ১১ টার দিকে অপারেশন শুরু হয়। এই অপারেশনের লক্ষ্য ছিল গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ। ঐ রাতে পুরো ঢাকা শহর আক্রান্ত হয়। সে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের হত্যা করে জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন জায়গায় গণকবর দেয়া হয়। সে রাতে ৭ জন শিক্ষক শহিদ হয়েছিলেন। শাঁখারি বাজার, তাঁতিবাজার, নয়াবাজার পুড়িয়ে দেয়া হয়। সে রাতে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকা শহরে দশ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল।

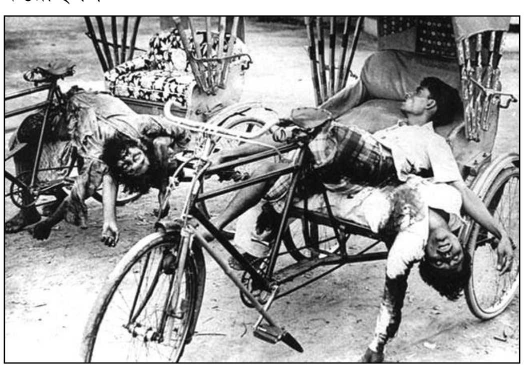

ভয়াল কালো রাত ২৫ মার্চ

২৫ মার্চ (১৯৭১) থেকে গণহত্যা শুরু হয় এবং তা চলে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই গণহত্যা চালানো হয়েছিল। যেখানে একসঙ্গে মৃতদেহ গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়েছে তাকে আমরা গণকবর বলি। আবার নির্দিষ্ট কিছু স্থানে মানুষ ধরে নিয়ে যেয়ে হত্যা করে ফেলে রাখতো– সেগুলি বধ্যভূমি নামে অভিহিত। যেমন ঢাকার রায়ের বাজার বধ্যভূমি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সংরক্ষণের অভাবে অনেক গণকবর ও বধ্যভূমি আজ বিলুপ্ত। এক জরিপে বাংলাদেশে এক হাজারেরও বেশি গণহত্যা ও বধ্যভূমির নাম পাওয়া গেছে।

গণহত্যা

খ. ১৯৭১-এর শরণার্থী

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শরণার্থী। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসরদের হত্যা, নিপীড়ন, ধর্ষণ এড়াতে ২৬ মার্চ থেকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালিরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী রাজ্যে যেতে থাকে। এরা শরণার্থী হিসেবে অভিহিত। বাংলাদেশের শতকরা ৯৪ ভাগ সীমান্ত ভারতের সাথে, বাকি ৬ ভাগ মিয়ানমারের সাথে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু বাসিন্দা সীমান্ত পেরিয়ে মিয়ানমারে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিয়ানমার যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সহানুভূতির সাথে দেখেনি, তাই মিয়ানমারের সীমান্ত অতিক্রম করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শরণার্থী সেদেশে বেশি যায়নি। বাংলাদেশের সংগে ভারতের পশ্চিমবাংলা, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত ছিল। এসব রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষজন শরণার্থীদের প্রতি সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল। উভয় অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিল আছে। অনেকের আত্মীয় স্বজনও ছিলেন ওপারে।। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশেও অনেক শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।

শরণার্থী স্রোত এপ্রিল থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতীয় হিসাব অনুযায়ী মোট ৯৮,৯৯,৩০৫ জন শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। শরণার্থী শিবিরের বাইরেও ছিলেন অনেক শরণার্থী। এই প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে স্বাভাবিক ভাবেই মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে। কলেরা ও অন্যান্য রোগে মারা গেছেন অনেকে।

১৯৭১-এর শারণার্থী

ভারত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শরণার্থীদের সাহায্য দেওয়ার। শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন ভারত বর্ষের সাধারণ মানুষ, প্রবাসী বাঙালি, জাতিসংঘ ও বিশ্ববাসী। তবে সেসব দান ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

শরণার্থী সমস্যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথমত: বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাপ ভারতের পক্ষে দীর্ঘদিন সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ভারত সরকারকে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছিল শরণার্থীদের জন্য। এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল পাকিস্তানের পরাজয় ও মুক্তিযুদ্ধের জয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। দ্বিতীয়ত: পাকিস্তান ভূখণ্ড থেকে শরণার্থীর স্রোত অনবরত ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে থাকায় পাকিস্তান এ কথা প্রমাণ করতে পারেনি যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে বিশ্বজনমত তার পক্ষে নেয়া সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত: শরণার্থী সমস্যাকে প্রধান করে ভারত বিশ্বজনমতকে তার পক্ষে ও বাংলাদেশের পক্ষে আনতে পেরেছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিজের এলাকার যেকোন একটি গণহত্যা বা বধ্যভূমি সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ছয় লক্ষ নারী নির্যাতিত হন। সেসময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। প্রতিবছরের মত এবারও ২৫ মার্চ রাতে তাসনিম তার বাবাকে কালো ব্যাজ পরতে দেখেছে। তিনি কোন হত্যাকান্ডের শোক প্রকাশের জন্য এই ব্যাজ পরছেন?
ক) ন্যাৎসি কর্তৃক ইহুদি নিধন খ) অপারেশন সার্চ লাইট
গ) হিরোশিমা নাগাসাকি হত্যাকান্ড ঘ) চুকনগর হত্যাকান্ড

২। ২৫ মার্চের গণহত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি কী চেয়েছিল?
ক) গণহত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলার মাটির নিয়ন্ত্রণ নিতে
খ) নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদদের হত্যা করতে
গ) অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বন্দি করতে
ঘ) ভীতিকর অবস্থা প্রদর্শন করে শাসন করতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সাজ্জাদ জহির একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে এসে তিনি বলেন– এক রাতে পাকবাহিনী বাংলায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। সে হত্যাযজ্ঞ এখনো বিশ্বব্যাপী নিন্দিত। নির্বিচারে তারা মানুষ হত্যা করে। অনেক অনৈতিক কাজ করে। যা প্রথমে ঢাকা এবং পরবর্তিতে সারা দেশে পরিচালিত হয়।

৩। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রাত হলো–
ক) ৭ মার্চের রাত খ) ১০ মার্চের রাত গ) ২৪ মার্চের রাত ঘ) ২৫ মার্চের রাত

৪। এ রাতে গণহত্যার কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i) বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাৎ করা ii) পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা iii) পাকিস্তানকে আলাদা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। এ রাতে গণহত্যার ফলে–

i) বাঙালির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়
ii) মানুষ ভীত হয়ে পালিয়ে যায়
iii) কঠোর প্রতিরোধ গড়তে প্রস্তুত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

১৯৯০ সালের ২ মার্চ ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রান্ত হয়। আকস্মিক আক্রমণে হতবিহবল কুয়েতি জনগণ পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশি দেশ সৌদিআরবে আশ্রয় নেয়। প্রতিবেশি দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান এর ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও জনগণ আশ্রয় প্রত্যাশী শরণার্থীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

ক. "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম" কে এই ঘোষণা দেন?
খ. প্রবাসী সরকার কেন গঠিত হয়?
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি পাকিস্তান আমলের যে ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে, পাঠ্য বইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উল্লিখিত মিত্র দেশটির সহযোগিতা ছিল আক্রান্ত দেশটির স্বাধীনতা লাভের অনুপ্রেরণা উৎস– উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-১০.১৬ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক ও পেশাজীবী শ্রেণির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা ও ভারতের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে দালাল, রাজাকার, আলবদর-আলশামসদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বুদ্ধিজীবী, 'পূর্ববাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ', 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' তারামন বিবি, সিতারা বেগম, বামপন্থী দল, প্রবাসী বাঙালি, জর্জ হ্যারিসন, ওস্তাদ রবিশঙ্কর, ইন্দিরা গান্ধী, পিস কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, বিহারী, টিক্কা খান, নারী নির্যাতন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের অতি দ্রুত জয়লাভের কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, নারী, শ্রমিক ও আপামর জনসাধারণের সমর্থন, প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ, ভারতের সমর্থন। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

ক. ছাত্রদের ভূমিকা

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৭৫% ছিল ছাত্র, যাদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে– যেমন সেকশন কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল বেশি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ছাত্ররাই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সংগে মাত্র তিন সপ্তাহের সামরিক ট্রেনিংকে সম্বল করে তারা নিজ জীবনকে বাজি রেখে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের পরোক্ষ ভূমিকাও ছিল। ছাত্রদের মধ্যে যারা সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কেউ শরণার্থী শিবিরে ও ইয়োথ ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে। কেউ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মুক্তি যোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করেছে।

খ. বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করা, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, প্রচার মাধ্যমকে সচল রাখার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা, রেডিওতে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রোগ্রাম প্রচার করা, প্রবাসী সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ ছিল অত্যন্ত জরুরি। এদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এসব কাজের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কেবল ১৯৭১ সালেই নয়, ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তাতেও বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেসময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পূর্ব বাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' (৬.৩.১৯৭১), 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' (৬.৩.১৯৭১) ইত্যাদি সংগঠন। তাছাড়া শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক সমিতি, আইনজীবী সমিতি, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি ও বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির ব্যানারে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণির সদস্যবৃন্দ রাস্তায় নেমে আসেন এবং বিভিন্ন মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অসংখ্য শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অসামরিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। যেমনঃ প্রবাসী শিক্ষকগণ ভারতীয় শিক্ষকবৃন্দের নৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ২১ মে (১৯৭১) গঠন করেন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল কোলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'। ভারতের শিক্ষকগণের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষকগণ শরণার্থী শিবিরে ৫৬ টি স্কুল চালু করেছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতি 'বাংলাদেশ : দ্যা রিয়েলিটি', 'বাংলাদেশ : দ্যা ট্রুথ' প্রভৃতি নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সদস্যগণ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন।

ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, নাট্যকার, চারু ও কারু শিল্পী প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইনটেলিজেন্টশিয়া'। এই সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত গঠনের কাজ করে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। কেউ সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারীরূপে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার রান্না করে, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে, সেবাদান করে ইত্যাদি নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিটি নারী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন ও স্ত্রী-এর যেকোনো একটি। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলোঃ কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে ৪০০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন। আগরতলার লেম্বুচোরা ক্যাম্পে মহিলা গেরিলা স্কোয়াড-এর আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর ট্রেনিং হয়। রণাঙ্গনের যোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। চিকিৎসার কাজে মহিলা চিকিৎসকগণের গৌরবময় দৃষ্টান্ত ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম। তিনিও বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন। জনমতগঠনে দেশী-বিদেশী নারী মহিলা সংগঠন যেমন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবংগ মহিলা সমিতি, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারী সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রশংসনীয় অবদান ছিল।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দলসমূহের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মস্কোপন্থী বামদলগুলো যেমন কমিউনিস্ট পার্টি (মনিসিংহ), ন্যাপ (মোজাফফর), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও কৃষক সমিতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই চারদলের প্রায় ছয় হাজার সদস্য বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা পালন করে এবং স্পেশাল গেরিলা বাহিনীর ২০০০ সদস্য ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। স্পেশাল বাহিনীর একটি দলকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ফিরে আসার পূর্বেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

চ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে (যেখানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন) বাঙালিরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন, স্মারকলিপি দেন, সংসদ সদস্যদের কাছে ধর্ণা দেন, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লন্ডনে ইউরোপের অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিরা এসে মিলিত হতেন। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিদেশের দূতাবাসসমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : কোলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের হোসেন আলী এবং অন্যান্য বাঙালি স্টাফ (১৮.০৪.৭১), নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনসুলেট জেনারেলের ভাইস কনসাল আবুল হাসান মাহমুদ আলী (২৬.০৪.৭১), লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন

আহমদ (১.০৮.৭১), ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসে ইকনমিক কাউন্সিল পদে কর্মরত আবুল মাল আব্দুল মুহিত (১.০৮.৭১), আবুল ফতেহ (ইরাকে কর্মরত ২১.০৮.৭১), হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (দিল্লীতে কর্মরত, ৪.১০.৭১), আবদুল মোমিন (আর্জেন্টিনায় কর্মরত, ১১.১০.৭১), ওয়ালিউর রহমান (সুইজারল্যান্ডে কর্মরত, ০৩.১১.৭১) প্রমুখ।
অতএব বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ছ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ বাঙালিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও সেদেশের নাগরিকেরা বাঙালিদের সমর্থনে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, মার্কিন সরকার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। যুক্তরাজ্যের নাগরিকেরা বাঙালিদের সংগে রাস্তায় নেমেছেন। পাকিস্তানে সিভিল সমাজের অনেকেই বাঙালিদের সমর্থন করতে গিয়ে জেলে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক কবি বাঙালি শরণার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকারের দানের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিতে অনশন করেছেন। বুয়েনস আয়ার্সে নোবেলজয়ী লেখক বোর্হের্স, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল করেছেন। জর্জ হ্যারিসন, রিংগো স্টার, লিয়ন রাসেল, ওস্তাদ রবিশঙ্কর প্রমুখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাঙালিদের জন্য কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। জন বেজ বাংলাদেশের জন্য গেয়েছিলেন। অ্যালেন গিনসবার্গ বাংলাদেশের জন্য কবিতা লিখেছেন।

জ. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে ভারতের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দীর্ঘ নয় মাস ভারত প্রায় এককোটি শরণার্থীর ভরণ-পোষণের সকল খরচ বহন করে। মুক্তিবাহিনীর জন্ম ভারতের মাটিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদান, অস্ত্র সরবরাহ, রসদ প্রদান এসবই করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী। শেষ পর্যন্ত যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। ভারত শরণার্থী খাতে প্রায় ২৬০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও রসদ খাতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করে। তাছাড়া পাকিস্তানি বাহিনী ও যৌথ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে ভারতের প্রায় চার হাজার অফিসার ও জওয়ান শহীদ হয়েছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের অবস্থান ছিল ভারতে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি কেবল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি, বিশ্ব জনমত গঠন করা, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক যোগাযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায় করা ইত্যাদি কাজগুলোও তারা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লিখতে হলে ভারতের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠি ও দল

লে. জেনারেল টিক্কা খান ৬ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও ৭ মার্চ গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ঐ দুই পদে বহাল থাকেন। ২ সেপ্টেম্বর ডা. এ.এম. মালিক গভর্নর এবং লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়। ডা. মালিকের নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর বাঙালিদের এক মন্ত্রিসভা গঠন করার মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সকল বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক নয়। এসব বিশ্বাসঘাতক বাঙালিরাই মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সরকারের বাইরে থেকেই সৃষ্টি করেছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী, সারাদেশে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও বিডি মেম্বারদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পিস কমিটি।

এসব পিস কমিটির সদস্য এবং রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ওপর চালিয়েছিল অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বাড়িঘর লুণ্ঠন ও তা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া এসব জঘন্য কাজ।

পিস কমিটি বা শান্তি কমিটি

৯ এপ্রিল (১৯৭১) ঢাকায় ডানপন্থী বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে ১০৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করে। ১৪ এপ্রিল কমিটির নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। পরে জেলা, মহকুমা, থানা ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি কমিটি সাধারণ মানুষের কাছে পিস কমিটি নামে বেশি পরিচিত। পিস কমিটির সদস্যদেরকে দালাল বলা হয়। এখনও মানুষ রাজাকার ও দালালকে আলাদা নামে চেনে। রাজাকার বাহিনী গঠন, রাজাকারদেরকে পরিচালনা করা, রাজাকারের অপকর্মকে সম্মতি দেয়া এবং রাজাকারকে দিয়ে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা, যুবতী মেয়েদেরকে ধরে আনা এসব কাজ দালালরাই করেছে।

রাজাকার বাহিনী

লে. জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ৭১' জারি করেন। তার পূর্বেই '৭১-এর মে মাসে মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ ৯৬ জন জামায়াত কর্মীর সমন্বয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে 'রাজাকার বাহিনী' গঠন করেন। পরবর্তীকালে অর্ডিন্যান্সে এই নাম গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান মোঃ ইউসুফ রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান রক্ষার সংগ্রামের চাইতে লুটপাট, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ এসব কাজে মগ্ন থেকেছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান দেওয়া, হানাদার বাহিনীকে তাদের বাড়িঘর চিনিয়ে দেওয়া, গ্রাম থেকে গরু-ছাগল-মুরগি ধরে এনে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্পে সরবরাহ করা, গ্রাম থেকে যুবতী নারী ধরে এনে আর্মি ক্যাম্পে সরবরাহ করা ইত্যাদি অপকর্মে রাজাকারদের নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

আলবদর বাহিনী

রাজাকার বাহিনী গঠনের পর আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। তবে রাজাকারের অধ্যাদেশের মত এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উদ্যোগ ও প্রেরণায় এই বাহিনী গঠিত হয়। আলবদরদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে পাকিস্তান বাহিনী। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরাই আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই বাহিনীর কাজ ছিল দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ভাবধারার সমর্থক ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক শ্রেণিকে হত্যা করা।

আলশামস বাহিনী ও বিহারী সম্প্রদায়

আলশামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানত অবাঙালি (বিহারি)-দের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী বাহিনী এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় এবং বাঙালি নিধনে দেয় অবাধ অধিকার। বাঙালির সম্পদ লুট করতেও এদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে বিহারী সম্প্রদায় যে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা অকল্পনীয়।

শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর বাহিনী প্রধানত গঠিত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মীয় পাকিস্তান পন্থী দলের কর্মী ও বিহারিদের দ্বারা। তবে, নৃশংস আলবদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রসংঘের সদস্যদের দ্বারা।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী ও দল সম্পর্কে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, পেশাজীবী শ্রেণি, শিল্পী, খেলোয়াড়, প্রবাসী বাঙালি প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও অবদান ছিল। অনেক বিদেশী নাগরিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তান সরকারকে ও বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে–

i) কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক ii) পুলিশ ইপিআর সেনাবাহিনী iii) আলবদর আল শামসবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে কতজন নারী সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহন করেন? (জ্ঞান)

ক) ২০০ জন খ) ৪০০ জন গ) ৬০০ জন ঘ) ৮০০ জন

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন, শুধু এদেশের সর্বস্তরের জনগণই নয় অনেক দল ও সংগঠন এমনকি অনেক দেশ ও এ যুদ্ধে সহায়তা করেছে প্রতিবেশী একটি দেশ প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে সে সময় আশ্রয় দেয়। যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা তৈরির সশস্ত্র প্রশিক্ষণও দিয়েছিল।

৩। এদেশকে বেসরকারিভাবে সহযোগিতা করেছিল– (অনুধাবন)

i) অধিকাংশ রাজনৈতিক দল

ii) পেশাজীবী সংগঠন

iii) সেনাবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন দেশের কথা বলা হয়েছে–

ক) চীন খ) নেপাল

গ) ভারত ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বুয়েনস আয়ার্সে মিছিল করেছেন–

i) বোর্হেস ii) অ্যালেন গিনসবার্গ iii) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.১৭ মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরাশক্তি, চিন, আমেরিকা, মুসলিম দেশ, ভারত, সেভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ, শরণার্থী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। একভাগের নেতৃত্বে পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ও মুসলিম দেশসমূহ, অন্যদিকে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহ এবং ওআইসি বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার প্রতিবাদ করেনি বরং পাকিস্তানকে সমর্থন করতে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে। সোভিয়েত বলয়ভুক্ত দেশসমূহ সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। মার্কিন বলয়ভুক্ত দেশসমূহ মার্কিনী সরকারের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়নি। তারা গণহত্যার নিন্দা করেছে, শরণার্থীদের সহায়তা করেছে, রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানিয়েছে। চিন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। চীনের গণহত্যা সমর্থন বিশ্বজুড়ে এমনকি ভারত ও বাংলাদেশের চিনাপন্থী কমিউনিস্টদের বিপদে ফেলেছে।
জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে তিন পরাশক্তির বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের সহায়তা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যের নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে বাঙালির স্বাধীকার সমস্যার সমাধান করা। বাংলাদেশের ঘটনায় ব্রিটেন সরকারিভাবে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকারের নিরপেক্ষ নীতির কারণে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকায় ও বেতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারণা সহজতর হয়েছিল এবং ব্রিটেনের মাটিকে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার জন্য কোন সরকারি বাধা বিঘ্ন ছাড়াই জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এসব অবস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন সরকার পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। এমনকি ডিসেম্বরে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে। সে সময় মার্কিন সরকারের যুক্তি ছিল যে, পাকিস্তান পুরনো বন্ধু, সিয়াটো-সেন্টোর সদস্য, সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ, তদুপরি মার্কিন-চিন সম্পর্ক উন্নয়নে পাকিস্তান তখন মধ্যস্থতা করছিল। কিন্তু তখন মার্কিন আইন পরিষদের সদস্যরা, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, গণমাধ্যম, জনসাধারণ অর্থাৎ এক কথায় সরকার ব্যতিরেকে আর সকলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে একটি অ্যাসাইমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। ভারত ও সেভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তবে সবদেশের জনমত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। পরাশক্তিসমূহের বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। সে সময় যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব কয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল–

ক) ২টি খ) ৩টি

গ) ৪টি ঘ) অবিভক্ত

২। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য কোন সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেয়?

ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) যুক্তরাজ্য

গ) সংযুক্ত আরব আমীরাত ঘ) চিন

পাঠ-১০.১৮ স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও বিজয় দিবস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো দেবার বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গেরিলা আক্রমন, ইন্দিরা গান্ধী, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী, ভারতীয় বাহিনী, যৌথবাহিনী, মুক্তিবাহিনী, সপ্তম নৌবহর, জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জেনারেল নিয়াজী, কাদের সিদ্দিকী।

পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসর দালাল, আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন বাড়তে থাকে। ভারত ক্রমশ পাকিস্তানের সংগে সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করেন। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে-স্পষ্ট করে বলা হয় যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী এক দেশ আক্রান্ত হলে অন্য দেশ তাকে সাহায্য করবে। নভেম্বরে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীকে স্পষ্ট করে নির্দেশ দেয়া হয় যে, সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর হামলায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার হুমকি দেখা দিলে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে। এভাবে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক যৌথভাবে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনি পরিস্থিতিতে আসন্ন পরাজয়ের মুখে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ১৮ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ভারতের বিমান বাহিনী। মুক্তিবাহিনী ও যৌথবাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সর্বত্র পিছু হটতে শুরু করে।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে তৎকালীন রমনায় [বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] রেসকোর্সে পাকিস্তান বাহিনী ও এর সহযোগী শক্তিসমূহের আত্মসমর্পণ

৬ ডিসেম্বর ভূটান ও ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিন তিনবার ভেটো দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর প্রেরণ করে। তার পাল্টা ভারত মহাসাগরে অবস্থিত

সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম নৌবহর ৭ম নৌবহরের পিছু নেয়। মিত্র বাহিনীও মার্কিন নৌবহরের চট্টগ্রাম অবতরণের সকল ব্যবস্থাই অচল করে দেয়। শেষপর্যন্ত জেনারেল আবদুল্লাহ নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্সের যে স্থানে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে ৯৩ হাজার সৈন্য ও অফিসারসহ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জিওসি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খোন্দকার উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর সংগে ঢাকায় আগত কাদের সিদ্দিকীও ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলির বিবরণ লিখে শিক্ষককে দিন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথবাহিনী। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিন তিনবার ভেটো দেয়। যৌথবাহিনীর হাতে পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়ে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বিজয় ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৮

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার যথার্থ কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
ক) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ খ) পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ
গ) পাকিস্তানের নেপাল আক্রমণ ঘ) পাকিস্তানের ভুটান আক্রমণ

২। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে ভেটো দানকারি দেশ হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) ভারত খ) চীন
গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘ) ফ্রান্স

৩। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের কত হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল?
ক) ৯০ হাজার খ) ৯১ হাজার
গ) ৯২ হাজার ঘ) ৯৩ হাজার

৪। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় দিবস কবে?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৭ এপ্রিল ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১ :	১। গ	২। ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২ :	১। গ	২। ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩ :	১। খ	২। খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪ :	১। ক	২। ক	৩। খ	৪। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫ :	১। ক	২। ক	৩। ক	৪। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬ :	১। ক	২। ঘ	৩। ঘ	৪। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭ :	১। ঘ	২। খ	৩। ক	৪। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮ :	১। ক	২। খ	৩। ঘ	৪। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯ :	১। ঘ	২। ক	৩। গ	৪। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০ :	১। ঘ	২। ক	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১ :	১। ঘ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২ :	১। গ	২। ক	৩। ঘ	৪। ক	৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩ :	১। খ	২। গ	৩। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৪ :	১। ক	২। ঘ	৩। ঘ	৪। ঘ	৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৫ :	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। খ	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৬ :	১। ক	২। খ	৩। ক	৪। গ	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৭ :	১। ক	২। খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৮ :	১। খ	২। গ	৩। ঘ	৪। ঘ	

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন
(Bangladesh and International Organization)

ইউনিট ১১

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপর রাষ্ট্রের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার ওপর ভিত্তি করে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সকল রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি ও রূপরেখা তৈরী করে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশের নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। এ ইউনিটে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন সার্ক, জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি-এর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১১.১ সার্ক (SAARC)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সার্ক কি এবং এর লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ কি কি তা বলতে পারবেন।
- সার্কে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সহযোগিতা, প্রস্তাব, সহযোগী, পর্যবেক্ষণ, লক্ষ্য, সনদ, শীর্ষ, সম্মেলন, কনভেশন

SAARC বা South Asian Association for Regional Cooperation দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সংগঠন। দক্ষিণ এশিয়া একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ও বৈচিত্রময় জনপদ। দক্ষিণ এশিয়ায় ৮টি দেশের জনসমষ্টি একত্রে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ। দেড় শত কোটির অধিক মানুষের এ অঞ্চল ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তসম্পর্ক তেমন জোরদার না হওয়ায় আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে সার্কের সফলতা তেমন উজ্জল নয়। বাংলাদেশ সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী রাষ্ট্র। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সার্কের যাত্রা শুরু।

সার্ক সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৮১ সালে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে মিলিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে সাতটি দেশের সরকার প্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলনে ঢাকায় এটি গঠিত হয়। সার্কের বর্তমান সদস্য দেশ ৮টি। দেশগুলো হলো বাংলাদেশ,

ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। আফগানিস্তান সার্কের সর্বশেষ সদস্য। সার্কের পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থা ৭টি, এগুলো হচ্ছে; চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, মরিশাস ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

সার্কের লক্ষ্য সমূহ নিম্নরূপ-

১. জনজীবনের মানোন্নয়ন : অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধন করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন হচ্ছে সার্ক সনদের প্রধান লক্ষ্য।

২. যৌথ স্বয়ম্ভরতা অর্জন : সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি রচনা ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৭টি দেশের একই সাথে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা।

৩. আস্থা ও সমঝোতা সৃষ্টি : সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান ভুল বোঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রভৃতি দূর করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতা সৃষ্টি করা।

৪. যৌথ কার্যক্রম সূচনা : অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির লক্ষ্যে যৌথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়িত করা।

৫. পারস্পরিক সহযোগিতা : সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন করে সহযোগিতার বন্ধনকে দৃঢ় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রকে উত্তরোত্তর প্রসারিত করা।

৬. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা : আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে পরস্পরকে সহযোগিতা প্রদান।

সার্কের সাংগঠনিক কাঠামো

সার্ক সনদে এ সংস্থার জন্য পাঁচ স্তরবিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। যথাঃ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন, ২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, ৩. স্ট্যান্ডিং কমিট, ৪. টেকনিক্যাল কমিটি এবং, ৫. সার্ক সচিবালয়

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

সার্কের সহযোগিতার নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারিত হয়েছে ১. কৃষি, ২. স্বাস্থ্য ও জনসেবা, ৩. আবহাওয়া, ৪. ডাকসেবা, ৫. মাদকদ্রব্য পাচার ও অপব্যবহার রোধ, ৬. পল্লী উন্নয়ন, ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৮. ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি, ৯. টেলিযোগাযোগ, ১০. যাতায়াত ও যানবাহন, ১১. নারী উন্নয়ন, ১২. অডিও ভিজুয়াল বিনিময়, ১৩.সংগঠিত পর্যটন, ১৪. ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র, ১৫.স্কলারশীপ ও ফেলোশিপ, ১. দারিদ্র্য বিমোচন, ১৭. পরিবেশ, ১৮. সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, ১৯. যুব স্বেচ্ছাসেবক বিনিময়, ২০.আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয় এবং ২১. এনজিও বিষয়ক।

সার্ক ও বংলাদেশ

সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা হলেন বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। মূলত বাংলাদেশের তৎপরতা এবং উৎসাহে অপরাপর দেশসমূহের সহযোগিতায় গঠিত হয় এই আঞ্চলিক সংস্থাটি। তাই সার্কে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন সম্মেলন ও বৈঠকে রেখেছে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ১৯৮৭ সালের ৪ নভেম্বর কাঠমন্ডুতে স্বাক্ষরিত হয় 'সন্ত্রাস দমন' সম্পর্কিত সার্ক আঞ্চলিক কনভেনশন ও সার্ক খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত চুক্তি। যেখানে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯০ সালের ৩ নভেম্বর মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে স্বাক্ষরিত হয় সার্ক মাদক সংক্রান্ত কনভেনশন। মালদ্বীপের এই চুক্তির উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ। অন্যদিকে, ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয় 'সার্ক প্রিফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (সাপটা)' এবং সার্ক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বাক্ষরিত হয় সমঝোতা স্মারক। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরেও বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ২০০৪ সালে ইসলামাবাদে স্বাক্ষরিত হয় দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সাফটা। সাফটা ও সন্ত্রাস দমন সম্পর্কিত সার্ক আঞ্চলিক কনভেনশনের উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ।

শিক্ষার্থীর কাজ	সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক সংগঠন যা ১৯৮০ সালে গঠিত হয়। সার্কের উদ্যোক্তা বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সার্কের বর্তমান সদস্য দেশগুলো হল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন হচ্ছে সার্কের প্রধান লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। সার্কের সদস্য নয় কোন্ রাষ্ট্রটি?

ক. নেপাল খ. মালদ্বীপ গ. মিয়ানমার ঘ. ভূটান

২। সার্ক গঠিত হয়েছে-

(i) পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে

(ii) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে

(iii) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.২ জাতিসংঘ (The United Nations)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিশ্বশান্তি, বিরোধ মীমাংসা, আটলান্টিক সনদ, পরিষদ, মানব উন্নয়ন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯২০ সালে গঠিত হয় লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও মানবজাতিকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে জাতিপুঞ্জ সে লক্ষ্য রক্ষা করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জাতীয় স্বার্থ রক্ষার আকাঙ্খা। যার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ হতে বিশ্বকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশ্ব নেতারা উপলব্ধি করে এমন একটি কার্যকর সংস্থার যা জাতিসমূহের বিরোধ মীমাংসায় সফল ভূমিকা পালন করবে। এই চিন্তা থেকেই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ১৯৪১ সালে ঘোষণা দেন আটলান্টিক সনদের। যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। একাধিক শীর্ষ বৈঠক করেন এসব রাষ্ট্রের সরকার প্রধানরা। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে মিলিত হয়ে জাতিসংঘ (United Nations) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। একই বছরের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪ অক্টোবরকে তাই জাতিসংঘ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের মোট পাঁচটি কার্যকর পরিষদ রয়েছে। এগুলো হল-

ক. সাধারণ পরিষদ
খ. নিরাপত্তা পরিষদ
গ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
ঘ. আন্তর্জাতিক আদালত এবং
ঙ. জাতিসংঘ সচিবালয়

জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি অদ্বিতীয় সংগঠন হিসাবে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবক হিসাবে জাতিসংঘকে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘ কোন বিশেষ সরকার বা কোন একক জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। জাতিসংঘ হল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর একটি সমিতি, যা তার সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। নিম্নে জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হল-

১. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, যুদ্ধ বা শান্তিভঙ্গের যেকোন সম্ভাবনা রোধে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
২. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা। প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
৪. প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি এবং তা সমুন্নত রাখা।
৫. বিশ্বব্যাপী মানব জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাবলীর সমাধানে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।

জাতিসংঘের সফলতা: বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘের সৃষ্টি। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘ উল্লেখ্য যোগ্য বিরোধ মামীংসা করেছে এবং প্রতিরোধ করেছে। গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, দারিদ্র বিমোচন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় জাতিসংঘের জুড়ি মেলা ভার। বিশ্ব ব্যাপী মারণাস্ত্র রোধ, বলকান গণ হত্যার বিচার, আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তি রক্ষা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা: জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সকল উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এখনও বিশ্বের ক্ষুদা, দারিদ্র, বৈষম্য ও যুদ্ধ রয়েছে। বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যা, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যা, উত্তর কোরিয়া সমস্যাসহ আরও নানা ধরনের বিষয় অমীমাংসিত আছে। দেখা দিয়েছে নতুন অনেক সমস্যা। যার অনেকগুলোই নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর সবচেয়ে বড় সংস্থা জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার বিস্তার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি মানব উন্নয়ন জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৫টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। সদস্যপদ প্রাপ্তির পর থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নেও জাতিসংঘের ভূমিকা প্রসংশনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হল ....।

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান ও চীন
(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও জার্মানি
(গ) যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন
(ঘ) যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া ও চীন

২। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার কারণ কি?

(i) নিরাপত্তা রক্ষা
(ii) সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
(iii) কূটনীতি রক্ষা
(iv) বৃহৎ শক্তির স্বার্থ রক্ষা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i
(খ) ii
(গ) i ও ii
(ঘ) i ও iv

পাঠ-১১.৩ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক (Relation between UN and Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অঙ্গ সংগঠন, উন্নয়ন কর্মসূচী, শান্তিরক্ষী, শরণার্থী ক্যাম্প, প্রকল্প

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট ছিল। অবশেষে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬ তম সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। অবশ্য এর বহু আগেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন যেমন- UNCTAD, UNDP, WHO - ইত্যাদিতে যোগদান করে। বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্ককে দুইভাগে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা এবং দ্বিতীয়ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবিক সহযোগিতা প্রদান

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন প্রদান না করলেও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী লাখ লাখ শরণার্থী বাঙালিকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। এদেশের জনগণ আজও তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর দেশের বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তর সাহায্যকল্পে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ মানবিক তৎপরতা শুরু করে। সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশে জাতিসংঘের উদ্বাস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. স্বাস্থ্য সেবা কর্যক্রম

বাংলাদেশে সবার স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (Work Health Organization)। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় কমিটি ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা পানি ও পয়:নিষ্কাশন, পরিবেশ উন্নয়ন, নারী ও শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপের মাধ্যমে UNICEF কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্ব থেকে গুটিবসন্তের উচ্ছেদ ঘোষণা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১৩ বছরব্যাপী কর্মসূচি চালানোর পর এ সাফল্য অর্জিত হয়।

৩. দুর্যোগ ও মহামারী মোকাবেলা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রতিবছর বন্যা, অতিবৃষ্টি লেগেই আছে। বাংলাদেশে জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, টর্নেডো, মহামারী এসব দুর্যোগময় মুহূর্তে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং জাতিসংঘের আহ্বানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসহ সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ দুর্যোগ দেখা দিলে জাতিসংঘের আহ্বানে বাংলাদেশেও তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

৪. বাংলা ভাষার মর্যাদা দান

আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালে আমাদের দেশের ছেলেরা রক্ত দিয়েছিল। জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" পালনের ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

৫. বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা

বাংলাদেশে উন্নয়ন সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘের United Nations Development Programme (UNDP)-এর অবস্থান শীর্ষে। দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের মতো ৫টি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপসহ বাংলাদেশস্থ UNDP-এর ১৯৯৯-২০০১ সালের সাহায্যের পরিমাণ ৮৫ মিলিয়ন ডলার। এগুলোর মূলকথা হল লাগসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় UNDP কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৬. খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রে

খাদ্য ঘাটতি লাঘব এবং জরুরি কার্যক্রমে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জরুরি ত্রাণ কাজে WFP ৪০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে FAO-এর প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় শতাধিক।

জাতিসংঘের বিভিন্ন পদে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছে এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া ESCAP- এর নির্বাহী সচিবের পদমর্যাদায় ১৯৮১-৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি টি এইচ খান International Criminal Tribunal-এর সদস্য হিসেবে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে, প্রয়াত স্পীকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী Human Rights Commission-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। শান্তি মিশনেও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুস সালাম UN Peacekeeping Mission-এর কমান্ডার হিসেবে ১৯৯২-৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশনের প্রধান সামরিক লিয়াজোঁ অফিসার পদে ব্রিগেডিয়ার রেজাউল হায়দার দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য হিসাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের লাখ লাখ শরণার্থীকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছে এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘের UNDP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগময় মুহূর্তে জাতিসংঘ তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসহ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?

ক. ১৩৬ খ. ১৩৭ গ. ১৩৮ ঘ. ১২৭

২। বাংলাদেশে উন্নয়নে সাহায্য প্রদানকারী জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে-

ক. ইউনেস্কো খ. ইউএনডিপি গ. ইউএনএইচআর ঘ. এফএও

পাঠ-১১.৪ বিশ্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা (Role of Bangladesh in UN Peacekeeping Forces)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- জাতিসংঘে যেসব মিশনে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে সেসবের নাম বলতে পারবেন।
- জাতিগত সহিংসতা নিরসনে শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের অনুসৃত কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিরোধপুষ্ট, মিশন, যুদ্ধবিরতি, বিশ্বশান্তি, রসদ-সরঞ্জাম, শান্তিসেনা

শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অধীনে বিভিন্ন দেশের বাহিনীর অংশগ্রহণকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বলা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তির্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি কার্যকর বিধি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জাতিসংঘের নেতৃত্বে বিরোধপূর্ণ স্থানগুলোতে শান্তিরক্ষী মিশন প্রেরণ করা হয়। শান্তিরক্ষা কর্যক্রমে অংশগ্রহণকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সদস্য দেশগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সরবরাহ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শান্তিরক্ষী মিশনগুলো কাজ করে। জাতিসংঘ সনদের ৪৩ ও ৪৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শান্তিরক্ষী বাহিনী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি তদারকি ও কার্যকর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে কাজ করে। সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ গত প্রায় সাত দশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বব্যাপী পরমাণু ও মারণাস্ত্রের বিকাশ রোধে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়ে মূলত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের শুরু। এর পর থেকে প্রায় ১১৫টি সদস্য রাষ্ট্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ৮ লক্ষাধিক সদস্য কাজ করেছে। সম্প্রতিকালেও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে শান্তিরক্ষী মিশন কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিন, কঙ্গো, ইরিনিয়া, সোমালিয়া, হাইতি, সেনেগাল, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, পূর্ব তিমুরসহ ৪৮টি রাষ্ট্রে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ দায়িত্ব পালনকালে ১৬৫০ জনের মতো শান্তি সেনা মারা গেছেন। এদের জনবল, সরঞ্জাম ও রসদ যোগান দিয়েছে বিশ্বের ১৮০টি দেশ। জাতিসংঘের *Department of Peacekeeping Operations (DPKO)*এর তথ্য মতে (মার্চ, ২০১৬),১৬টি মিশনে ১২৮টি দেশ থেকে ১ লাখ ১৮ হাজার শান্তি সেনা কর্মরত আছে।

শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

বিগত চার দশক ধরে শান্তিরক্ষা মিশনে বিশেষ অবদান রাখছে বাংলাদেশ। এজন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের প্রধান বা সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণকারী শীর্ষ দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। ২০১৬ সালের তথ্য মতে, জাতিসংঘের ১০টি রাষ্ট্রের ১১টি মিশনে বাংলাদেশের প্রায় নয় হাজার সৈন্য নিয়োজিত আছে। *Bangladesh Armed Forces Division*এর তথ্য মতে, বাংলাদেশ ১৯৮৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৪০ টি রাষ্ট্রে ৫৪টি শান্তি মিশন কার্যক্রমে শান্তিসেনা প্রেরণ করেছে। আর তাতে অংশ নিয়েছে সশস্ত্রবাহিনীর (সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী) সর্বমোট ১,১৯,৯৮০ জন সদস্য। শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। এই মহান কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কঙ্গো, সিয়েরালিওনসহ বেশ কয়েকটি

রাষ্ট্রে বাংলাদেশের কয়েক শত সেনাসদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। বাংলাদেশী সেনাদের আত্মত্যাগ বিশ্ব সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে, যা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল করেছে।

জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখছে-

- যুদ্ধ ও অস্ত্র বিরতি কার্যকরকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বিবদমান গ্রুপগুলোর মাঝে অবস্থান এবং উত্তেজনা প্রশমন।
- নিবৃত্তিমূলক সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের পরিবেশ তৈরি করা।
- যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং বিবদমান গ্রুপগুলোকে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করা।
- সমস্যা উত্তরণে বিবদমান রাষ্ট্রে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।
- যুদ্ধবিরতি শেষে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে প্রশাসন পরিচালনা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের মানবিক সাহায্য প্রদান।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ভূমি মাইন অপসারণ ও অন্যান্য স্থাপনা পুনর্গঠন করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ কি কি দায়িত্ব পালন করে?

সারসংক্ষেপ

বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বহু দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন থেকে শুরু করে জাতিগত দাঙ্গা নিরসন, যুদ্ধের মুখোমুখি অবস্থা থেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থা আনয়ন, মানবিক ত্রাণ তৎপরতা, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর ও তা তদারকি, গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশের সেনারা কাজ করছে। এসব কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী জাতিগত যুদ্ধ ও সহিংসতা কমিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশ শান্তি মিশনে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করে কোন্ সালে?

ক. ১৯৮৭ খ. ১৯৮৮ গ. ১৯৮৯ ঘ. ১৯৯১

২। জাতিসংঘ সনদের কোন্ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শান্তিরক্ষী বাহিনী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে কাজ করে?

ক. ৪৩ ও ৪৪ খ. ৪৪ ও ৪৫ গ. ৪৩ ও ৪৭ ঘ. কোনটি নয়

পাঠ-১১.৫ কমনওয়েলথ (The Commonwealth)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কমনওয়েলথ এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সঙ্গে কমনওয়েলথ-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উপনিবেশ, কর্মসূচি, সচিবালয়, সহযোগিতা, মানব উন্নয়ন, শিক্ষা সংস্কৃতি, স্থগিত

সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত স্বাধীন ও আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত দেশগুলোর (যারা এখন স্বাধীন) আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কমনওয়েলথ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম। শিক্ষার উন্নয়নে কমনওয়েলথয়ের ব্যাপক কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা দান, পল্লী উন্নয়নকে কমনওয়েলথ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মূলত সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে কমনওয়েলথয়ের মাধ্যমে সহায়তা দান করে বৃটেন। কমনওয়েলথ (Commonwealth) -এর পূর্বনাম ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস্ (Brithsh Commonwealth of Nations)। ১৮ নভেম্বর ১৯২৬ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস্ ধারণার পত্তন হয়। ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইন ‘স্ট্যাচু অব ওয়েস্ট মিনিস্টার’-এ উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৯ সালের ২৮ এপ্রিল লন্ডন ঘোষণা অনুযায়ী আধুনিক কমনওয়েলথের আত্মপ্রকাশ। তখন সংস্থাটি থেকে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়ে কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস্ করা হয়। ১৯৬৫ সালের আগে কমনওয়েলথের কোনো সবিচালয় ছিল না। ১৯৬৫ সালে লন্ডনের মার্লবরো হাউসে কমনওয়েলথ সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে কমনওয়েলথ সচিবালয় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মর্যাদা লাভ করে।

কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ: কমনওয়েলথয়ের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। নিম্নে অঞ্চল ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলোর নাম উল্লেখ করা হল-

আফ্রিকা (১৮) : ক্যামেরুন, বতসোয়ানা, গাম্বিয়া, ঘানা, কেনিয়া, লেসোথো, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সিয়েরা, লিওন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া, মালাবি, মরিশাস ও সিচেলেস।

উত্তর আমেরিকা (১২) : কানাডা, এন্টিগুয়া ও বারবুডা, বাহামা, বার্বাডোস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইন্স, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া ও বেলিজ।

এশিয়া (৮) : বাংলাদেশ, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ভারত ও শ্রীলংকা।

দক্ষিণ আমেরিকা (১) : গায়ানা।

ওশেনিয়া (১১) : অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গা, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, ভানুয়াতু, নাউরু, নিউজিল্যান্ড ও টুভ্যালু।

ইউরোপ (৩) : ব্রিটেন, সাইপ্রাস ও মাল্টা। এর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীন বহির্ভূত সদস্য মোজাম্বিক (১৯৯৫)। বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ করে ১৮ ফিব্রুয়ারি ১৯৭২। বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের জন্য পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করে ১৯৭২ সালে। কমনওয়েলথ ত্যাগকারী দেশ আয়ার্যাণ্ড (১৯৪৬ সালে) ও জিম্বাবুয়ে (৭ ডিসেম্বর ২০০৩)। কমনওয়েলথের বিশেষ সদস্য নাউরু (৯ জানুয়ারি ২০০৬-বর্তমান) বর্তমানে সদস্যপদ স্থগিত ফিজির (৮ ডিসেম্বর ২০০৬-বর্তমান)।

কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা: ১৯৬৫ সালে লন্ডনে কমনওয়েলথের সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কোন সংবিধান নেই। ১৯৭১ সালে সিঙ্গাপুর সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্র সমূহ কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালা সমূহ হলঃ

১. জাতিসংঘের প্রতি সমর্থন ও সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলা,
২. ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সমর্থন,
৩. জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং
৪. বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস ও গণতন্ত্রায়ণ।

এসব নীতিমালার আলোকে কমনওয়েলথ সদস্যগণ একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কমনওয়েলথের সহযোগিতার ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ, রপ্তানি বাজার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ও কারিগরী সহায়তা, কৃষি পণ্য উৎপাদনে সহায়তা, গবেষণা, দারিদ্র্য বিমোচন, বর্ণ বৈষম্য রোধ, গণতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রভৃতি।

বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথের মূল রাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ১৯৭১ সালে গ্রেট বৃটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষত, বিবিসি, লন্ডন টাইমস, দ্য সান, গার্ডিয়ান, মিরর পত্রিকা স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালি জনগণের উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করেছিল। বৃটেনসহ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের জন্য ব্যাপক সাহায্য দিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো অকাতরে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছে। স্বাধীন দেশ হিসাবে কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশকে ১৯৭২ সালেই দ্রুত স্বীকৃতি দেয়। এজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করেছিল। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনীতি ও সরকার-বিরাধীদলের দাঙ্গাপূর্ণ সম্পর্ক অবসানে বিভিন্ন সময় কমনওয়েলথ মহাসচিব মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	কমনওয়েল্থ গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সাবেক বৃটিশ উপনিবেশভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে কমনওয়েলথ গঠিত। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। বৃটেনের রাণী এই সংস্থার প্রধান। ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশ গুলোর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্টি সত্য নয়?
ক. বেলফোর ঘোষণা কমনওয়েলথ এর ভিত্তি খ. কমনওয়েলথের সচিবালয় লন্ডনে
গ. কমনওয়েলথের কোন সংবিধান নেই ঘ. ৫৯ টি রাষ্ট্র কমনওয়েলথের সদস্য

২। কোন্ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

পাঠ-১১.৬ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) কখন এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা বলতে পারবেন।
- ওআইসির লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন।
- ওআইসির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সম্মেলন, নিন্দা, সমর্থন, ভ্রাতৃত্ববোধ, আগ্রাসন, স্বাধীন রাষ্ট্র, ফিলিস্তিন, ইসরাইল, ন্যায়সঙ্গত

ওআইসি (OIC) এর পূর্নরূপ হল Organization of Islamic Conference। বাংলায় ‘‘ইসলামী সম্মেলন সংস্থা।’’ ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল অতর্কিতে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে। এই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ২৪ টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন। শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭২ সালের সৌদি আরবের জেদ্দায় তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ওআইসি’র একটি খসড়া সনদ অনুমোদিত হয়। শুরু হয় ওআইসি’র যাত্রা।

ওআইসি’র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় ও জোরদার করা এবং ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিনী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রদান, সমগ্র বিশ্বের সংগ্রামরত মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি সমর্থন দেয়া, ও.আই.সি. ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যকার বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রদান প্রভৃতি সংস্থাটির প্রধান লক্ষ্য।

ওআইসি-বাংলাদেশ সম্পর্ক

বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। এদেশের প্রায় ৯০ ভাগ জনগোষ্ঠী মুসলিম। তারপরও কয়েকটি কারণে বাংলদেশকে মুসলিম বিশ্বে নিজের স্থান করে নিতে সময় লাগে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের ভ্রান্ত ধারণা এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনই এর জন্য প্রধানত দায়ী। ‘সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া এবং হিন্দুপ্রধান ভারত ইহুদীদের যোগসাজশে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙ্গেছে’- এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী প্রদান করেছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এ ধারণার পরিবর্তন আসতে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৪ সালের লাহোর সম্মেলনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ওআইসির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক জনশক্তি প্রতি বছর মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমায়। এ থেকে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এছাড়া ওআইসির অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কও রয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলা, উন্নয়ন প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ এসব র‍্যাাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে।

ও.আই.সি.’র সদস্য হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্কের ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ তার বলিষ্ঠ ভূমিকার মাধ্যমে এটা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ ও.আই.সি. এর সদস্য হওয়ার পূর্বেও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরবদের প্রতি সমর্থন জানায় এবং ইসরাইলের আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানায়। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসরাইলী দখল থেকে আরব ভূমি পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ আকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে আসছে। মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ধারাবাহিক ও বলিষ্ঠ ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৬ সালে সেনেগালের

রাজধানী ডাকারে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গঠিত ১৬ সদস্য বিশিষ্ট আল-কুদস্ বা জেরুজালেম বিষয়ক কমিটিতে বাংলাদেশ অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৮০ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুরু হলে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে যে কমিটি গঠন করে সেখানে বাংলাদেশ সদস্যরূপে কাজ করে। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওআইসি গাজীপুরে একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় ও জোরদার করণের লক্ষ্যে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিনী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রদান করতে মুসলিম বিশ্ব ওআইসি প্রতিষ্ঠা করে। একইসঙ্গে সংস্থাটি সদস্য দেশসমূহের মধ্যকার বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে কাজ করছে। বর্তমানে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ওআইসি (OIC) এর পূর্ণরূপ কি?

ক. Organization of Islamic Countries
খ. Organization of Islamic Council
গ. Organization of Islamic Communities
ঘ. Organization of Islamic Conference

২। ওআইসির উদ্দেশ্য হল-

(i) বর্ণবৈষম্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিলোপ করা
(ii) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা
(iii) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i
(খ) ii
(গ) i ও ii
(ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্বিকভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও প্রগতির ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘ জন্মলাভ করেছে। তাই জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য জাতিসংঘ একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। সর্বক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি সার্থক-এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশ তার আন্তরিকতা ও ক্ষমতা নিয়ে জাতিসংঘে কাজ করছে। আর এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করেছে শান্তিরক্ষা মিশন কার্যক্রমে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের বেশ কিছু অঙ্গ সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক. জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার পটভূমি লিখুন।

খ. জাতিসংঘের শান্তি মিশন কার্যক্রমের লক্ষ্য কী?

গ. বাংলাশের উন্নয়নে জাতিসংঘ কিভাবে অবদান রাখছে?.

ঘ. শান্তি মিশন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২। উলপুর গ্রামের কৃষকরা একটি বৃহত্তর সমবায় গড়তে পার্শ্ববর্তী সাতটি গ্রামের কৃষকদের একটি প্রস্তাব দেয়। তারপর আটগ্রামের মোড়ল, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা একদিন বিকালে এই সমবায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনায় বসে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় সমবায়টি কেবল কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে একে অপরকে তথ্য ও সহযোগিতা দেবে। তারা একটি সমন্বিত সেচ-ব্যবস্থা চালু করারও সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এই ব্যাপারে একমত হয় যে, গ্রামগুলো এবং এই সমবায় কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেনা। সমবায়ের দপ্তরটি উলপুর গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ক. সার্ক এর পূর্ণরূপ কী?

খ. ও আই সি এর সদস্য রাষ্ট্র কয়টি?

গ. উদ্দীপকের সংখ্যাটিকে আঞ্চলিক কোন সংস্থার সাথে তুলনা করা যায়? সংস্থাটির কয়েকটি উদ্দেশ্য লিখুন।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি ক্ষেত্রে সার্কের সহযোগিতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১ : ১। গ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২ : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫ : ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬ : ১। ঘ ২। খ

সুশাসন ও বাংলাদেশ
(Good Governance and Bangladesh)

ইউনিট ১২

সু-শাসন হচ্ছে এক ধরণের শাসন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে চর্চা করা হয়। এই শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণ স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সরকারের নীতি ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত থাকে এবং নারী -পুরুষ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করে। আর্থ-রাজনৈতিক অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশে পুঁজিবাদের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটেনি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হরতাল-অবরোধ রাজনীতির নিত্য সঙ্গী। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে দুর্নীতির হার অত্যন্ত উচ্চ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নয়ন হলেও বাংলাদেশে সুশাসনের মাত্রা সন্তোষজনক নয়। বর্তমান ইউনিটে সুশাসনের ধারণা, সূচক, উপাদান, বাংলাদেশে সুশাসনের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা থাকবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-১২.১ সুশাসনের ধারণা (Concept of Good Governance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুশাসন বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- সুশাসনের স্তম্ভগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিশ্বব্যাংক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা, কাঠামো, এজেন্সি, দাতা সংস্থা

সাধারণত শাসন হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও তা বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া। শাসনের ধারণা কোন নতুন বিষয় নয় বরং এটা মানব সভ্যতার মতোই পুরাতন। শাসন ব্যবস্থার অর্থ ও মাত্রা সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। সুশাসন শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন : আন্তর্জাতিক শাসন, জাতীয় শাসন, স্থানীয় শাসন, যৌথ শাসন ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে সুশাসনকে একটি দেশের উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদানকারী হিসেবে দেখা হয়। সুশাসন প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে শাসন বলতে কি বুঝায় তা জানা প্রয়োজন। শাসন বলতে বুঝায় ক্ষমতাকে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়, কিভাবে জনগণের দাবি-দাওয়ার প্রতি সাড়া প্রদান করা হয় কিংবা কিভাবে একটি জনসমষ্টি শাসিত ও পরিচালিত হয়। সাধারণ অর্থে সুশাসন হল এমন এক প্রক্রিয়া যা একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এই শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার সঙ্গে নিশ্চিত হয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ। সুশাসনের ধারণাটি বহুমাত্রিক। এটি ৪ ধরণের ধারণা নির্মাণ করেঃ রাজনৈতিক সুশাসন, সামাজিক সুশাসন, অর্থনৈতিক সুশাসন এবং সাংস্কৃতিক সুশাসন।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন ও শাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিতা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন সব ক্ষেত্রেই সুশাসন জরুরি। তৃতীয় বিশ্বে সুশাসনের

সমস্যাকে সব সমস্যার মূল কারণ হিসাবে সনাক্ত করেছে দাতারা। তাদের মতে, এসব রাষ্ট্রে সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে। তবে এর থেকেও বড় সমস্যা হল সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি। একটি বহুমুখী ধারণা হিসাবে (Multi-dimentional) সুশাসনের উদ্ভব হয় মূলত ১৯৮৯ সালে। বিশ্বব্যাংক প্রথম এই ধারণা উপস্থাপন করে। 'সবুজ বিপ্লব' আর 'কাঠামো সমন্বয় কর্মসূচি'র ব্যর্থতার পর বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) উন্নয়নের শর্ত হিসাবে এ ধারণার অবতারণা করে। মোটা দাগে সুশাসনের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ হল-(ক) রাজনৈতিক: গণতন্ত্র ও সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, (খ) অর্থনৈতিক: মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বেসরকারিকরণ, (গ) সামাজিক-সংস্কৃতিক: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার এবং (ঘ) তথ্য ও প্রযুক্তি: বিশ্বজুড়ে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার।

সুশাসনের সংজ্ঞা

বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন হল এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ সমাজের সমস্যা ও চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়। সংস্থাটি সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "Governance is the manner in which power is exercised in the management of a countries economic and social resources for development."

UNDP এর মতে, সুশাসন হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিধিবদ্ধ চর্চা যার মাধ্যমে একটি দেশের উন্নয়ন কার্যাবলি পরিচালনা করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল। আর এ চারটি স্তম্ভ হল- দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো এবং অংশগ্রহণ। এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিতে আলোচনা করা হল-

সারণি-১: বিশ্বব্যাংকের ধারণায় সুশাসনের স্তম্ভসমূহ

দায়িত্বশীলতা	**স্বচ্ছতা**	**আইনি কাঠামো**	**অংশগ্রহণ**
দক্ষতা নির্মাণ সরকারি খাত ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আমলাতন্ত্রের সংস্কার	তথ্য প্রবাহ তথ্য উন্মুক্তকরণ ই-তথ্য সেবা প্রতিষ্ঠা দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ	আইন প্রয়োগ আইন ও উন্নয়ন বেসরকারি খাতের উন্নয়নে আইনি কাঠামো মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ	অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রভাবিত গোষ্ঠির অংশগ্রহণ রাষ্ট্রীয় এবং সেবামূলক কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রিকরণ বেসরকারি সংগঠনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা

তথ্য: বিশ্বব্যাংক (১৯৮৯)

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সু-শাসন হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ যার মাধ্যমে নাগরিক নিজের সাথে এবং সরকারি কর্মকর্তা বা এজেন্সির সাথে একত্রে কাজ করতে পারে, যাতে নাগরিকদের আত্ম-মর্যাদা উপলব্ধিতে সমর্থন যোগায় ও আর্থ-সামাজিক রূপান্তরে সহায়তা করে। রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোকে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাবার জন্য নব্বই দশকে শাসন ব্যবস্থায় একটি নতুন ধারণার অবতারণা হয়েছে। আর এই ধারণাটি হল নানা ধরণের এজেন্সি ও দাতাসংস্থা প্রদত্ত সুশাসন সম্পর্কিত ধারণা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুশাসনের স্তম্ভগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে সুশাসন বলতে এমন এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায় যা একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটায়। অন্যভাবে, সুশাসন বলতে এমন এক ধরণের শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যা জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, আইনের অনুশাসন, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। সুশাসন আইনের শাসনেরই আরেক নাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। সুশানের ধারণা প্রথম উপস্থাপন করে কে?

ক. ড. ইউনূস খ. অমর্ত্য সেন গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. আইএমএফ

পাঠ-১২.২ সুশাসনের উপাদানসমূহ (Elements of Good Governmence)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুশাসনের উপাদানসমূহ নির্ণয় করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরণ, দায়িত্বশীলতা

যে শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ গনতান্ত্রিক উপায়ে সুনিশ্চিত হয় তাকেই সুশাসন বলে। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক রিপোর্টে সুশাসনের চারটি উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হল: সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জবাদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা। ইউনেস্কো (UNESCO) সুশাসনের উপাদনের কথা বলতে গিয়ে বিশ্বব্যাংকের উপাদানগুলোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। ইউএনডিপি (UNDP) সুশাসনের ৫টি মূল উপদানের কথা বলেছেন। এগুলো হল; বৈধতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও সাম্য। আইডিএ (International Development Agency) সুশাসনের চারটি মূল উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হল: জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন ও অংশগ্রহণ।
নিম্নে সুশাসনের প্রধান উপদান সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হচ্ছে সুশাসনের প্রধান উপাদান। এটি সরকারের স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনের উপর নির্ভর করে। জবাবদিহিতার মাধ্যমেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেই নয় বরং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের জবাবদিহিতাও আবশ্যক। দুর্নীতি কমাতে ও রাজনৈতিক উন্নয়নে জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, আইন ও নীতি মান্য করে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা হয় তখন তাকে স্বচ্ছতা বলে। সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা প্রণয়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে সহজেই সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। স্বচহতা প্রতিষ্ঠা পেলে সরকারি অর্থ ব্যয়ে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যায়।

২. অংশগ্রহণ

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ সুশাসনের অন্যতম একটি উপাদান। সুশাসনের মূল ভিত্তি নারী এবং পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ। বিশ্বব্যাংক মনে করে, সকলের অংশগ্রণের মাধ্যমেই কার্যকরী উন্নয়ন সম্ভব। অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে অধিক ক্ষমতাশীল করা। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে ভোটদান।

৩. আইনের শাসন

সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে আইনের শাসন। এটি একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও বৈধ উপকরণ। মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আইনের শাসন। প্রশাসনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আইনের শাসন থাকা দরকার। আইনের মাধ্যমেই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ও আধিপত্য রোধ করা যায়। আইন হতে হবে অবশ্যই নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রের সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের আইনের প্রধানতম উৎস।

৪. নিরপেক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা

পক্ষপাতহীন অবস্থা বা নিরপেক্ষতাই পারে সুশাসন নিশ্চিত করতে। সুশাসন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। নিরপেক্ষতা আসতে হলে মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকুরি দিহে হবে।

অন্যদিকে, দায়িত্বশীলতা না থাকলে কখনোই কোন কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায় না। সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে হবে। একমাত্র দায়িত্বশীলতাই পারে সঠিকসময়ে কাজ সম্পন্ন করতে।

৫. জনপ্রশাসনের উৎকর্ষতা ও বিকেন্দ্রীকরণ

সুশাসন আনয়নের জন্য জনপ্রশাসনের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এই উৎকর্ষ সাধন করার জন্য জনপ্রশাসনকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও গতানুগতিক ধারা থেকে বের হতে হবে। জনপ্রশাসনের উৎকর্ষতা সাধন বলতে বোঝায় জনপ্রশাসনে দক্ষতা আনয়ন, প্রযুক্তি ব্যবহারকরণ ও কার্যকর কৌশল গ্রহণ করা। সুশাসনের আরেকটি উপাদান হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই সকল বিভাগ সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এটি প্রশাসনের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা কমিয়ে দেয় এবং প্রশাসনকে জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেয়। তাই একটি রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রতিটি বিভাগে বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য।

পরিশেষে বলা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সকলের কাম্য, কিন্তু এটি প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সদিচ্ছার পাশাপাশি জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত জরুরি।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসনের ভূমিকা কী?

সারসংক্ষেপ

সুশাসন হল যৌক্তিক এবং দক্ষভাবে শাসন পরিচালনা। সুশাসন অবশ্যই আইনের শাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার নিশ্চিত করে। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, সরকারের দক্ষতা ও সাড়া প্রদানের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সুশাসন প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বিশ্ব ব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি?
ক. চারটি খ. ছয়টি গ. ১০ টি ঘ. কোনটি নয়

২। দুর্নীতি কমাতে দরকার-
ক. স্বচ্ছতা খ. জবাবদিহিতা গ. আইনের শাসন ঘ. সব কয়টি

পাঠ-১২.৩ বাংলাদেশে সুশাসনের অবস্থা (The State of Good Governance in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে সুশাসনের অবস্থা আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে সুশাসন কিভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন

বাংলাদেশে সুশাসন সর্বজন গ্রাহ্য স্লোগান হলেও তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। বাংলাদেশে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিকতা, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের কাজকর্মের জবাবদিহি করে না। রাজনৈতিক নেতারা কার্যত জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। তাছাড়া নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। অন্যদিকে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় জনগণ সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তেরি হয় পদে পদে ঘুষ দেবার সংস্কৃতি। প্রশাসনের অনেক জটিল ও কঠিন কাজ আমলারা অতি সহজে পরিচালনা করতে পারে। কারণ প্রশাসনিক কার্যক্রমে তাঁরা অনেক অভিজ্ঞ ব্যাপক। এই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কজে লাগিয়ে আমলারা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভাবিত করতে পারে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে আমলাদের ক্ষমতা হ্রাস পাবার আশঙ্কা থাকে। প্রশাসনিক দলীয়করণ এ অবস্থাকে আরো খারাপ করে । সকল রাজনৈতিক দলই প্রশাসনকে নিজেদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আর এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য লোক নিয়োগ পায় না। নিয়োগ পেলেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পায় না। আর এ কারণে রাষ্ট্র একদিকে মেধাবী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে তা দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরনো, অপর্যাপ্ত ও অপ্রাসঙ্গিক বহু আইন একটি বড় বাধা। জনসাধারণের পক্ষে এ সকল আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও যথার্থ অর্থ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণে আমলারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনাচার বৃদ্ধির সুযোগ থাকে, যা সুশাসনের অন্তরায় সৃষ্টি করে। রাজনীতিবিদ ও আমলারা যদি দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি করে তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ব্যাপার।

সুশাসনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদান স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারও এ প্রক্রিয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছে। গত চারটি সংসদীয় সরকারেরও এ ক্ষেত্রে অনেক ব্যর্থতা ছিল। সুশাসনের আধুনিক ধারণা হল নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিচার বিভাগই চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠান। তাই সুশাসনের জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ অত্যাবশ্যক। সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থকলেও বাংলাদেশে নিম্ন আদালত এখনও পুরোপুরি স্বাধীন হয়নি।

দেশী-বিদেশী অনেক গবেষক দাবি করেন, বাংলাদেশ সুশাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল দুর্নীতি। সুশাসনের পূর্ব শর্ত হল সরকারের সকল কার্যকলাপ থেকে দুর্নীতি দূর করা। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে ২০০৬ সালে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতন বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ফলত বাংলাদেশে মানবাধিকার মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। গত তিন দশক ধরেই এ অবস্থা চলছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড করে যাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ নির্বিচারে সাধারণ মানুষ আটক করে শারীরিক

ও মানসিক নির্যাতন করে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদির যোগান দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের অভাবে বাংলাদেশ তার কাঙ্খিত সুশাসন অর্জন করতে পারছে না। বাংলাদেশের জনগণ ব্যাপক হারে ভোট দিলেও তা 'নিছক অংশগ্রহণ'-কে প্রকাশ করছে। নিছক অংশগ্রহণ বলতে বোঝানো হচ্ছে জনগণ শুধু প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেয় কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধির উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তারা কেবল ভোট দেয়, সরকারের নীতি নির্ধারণে জনগণের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন ধরণের সমঝোতা না হওয়াও সুশান প্রতিষ্ঠায় একটি অন্তরায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে কি সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে? আপনার উত্তর বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য বাংলাদেশে সুশাসন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি। নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জবাবদিহিতার অভাব, বিস্তৃত দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুশাসনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে গত প্রায় ২৫ বছর নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করলেও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক সরকার কুশাসনের জন্য কেবল পূর্ববর্তী সরকারকে দোষারোপ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে কোন্ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান?

ক. নিম্ন মানের খ. মধ্যম মানের গ. মিশ্র মানের ঘ. উচ্চমানের

২। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে কোন্ সালে?

ক. ২০০৪ খ. ২০০৬ গ.২০০৮ ঘ. ২০১৪

পাঠ-১২.৪ বাংলাদেশে সুশাসনের অন্তরায়সমূহ (Obstacles of Good Governance in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে সুশাসনের অন্তরায়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- অস্বচ্ছতা, আমলাতান্ত্রিকতা, রাজনৈতিক দুবৃত্তায়ন কিভাবে সুশাসনকে বিপর্যস্ত করছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দুর্নীতি, অনীহা জবাবদিহিতা, সুশীল সমাজ, সিদ্ধান্ত, চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক বেশি। বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমস্যা বাংলাদেশের সুশাসনের পথে বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব

বাংলাদেশের সুশাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জবাবদিহিতার অভাব। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অভাবের জন্য কিছু বিষয় কাজ করে। এগুলো হল: প্রশাসনিক জটিলতা, দুর্বল সংসদ, অনুন্নত রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব এবং দুর্বল নির্বাচন ব্যবস্থা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সংসদে কোন শক্তিশালী বিরোধীদল ছিল না। এ কারণে সংসদ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে না। আমলারা অনেক সময় জনগণের সামনে সঠিক ও সত্য তথ্য প্রচার করতে চায় না। শাসক শ্রেণীরও একটি অংশ তথ্য গোপনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। এই অস্বচ্ছতা দুর্নীতির জন্ম দেয় এবং সুশাসনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

২. অংশগ্রহণের অভাব

বাংলাদেশের সুশাসনের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের অভাব। জনগণের অংশগ্রহণ না থাকলে কখনোই যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত করা যায় না। জনগণের মতামত বা অংশগ্রহণ ভোটদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা কোন সমস্যা সমাধানে জনগণের মতামত নেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ একেবারেই কম।

৩. আইনের শাসনের অভাব

বাংলাদেশের সুশাসনের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আইনের শাসনের অভাব। বাংলাদেশে আইনের শাসনের অভাব তো রয়েছেই; তাছাড়া এখানে যে আইনগুলো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর সঠিক চর্চা করা হয় না।

৪. বিকেন্দ্রীকরণের অভাব

সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ একটি অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারকে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দারস্থ হতে হয়। এ কারণে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন হতে পারে নি। এখানে সিদ্ধান্ত প্রণয়ণ ও তা বাস্তবায়ন হয় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে।

৫. দুর্নীতি

বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতির কারণে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। জনগণের সরকারি সুযোগ-সুবিধা কমে যাচ্ছে। ক্ষমতাবান কিছু ব্যক্তি ফায়দা লুটছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাত, ভূমি প্রশাসন, জন প্রশাসন, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ সেক্টর, স্থানীয় সরকার- এক কথায় বাজার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতির সংস্কৃতি লক্ষণীয়।

৬. মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। শিশু ও নারী নির্যাতন, নারীর অধিকার লঙ্ঘন, শিশুশ্রম এবং নাগরিকের স্বাধীনতাহরণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট উদাহরণ। প্রত্যেক সরকারই সন্ত্রাসীদের বিচারের পরিবর্তে ক্রস-ফায়ারের মাধ্যমে মেরে ফেলছে। তাছাড়া গুম, অপহরণ বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরেকটি বাধা।

৭. আমলাতান্ত্রিকতা ও দুর্বল সুশীল সমাজ

রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশে আমলাদের কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ক্ষমতা ও নীতিমালা প্রয়োগ করছে। দেশের সুশীল সমাজ অত্যন্ত দুর্বল। তারা অনেক বিষয়ে রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করে সরকারের বিভিন্ন অন্যায় কার্যক্রমের সমালোচনা না করে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ কার্যত সরকার ও বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলত সুশীল সমাজ কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

৮. দারিদ্র্য ও নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী এ সকল লোক বিভিন্ন অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। এটি সুশাসনের জন্য একটি বড় বাঁধা। উপরন্তু তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানসহ মৌলিক অধিকার রক্ষা করা সরকারের জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে দারিদ্র্য নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে।

৯. বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব

সুশাসনের জন্য বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ পুরো কার্যকর হয়নি। উচ্চ আদালত স্বাধীনতা ভোগ করলেও নিম্ন আদালত কার্যত শাসন বিভাগের অধীন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পাঁচটি অন্তরায় কি কি?

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য, আমলাতান্ত্রিকতা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্বাচনী বিরোধ, জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের অভাব সর্বোপরি প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা। দুর্নীতিও বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। দুর্নীতির কারণে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অস্বচ্ছতা সুশাসনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বংলাদেশে সুশাসনের অন্তরায় কোন্টি

ক. জবাবদিহিতার অভাব খ. দুর্নীতি গ. আমলাতান্ত্রিকতা ঘ. সবকয়টি

২। বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?

ক. দুর্নীতি খ.স্বজনপ্রীতি গ. রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘ. জবাবদিহিতার অভাব

পাঠ-১২.৫ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায়
(Measures to Establish Good Governance in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যাসমূহ কিভাবে দূর করা যায় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অন্তরায়, পদক্ষেপ, প্রতিরোধ, নিশ্চিত, ক্ষমতায়ন, সদিচ্ছা, এনজিও

বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে অনেক অন্তরায় রয়েছে। দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার, শাসনরীতির অনিয়ম, প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার স্বাভাবিক চিত্র। এ ক্ষেত্রে যদি সরকার সংসদকে কার্যকরি করার যথাযথ পদক্ষেপ নেয় এবং সংসদ তার কার্যকর ভূমিকা পালন করে তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নিম্নে সুশাসন নিশ্চিত করার উপায় আলোচনা করা হলঃ

১. দূর্নীতি প্রতিরোধ

দুর্নীতি সুশাসনের প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রকল্পে দূর্নীতি , সরকারি রাজস্ব আদায়ে দুর্নীতি, সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, ভূমি জরিপে দুর্নীতি প্রভৃতি। অতএব, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে অবশ্যই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করে গণতান্ত্রিক চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

জবাবদিহিতা বলতে আমরা বুঝি নিজের কাজ সম্পর্কে অন্যের কাছে ব্যাখ্যা প্রদান করা। বাংলাদেশের জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এনজিওদের ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি

বিশ্বব্যাংকের মতে, প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে এনজিগুলোকে স্থান দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে শাসনের মূল দায়িত্ব সরকারের নির্বাহী বিভাগের ওপর। এখানে এনজিগুলোকে কাজ করতে হয় সরকারের বিভিন্ন রকম বাধা নিষেধের আওতায়। তাই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনজিগুলোকে তাদের ভূমিকা পালনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

৪. স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণত বিচার ব্যবস্থার আওতায় অথবা বিশেষ বিচারের আওতায় আমলাদের অন্যায় বা দুর্নীতির বিচারের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। আর এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় সুশাসন।

৫. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

মানুষের বাকস্বাধীনতা ও জনগণের সচেতনতার জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কোন কোন সরকার গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে চেষ্টা করে, যা সুশাসনের অন্তরায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের ত্রুটি কিংবা দুর্নীতি জনগণের সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হবে। এছাড়াও প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে খুব সহজে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে

তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। উপরন্তু প্রচারমাধ্যম দুর্নীতি রোধ ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিকরণে ভূমিকা রাখে। তাই প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৬. নারীর ক্ষমতায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে পুরুষ ও মহিলা নাগরিকদের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.খ)। বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নারীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, বাল্য বিবাহ রোধ করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রী আহত হয়েছেন, এমনকি মারা পর্যন্ত যায়। যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। জনগণের অর্ধেক অংশকে ক্ষমতা থেকে দূরে রেখে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

৭. রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিককীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন- রাজনৈতিক দল, সংসদ, আমলাতন্ত্র, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি যদি তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে, তবে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

৮. রাজনৈতিক সদিচ্ছা

দেশে সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।। একমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যই পারে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করতে।

মোট কথা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এটি সকলেরই প্রত্যাশা। সে লক্ষ্যে সরকার এবং জনগণকে একত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে আরো সচেষ্ঠ হতে হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় গুনগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পাঁচটি উপায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, স্বাধীন ও দক্ষ বিচার ব্যবস্থা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, শক্তিশালী সংসদ, সুষ্ঠু নির্বাচন, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। দুর্বৃত্তায়ন, কাল টাকার প্রভাব, লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি দুর্নীতির কারণ যা কু-শাসনের জন্ম দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সৎ মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। অবাধ তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে কোন্‌টি নিশ্চিত হতে পারে?
ক) আইনের শাসন খ) জবাবদিহিতা গ) প্রতিদান ঘ) শৃঙ্খলা

২। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন–
i) দুর্নীতি প্রতিরোধ
ii) নারীর ক্ষমতায়ন
iii) বৈষম্য
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। চর ডুবরিয়া ও জলডাঙ্গা পাশাপাশি অবস্থিত দুটি দ্বীপ। জনসংখ্যা ও আয়তন প্রায় সমান হলেও দ্বীপ দুটোর বেশ কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। চর ডুবরিয়ায় নির্বাচিত সরকার থাকলেও দারিদ্র্য বিদ্যমান। তবে সেখানকার সরকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের চেষ্টা করছে। সেখানে সরকার জনগণের চাহিদা ও অসুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। ক্ষমতাবানরা সহজে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে পার পায় না। কিন্তু জলডাঙ্গা এর বিপরীত। দ্বীপটিতে একসময় জনগণ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন করলেও সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা চর্চার কারণে এখন অত্যন্ত হতাশ। জনগণ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। সরকার এ বিষয়ে খুব কঠোরভাবে তথ্য গোপন করে। ভীত-সন্ত্রস্ত জলডাঙ্গার এ জনপদে জনগণের তেমন কোন মানবাধিকার নেই। তারা কেবলই কর দেয়। কিন্তু জানে না কিভাবে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সরকারি কাজে ব্যয় হচ্ছে।

ক. সুশাসন কী?

খ. সুশাসন ও কুশাসনের পার্থক্যগুলো নির্দিষ্ট করুন।

গ. দ্বীপ দুটোর কোন্‌টিতে কুশাসন বিদ্যমান এবং মাত্রা কেমন?

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুশাসনের উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।

২। স্কুলের রচনা প্রতিযোগিতায় করিম ও সানজিদা যৌথভাবে প্রথম স্থান দখল করেছে। দুজনই সুশাসনের উপর রচনা লিখেছে। করিমের রচনাটি বাংলাদেশে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যেসব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করে তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছে করিম। তার মতে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, দুর্নীতি, দারিদ্র্য, আমলাতান্ত্রিকতা, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা। সানজিদার রচনাটি অত্যন্ত গঠনমূলক এই বিচারে যে, সে এইসব সমস্যা কিভাবে দূর করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছে। সানজিদার মতে, দুর্নীতি দূর করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন দরকার। সেই সঙ্গে দরকার রাজনৈতিক সরকারের সদিচ্ছা। বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিকতা দূর করতে সে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের উপরও জোর দিয়েছে সানজিদা।

ক. সুশাসন কী?

খ. দারিদ্র্য কিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?

গ. দুর্নীতি প্রতিরোধে সানজিদার প্রস্তাব ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকা লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১ : ১। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪ : ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫ : ১। খ ২। ক